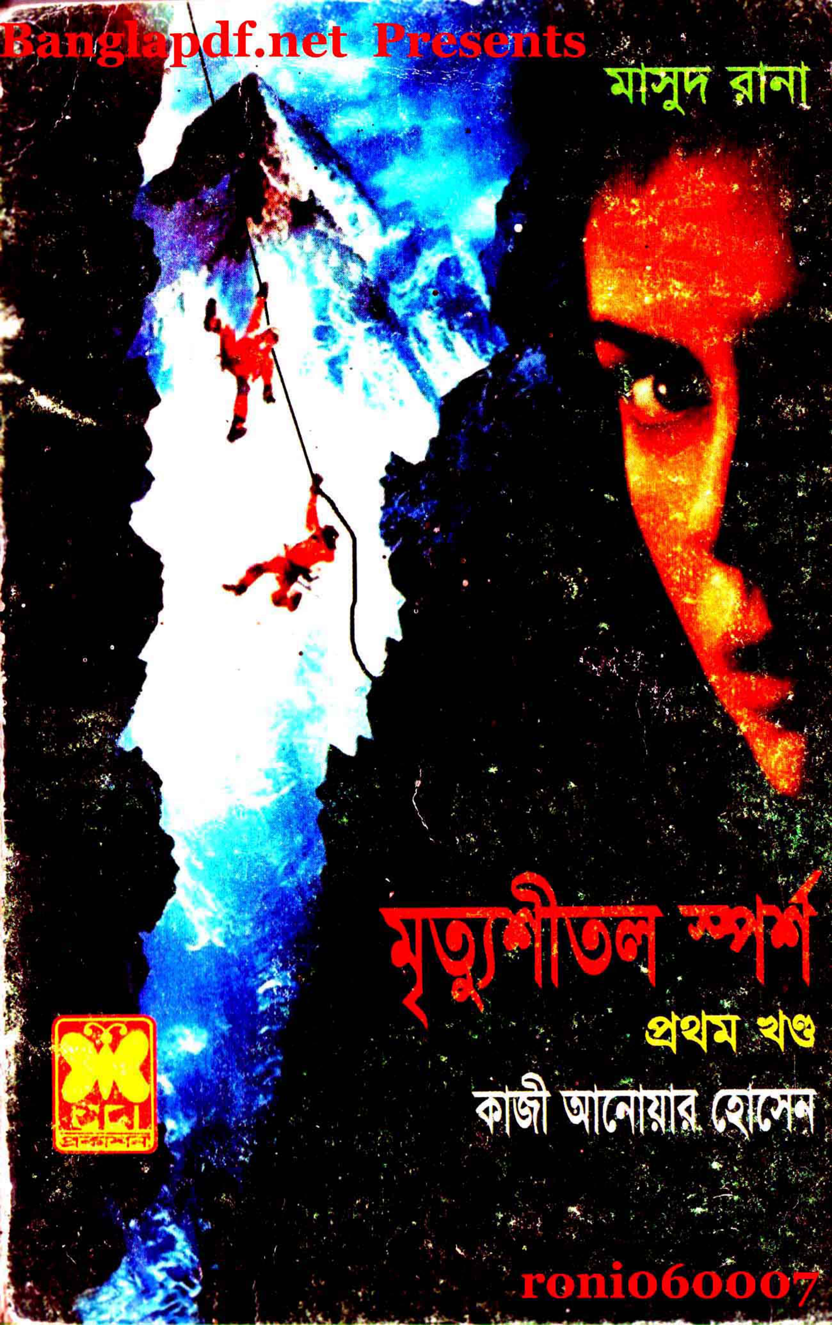

Banglapdf.net Presents
মাসুদ রানা
মৃত্যুশীতল স্পর্শ
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
roni060007

মাসুদ রানা ৩৮২

মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7382-7

মাসুদ রানা

মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

শুরুতেই হকচকিয়ে যাবেন আপনি—
ইতিহাস-কুখ্যাত রাসপুটিন আর ১৯৫৩ সালে
ক্র্যাশ হওয়া একটা বিমানের মধ্যে সম্পর্কটা কী?
একটু এগিয়ে আরও পড়বেন ধাঁধায়—
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লুঠ হওয়া আটাশ টন সোনা,
পঙ্কিল অতীত ঢাকতে মরিয়া হয়ে ওঠা এক বহুজাতিক
কর্পোরেশন আর নতুন পোপের ধর্মীয় মহাসম্মেলনের
মাঝে মাসুদ রানার স্থান কোথায়? বন্ধু ববি মুরল্যান্ডকে
নিয়ে ও তো চলেছে গ্রীনল্যান্ডে! জেনে রাখুন, আসলে
সমস্ত রহস্যের জড় লুকিয়ে আছে ওখানেই,
মাটির নীচের এক অন্ধকার গুহায়।
আছে এমন এক জিনিস, যা ছড়ায় মৃত্যুর নির্যাস।
বরফের মঞ্চে অভিনীত হতে যাচ্ছে এক শ্বাসরুদ্ধকর নাটক।
কে বাঁচে, কে মরে, কোনও ঠিক নেই। বসে থেকে লাভ কী?
চলুন, দেখে আসি কী ঘটছে ওখানে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-382
MRITYUSHEETAL SPARSHO
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

চুয়ান্ন টাকা

এক

মার্চ, ১৯১২। ভ্যানাভারা, সাইবেরিয়া।

ইউরি কসলভ মারা যাচ্ছে। এই নিষ্ঠুর সত্যটা সে শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার, মাত্র সাতদিন আগেও কি সে ভাবতে পেরেছিল, এমন কিছু ঘটবে! কবরের মধ্যে সার্গেই বরনভের মৃতদেহ নামাবার সময় একবারের জন্যও এই চিন্তা আসেনি যে, তাকেও মরতে হতে পারে–এবং খুব শীঘ্রিই। সার্গেই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তার মৃত্যুতে শোক করেছে সে; কিন্তু বন্ধুকে যে সাতদিনের ভিতরই সঙ্গ দিতে পরপারে রওনা দিতে হবে তাকে, তা কে ভাবতে পেরেছিল?

বিছানায় শুয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল ইউরি, দগদগে ঘায়ে লাল হয়ে গেছে হাতটা, চামড়া গলে বেরিয়ে এসেছে মাংস। আয়নায় তাকালে দেখতে পাবে, মুখেরও কমবেশি একই অবস্থা। ব্যথা অনুভব করছে না কোনও, সমস্ত নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগেই। হঠাৎ করেই খুব নিঃসঙ্গ বোধ করল সে, এই শেষ মুহূর্তে কাউকে কাছে পেতে মন চাইল। হায়, সে উপায় নেই। ভাইবোন নেই, বাবা-মা মারা গেছে অনেক বছর আগে, বিয়েও করেনি সে, ভেবেছিল সময় তো কম নেই হাতে! আগে আয়-রোজগার বাড়ুক, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিক! কিন্তু কপাল যে এভাবে বেঈমানী করবে কে জানত!

দুর্বল পায়ে সামনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ইউরি। চোখের সামনে নিথর পড়ে আছে গোটা শহর, প্রাণের কোনও অস্তিত্ব নেই কোথাও। ব্যাপারটা খুব ভাল করেই জানে সে, গত সাতদিনে অন্তত একশ' মানুষের দাফনে সাহায্য করতে হয়েছে তাকে। শেষদিকে মৃতের সংখ্যা এত বাড়ল যে ওরা আর কুলিয়ে উঠতে পারেনি। পড়ে পড়ে পচতে শুরু করেছে লাশ, পুরো এলাকায় ছড়িয়ে গেছে পুতি গন্ধ। আতঙ্কিত শহরবাসী পালাতে শুরু করেছিল, কিন্তু ততদিনে বাইরের লোকজন জেনে গেছে ঘটনাটা। শহর থেকে বেরুনোর সমস্ত পথ আটকে দিয়েছে তারা, মহামারীটাকে যে-কোনও মূল্যে ঠেকাতে চায়। যারা জোর করে বেরুতে চেয়েছিল, তাদের নির্দয়ভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। শেষে নিয়তি মেনে নিয়েছে হতভাগ্য শহরবাসী, নিজ নিজ ঘরে ফিরে নিঃশব্দে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে তারা। প্রথম কিছুদিন কান্না শোনা যেত, পরে তা-ও থেমে গেছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় জীবিত কারও সাড়া পাওয়া যায়নি। বেচারা ইউরি জানে না, সে-ই ভ্যানাভারার শেষ জীবিত মানুষ।

কেন ঘটল এমনটা? জানে না কেউ। কীসে ঘটাল? তা-ও জানে না। এ কেমন রোগ যা সাতদিনে গোটা একটা শহরকে উজাড় করে দিল? জানাশোনা কোনও মহামারীর সঙ্গে মিল নেই এর। প্রথমে মাথাব্যথা দিয়ে শুরু হয় উপসর্গ। ধীরে ধীরে চোখ-কান-নাক দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করে, চামড়া গলে মাংস বেরিয়ে যায়। সবশেষে আসে মৃত্যু।

সার্গেই বরনভ ছিল এর প্রথম শিকার। পেশায় শিকারী ছিল সে, বনেজঙ্গলে গিয়ে হরিণ মারত। আটদিন আগে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে সে, সঙ্গে ছিল একটা অদ্ভুত পাথর... বনের ভিতর কুড়িয়ে পেয়েছে। চোখের পলকে তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল, চব্বিশ ঘণ্টাও টিকল না, মারা গেল। পাথরটা পড়ে রইল তার ঘরে। পরদিন একসঙ্গে মারা গেল বরনভ পরিবার—মোট সাতজন

সদস্য ছিল ঘরে। সার্গেইয়ের বাবা-মা, তিন ভাইবোন, বুড়ি দাদী আর এক চাকর। সবারই একই রোগ। এদিকে বরনভদের বাড়ির দুপাশের প্রতিবেশীরাও অসুস্থ হতে শুরু করেছে। গোটা শহর আতঙ্কিত হয়ে উঠল। দায়ী করা হলো অদ্ভুত সেই পাথরটাকে। মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো সেটা। কিন্তু অভিশাপ তার আগেই লেগে গেছে। দেখা দিল মড়ক। দলে দলে মরতে শুরু করল মানুষ। গির্জায় রাতদিন প্রার্থনা করেও ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া গেল না। কেন তিনি এই অভিশাপ পাঠালেন, কেউ জানে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইউরি। পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, টলমল করছে। মেঝেতে বসে পড়তে যাবে, এমন সময় চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাস্তার মোড়ের দিকে তাকাল সে, ভুল দেখছে না তো?

ধীর গতিতে দুই সারিতে হেঁটে আসছে একদল মানুষ, সারা শরীর সোনালি আভায় ঝলমল করছে। কারা এরা? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ইউরি। দেখে মনে হচ্ছে কোনও তীর্থযাত্রা, সামনে গাইডের হাতে উঁচু একটা ক্রুশ রয়েছে, মাথা নিচু করে তাকে অনুসরণ করছে বাকিরা। কিন্তু কারও পোশাক-আশাক তো ধর্মযাজকের মত নয়! এ কী, সবাই তো সৈনিকদের মত বর্ম পরে আছে! যে-সে বর্ম নয়, সোনার তৈরি বর্ম!

যে-ই হোক এরা, মানুষ তো! নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত দয়া করেছেন সম্রাজ্ঞী, তাদের সাহায্যের জন্য লোক পাঠিয়েছেন। মাতালের মত এলোমেলো পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ইউরি, কবাট খুলে পা রাখল বারান্দায়, শরীরের শেষ শক্তিটুকু এক করে ডাকল, 'বাঁচান! বাঁচান আমাকে।' পরিশ্রমটা সইতে পারল না দুর্বল শরীর, ধপ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। চিত হয়ে হাঁপাতে থাকল, নড়তে পারছে না।

তাড়াহুড়ো করল না যাজকদলটা। আগের মতই সুশৃঙ্খলভাবে

বোঝা যায় না। চাঁদ নেই, চারপাশে জমাট বেঁধে আছে নিঃসীম অন্ধকার। আকাশ আজ মেঘমুক্ত, তারপরও আলোর কোনও উৎস না থাকায় আঁধার বেশ আয়েশ করেই জমে বসেছে। ইঞ্জিনগুলোর অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হলো কনওয়ে, কতক্ষণ উড়তে পারবে বলা যাচ্ছে না। পাশে বসা লেফটেন্যান্ট টডের মধ্যেও একই উদ্বেগ সংক্রামিত হয়েছে।

দুই পাইলটের পিছনে আলাদা একটা সীটে বসে আছে নেভিগেটর প্যাট্রিক রাইট। কনওয়ে তার কাছে জানতে চাইল, 'আমরা আছিটা কোথায়, প্যাট?'

সামনের কনসোলের ওপর একটা চার্ট বিছিয়ে রেখেছে নেভিগেটর। সেটা দেখে বলল, 'ল্যান্ডিং করার জায়গা বাছাইয়ের সুযোগ আছে কি না—এটাই যদি জানতে চান, তা হলে বলব গ্রিনল্যান্ডে নামার প্রস্তুতি নিতে। আইসল্যান্ড অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। এখন আর উল্টো ঘোরার সময় নেই।'

'আমি সে ভয়ই করছিলাম।'

'খুব একটা ভাবনারও তো কিছু দেখছি না। আমার হিসেব বলছে, উপকূল আর মাত্র চল্লিশ মাইল।'

রাইটের সঙ্গে একমত হতে পারছে না কনওয়ে। দীর্ঘদিন থেকে বিমান চালাচ্ছে সে, দূর থেকেই বিপদের গন্ধ পায়। অথচ আজ শুধু গন্ধ নয়, চারপাশে আলামতই দেখতে পাচ্ছে; শুরু থেকেই একটার পর একটা ঝামেলা লেগে আছে এই যাত্রায়। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ইংল্যান্ড থেকে ঠিক সময়ে টেকঅফ করতে পারেনি; পরে যা-ও বা করল, হঠাৎ টার্বুলেন্সে পড়ে কার্গো হোল্ডের বাঁধন ছিঁড়ে সমস্ত বাক্স আর ক্রেট এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। প্লেনের ব্যালান্স নষ্ট হয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়েছিল সে কারণে, কারেকশন দিয়ে সিধে করে নরমাল কোর্সে ফিরতে অনেক সময় লেগেছে। এরপর কয়েক ঘণ্টা স্বাভাবিকভাবে কাটলেও হঠাৎ সমস্যা দেখা দিয়েছে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে, শর্ট

সার্কিট হয়ে রেডিও সেট বিকল হয়ে গেছে। ভাগ্যিস তার আগেই থিউলি এয়ারফোর্স বেসকে জানিয়ে দিয়েছিল তাদের দেরি হবার খবর, নইলে হয়তো টেনশনে পড়ে যেত তারা। এ মুহূর্তে কোনও রকম কমিউনিকেশন ছাড়া উড়ছে ওরা, মে-ডে পাঠাবারও উপায় নেই। রেডিও সেটটা মেরামত করতে গিয়ে আঙুলে বিদ্যুতের ছ্যাঁকা খেয়েছে রাইট, কিছুই করতে পারেনি। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না কনওয়ে, তারপরও কেন জানি মনে হচ্ছে এবারের ফ্লাইটটা তাদের অনুকূলে নেই। আরও ভয়াবহ কিছু অপেক্ষা করছে সামনে। ফিরে যাবার কথা ভেবেছিল বটে, কিন্তু সমস্যা হলো—খারাপ আবহাওয়ার কারণে থিউলির ডোভার বেসে গত তিনটে সাপ্লাই বিমান পৌঁছাতে পারেনি। না খেয়ে মরার দশা হয়েছে ওখানকার লোকজনের। সামান্য ভাল আবহাওয়া পেয়ে এবার কনওয়ে আর তার টিমের ওপর অগাধ বিশ্বাসে মিশনটা সঁপেছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, ফিরে গেলে তাঁদের শুধু হতাশ করাই হবে না, একই সাথে ডোভার বেসকে ফেলে দেয়া হবে বিপদে। তাই সমস্ত ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে ফ্লাইট কন্টিনিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে, এখন মনে হচ্ছে সেটার চড়া মাশুল গুনতে হবে।

'যেভাবে টেম্পারেচার বাড়ছে, তাতে তো খানিক পরে সবগুলো ইঞ্জিনই বন্ধ হয়ে যাবে, স্যর,' বলল লেফটেন্যান্ট টড। 'কী করা যায়?'

দ্রুত ভেবে নিল কনওয়ে। বলল, 'এক কাজ করো। পালা করে একটাকে ঠাণ্ডা হবার সুযোগ দাও।'

'যেটা মিসফায়ার করল?'

'ওটাই আগে ঠাণ্ডা হোক।' নেভিগেটরের দিকে ফিরল কনওয়ে। 'প্যাট্রিক, গ্রিনল্যান্ডের এদিকে কোনও ল্যান্ডিং স্ট্রিপ আছে?'

রাইট মাথা নাড়ল। 'না, স্যর। চার্টে বরফ আর পাহাড় ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যেখান দিয়ে উপকূল পেরুব, তার

দেড়শো মাইল দক্ষিণে ক্যাম্প ডিকেড নামে একটা আর্মি বেস আছে বটে, তবে সেটার রানওয়ে স্কি-লাগানো প্লেনের জন্য। চাকা দিয়ে নামা যাবে না।'

মনে মনে ভাগ্যকে গালাগাল করল কনওয়ে, তবে চেহারায় হতাশা ফুটতে দিল না। সঙ্গীদের জানাল, 'দশ মিনিট দেখব আমরা। ইঞ্জিন-কুলিঙের প্ল্যানটা যদি কাজে না লাগে, তা হলে উল্টো ঘুরে আইসল্যান্ডে ফিরে যাবো।'

'ওটা আড়াইশো মাইল দূরে, মেজর,' শুকনো গলায় বলল টড। বেচারার বয়স কম, কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া যুদ্ধটা চাক্ষুষ করেনি। বিচলিত হয়ে পড়েছে সে, সম্ভবত এই প্রথম সত্যিকার বিপদের মধ্যে পড়েছে বলেই।

এক নম্বর ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা হবার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো, এই সময়টা ফ্লাইট ডেকে নীরবতা বিরাজ করল। এমনকী যখন দিগন্তের কাছে গ্রিনল্যান্ডের রুক্ষ তীর আর তার মাঝ দিয়ে প্রবেশ করা সরু ইনলেটগুলো উদয় হলো, তখনও কারও মুখে কথা ফুটল না। প্রকৃতির এমন নির্দয় চেহারা মানুষ খুব কমই দেখেছে। প্রথমেই চোখে পড়ে পাহাড়ের হাজারো চূড়া, সবই যেন সাদা টুপি পরে আছে; আর এই বিস্তৃত পর্বতমালার পিছনে বিস্তৃত হয়ে আছে গ্রিনল্যান্ড আইস শেলফের অবিশ্বাস্য বরফ—যার পরিসর সাড়ে আট হাজার বর্গমাইলের বেশি, গভীরতা যে কোনও মহাসাগরের মত।

'এক নম্বরের টেম্পারেচার স্বাভাবিকে নেমে এসেছে, স্যর,' এক সময় জানাল টড। 'স্টার্ট করে দেখব?'

'গো অ্যাহেড।'

ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল রোটর, মৃদু গুঞ্জনের সাথে চালু হলো আটাশ সিলিন্ডারের হুইট্নি অ্যান্ড ওয়াস্প, আর.পি.এম বাড়তে থাকল। গজের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করল মেজর কনওয়ে, স্বাভাবিকভাবেই চলছে ইঞ্জিনটা। প্রপ কন্ট্রোল

অ্যাডজাস্ট করল সে, বিমানটা এখন আগের চেয়ে ভালভাবে রেসপন্স করছে।

'গুড জব, লেফটেন্যান্ট,' মুখে হাসি এনে বলল মেজর। 'এবার নাম্বার টু'র ব্যবস্থা করো।'

মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে প্যানেলের ওপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল টড। পিছন থেকে রাইট জানাল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাঙায় পৌঁছুব আমরা।'

একশো আশি নট বেগে পর্বতমালার সারি পেরুল সি-নাইন্টি সেভেন—গতিটা অপটিমাম এয়ারস্পিডের তুলনায় কম, অলটিচ্যুডও এফিশিয়েন্ট মার্জিনের চেয়ে নীচে রাখতে হয়েছে। তবে নির্বিঘ্নে পার হতে পারায় বিমানের তিন আরোহী এ নিয়ে মাথা ঘামাল না, বরং স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলল। এতক্ষণে প্রকৃতির দিকে তাকাবার ফুরসত মিলল তাদের। প্লেক্সিগ্লাসের মাঝ দিয়ে নীচে অবারিত এক শুভ্র-সাগর দেখতে পেল তিন সহযাত্রী, পর্বতের ঢাল গড়িয়ে প্রতি মুহূর্তেই তাতে আরও বরফ জমা হচ্ছে। নদীর স্রোতের মত গতি আছে এতে; যেন কিলবিল করছে এক মস্ত সরীসৃপ... নড়ছে-চড়ছে-মোচড়াচ্ছে সারাক্ষণ। জীবনে এই প্রথম এই দৃশ্যটা দেখছে ওরা তিনজন।

'জিসাস!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রাইট।

লেফটেন্যান্ট টড ঘাড় ফিরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো এক নম্বর ইঞ্জিন। একসঙ্গে ফাটল সবগুলো সিলিন্ডার, ফুলঝুরির মত ফুলকির সঙ্গে ইস্পাতের টুকরো ছড়িয়ে গেল চারপাশে, কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল ডিমের মত বস্তুটাকে; জ্বলন্ত ফুয়েল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল ডানা আর ফিউজলাজের একপাশ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুড়ে কালো হয়ে গেল ডানার একটা অংশ, বাতাসের তোড়ে ভেঙে পড়তে শুরু করল।

ককপিটের ভিতর গাল দিয়ে উঠল মেজর কনওয়ে।

বিপজ্জনকভাবে স্টারবোর্ড সাইডে কাত হয়ে যাচ্ছে সি-নাইন্টি সেভেন। কন্ট্রোল কলাম নিয়ে যুঝতে শুরু করল সে, অলটিমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেটা মাতালের মত বনবন করে ঘুরছে—কাঁটাটা যেন ঘোলাটে কোনও বস্তু, খালি চোখে দেখাই যাচ্ছে না।

'প্যাট্রিক, ড্যামেজ রিপোর্ট!'

নিজের পাশের ছোট্ট উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল রাইট। জানাল, 'ইঞ্জিন গেছে, স্যর। ডানাটাও টিকবে না বেশিক্ষণ। এখনও আগুন জ্বলছে ওটায়। না, দাঁড়ান..., নিভে যাচ্ছে!'

'ফুয়েল অফ, স্যর!' তেলের লাইন কেটে দিয়ে রিপোর্ট জানাল টড, তারপর কন্ট্রোল কলাম নিয়ে মেজরকে সাহায্য করায় মন দিল।

'সান অভ আ বিচ!' মুখ দিয়ে খিস্তি বেরুচ্ছে কনওয়ের। 'পোর্ট সাইডের অ্যালেরন পুরোটাই খুইয়েছি। মার্কাস, চার নম্বর প্রপের ফুয়েল ডাম্প করো। ওজন কমিয়ে লেভেলে আনতে হবে মাগীটাকে। নইলে খবর আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ পালন করল টড। ফিনকি দিয়ে রক্তপাতের মত তেল ছড়াতে ছড়াতে এগোল বিমানটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইলটদের তৎপরতার কাছে হার মানতে হলো তাকে, সিধে হতে লাগল ধীরে ধীরে, কিন্তু এখনও অলটিচ্যুড হারাচ্ছে। অমোঘ নিয়তিটা আরোহীরাও বুঝতে পারছে—প্লেনটাকে আকাশে ভাসিয়ে রাখার কোনও উপায়ই নেই। শুধু কতটা অক্ষতভাবে এটাকে জমিনে নামিয়ে আনা যায়, সেটুকুই এখন চেষ্টা।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে কনওয়ে, স্বভাবসুলভ নেতৃত্ব আর দায়িত্ববোধ ফিরে এসেছে তার মধ্যে। সঙ্গীদের প্রশ্ন করল, 'সবাই ঠিক আছ?'

দেখা গেল সুস্থই আছে অপর দুই বৈমানিক, সামান্য

কেটে-ছড়ে যাওয়া ছাড়া গুরুতর কোনও আঘাত পায়নি।

'সমতল কোনও জায়গা পাওয়া যায় কিনা দ্যাখো,' বলল মেজর। 'এই লোহার জাঙ্কটাকে নামাতে হবে।'

'চেষ্টা করছি, স্যর,' জানাল টড। 'তবে চোখে পড়ছে না কিছু। নীচের বরফ ভীষণ এবড়ো-থেবড়ো।' অলটিমিটারের দিকে তাকাল সে। 'পাঁচ হাজার ফুট।'

বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব বেড়ে গেছে দেখে নাকটা একটু উঁচু করার চেষ্টা চালাল কনওয়ে, উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে নিতে চায়; কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটল। ঝপ করে অনেকটা নীচে নেমে এল সি-নাইন্টি সেভেন, আবার কাত হয়ে যেতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি সেটাকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে ককপিটের ভিতরটা ভরে গেল ঘন ধোঁয়ায়, রাইট চিৎকার করে জানাল—ফ্লাইট ডেকের পিছনদিকে আগুন লেগেছে। কাশতে কাশতে লিভার টেনে ভিতরের বাতাস ভেন্ট করে দিল টড, ধোঁয়া সরে গিয়ে হিমশীতল হাওয়া দখল করল জায়গাটা; সেটা এতই পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা যে, শ্বাসনালীতে সুঁইয়ের মত বিঁধছে।

ইতোমধ্যে আরও এক হাজার ফুট নেমে এসেছে বিমান, বিশাল একটা বৃত্তাকার প্যাটার্নে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে ভূমির দিকে। কনওয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মার্কাস, পাওনি কিছু এখনও?'

'জাস্ট আ মিনিট, স্যর,' বলল টড, চোখ কুঁচকে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে সে। পরমুহূর্তেই উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'সামনে! ওয়ান ও'ক্লক পজিশনে দেখুন, স্যর।'

এতক্ষণে কনওয়েও দেখতে পেয়েছে। গ্র্যানেটের পাহাড়ের ছায়ায় তুষারে ঢাকা ছোট্ট এক খণ্ড জমি, সমতল। 'আই গট ইট!' বলল সে, তারপর লাইন-আপ করতে লাগল বিমানটাকে, বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ল্যান্ডিং অ্যাপ্রোচে নিয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরণটার পর এই প্রথম একটু আশার আলো

দেখতে পাচ্ছে সে, প্লেনটা যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণে আছে—বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বল হচ্ছে।

টড জানতে চাইল, 'ফ্ল্যাপ নামাব?'

'না,' নেতিবাচক ভঙ্গিতে বলল কনওয়ে। 'পোর্ট সাইডেরটা যদি ডেপ্লয় না হয়, তা হলে স্রেফ উল্টে যাব।'

আস্তে আস্তে কাছে চলে আসছে অবতরণের জায়গাটা। দূরত্বটা দু'মাইলে এসে ঠেকতেই দুই পাইলট উপলব্ধি করল, ল্যান্ডিঙের জন্য সেটা মোটেই আদর্শ নয়। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে বাতাসের প্রবল ঝাপটা কামড় বসাচ্ছে মাটিতে। ছড়িয়ে থাকা তুষার বিমানটার প্রাথমিক ধাক্কায় কুশন হিসেবে কাজ করবে ভেবেছিল, কিন্তু বাতাসের তোড়ে বারবার সরে যাচ্ছে ওগুলো, বেরিয়ে পড়ছে ছুরির মত তীক্ষ্ণ ফলাঅলা বরফের ডগা—পুরো জায়গাটা জুড়েই বিস্তার সেগুলোর। তুষারের আবরণ ছাড়া সরাসরি ওখানে আছড়ে পড়লে কী ঘটবে ভেবে শিউরে উঠল কনওয়ে আর টড—বিমানের পাতলা শরীর একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, যেভাবে গরম ছুরি দিয়ে মাখন কাটা হয়। কিন্তু এখন আর বিকল্প কিছু ভাবার অবকাশ নেই। যা হয় হবে, ওখানেই নামতে বাধ্য দুর্ভাগা স্ট্র্যাটোফ্রেইটার। কো-পাইলটকে অবশিষ্ট সমস্ত ফুয়েল ফেলে দিতে বলল কনওয়ে, ল্যান্ডিঙের পর বিস্ফোরণের ঝুঁকি নিতে চায় না।

টডের হাত কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর খেলা করছে। 'ল্যান্ডিং গিয়ার?'

'লাগবে না। শুধু শুধু হোঁচট খাব মাঝখান থেকে, সরাসরি পেটের ওপরই নামাচ্ছি।'

ইকুইপমেন্টগুলো এখনও কাজ করছে দেখে সৃষ্টিকর্তাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল কনওয়ে, নইলে আর্কটিক সার্কেলের আকাশ থেকে খালি চোখে গ্রাউন্ড লেভেল বোঝার কোনও উপায় ছিল না। সামনের পাহাড়টাই একমাত্র ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স, সেটাকে কেন্দ্র

করে ল্যান্ডিঙের প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। ককপিটের ভিতর ঠাণ্ডা জেঁকে বসেছে, মুখের নগ্ন চামড়ায় নির্দয় অত্যাচার চলছে, রাডার পেডালে রাখা পা'দুটোতেও তেমন সাড়া পাচ্ছে না। মুঠোয় ধরা ইয়োকের ওপর চাপ বাড়াল মেজর, যেন এতেই বিমানটা আরও অনুগত হবে।

ইস্পাতের তৈরি অতিকায় এক দানবের মত সারফেসের দিকে ছুটে যাচ্ছে সি-নাইন্টি সেভেন। মাত্র দুটো ইঞ্জিনের সাহায্যে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাওয়া এত বড় প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে কনওয়ে আর টডের। অলটিমিটার এক হাজার ফুট পেরিয়ে এল, প্রতি মুহূর্তে আরও কমছে। ল্যান্ডিং খুবই রাফ হবে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে দুই বৈমানিক। একটা ডানা না থাকায় গতি কমিয়ে গ্লাইড করে নামার উপায় নেই—ইঞ্জিন চালু রাখতে হচ্ছে, স্ট্রাকচারাল ইম্ব্যালান্স পুরো করতে হচ্ছে গতি দিয়ে। এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে নীচের উঁচু-নিচু ল্যান্ডিং জোন। কী যে ঘটবে, একমাত্র ওপরঅলাই জানেন। যতই নীচে যাচ্ছে, বাতাসের বিরুদ্ধে ততই লড়তে হচ্ছে ওদেরকে। পাগলা হাওয়া উন্মাদের মত খেলতে চাইছে বিমানটাকে নিয়ে, আর্টিফিশিয়াল হরাইজন ইন্ডিকেটরে লেভেল মেইনটেন করতে রীতিমত যুঝছে পাইলটেরা।

'অলটিচ্যুড!' চেঁচিয়ে উঠল কনওয়ে।

'দু'শো ফুট!' পাল্টা চিৎকার করে জানাল টড। 'প্যাট, সীটবেল্ট ভাল করে বেঁধেছ তো?'

জবাবে যন্ত্রণাকাতর একটা গোঙানি শোনা গেল পিছন থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল কো-পাইলট। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নেভিগেটরের চোখের চারপাশ, কান আর নাকের ফুটো দিয়ে কলকল করে লাল ধারা বেরুতে দেখল সে, মুখের নীচের অংশে ইতোমধ্যেই ঠাণ্ডায় রক্ত জমে একটা প্রলেপ পড়ে গেছে। দুহাতে মাথা চেপে ধরে আছে প্যাট্রিক

রাইট, তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সে। পুরো শরীর এমনভাবে কাঁপছে যেন হাই ভোল্টেজ কারেন্ট বয়ে যাচ্ছে ভিতর দিয়ে। টডের চোখের সামনেই হঠাৎ বুক খামচে ধরল বেচারা, জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে আরও রক্ত দেখা গেল। কাঁপতে কাঁপতে নেভিগেশন টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল রাইট।

কনওয়ে চেঁচাল, 'মারকাস! হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুয়িং? আমার সাহায্য দরকার!'

সোজা হয়ে আবার কন্ট্রোলে হাত রাখল টড। জানাল, 'প্যাট্রিকের কিছু একটা হয়েছে, স্যর। ও আহত।'

'ফরগেট ইট! পরে ওর চিকিৎসা করা যাবে। ঠিকমত ল্যান্ড করতে না পারলে সবাই মারা পড়ব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল টড। 'স্পিড ওয়ান হানড্রেড নট!'

পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় এসে পড়েছে সি-নাইন্টি সেভেন। ডানা আর সারফেসের বিপরীতমুখী চাপে বাতাসে কুশন ইফেক্ট দেখা দিয়েছে এবার, সরাসরি মাটিতে আছড়ে না পড়ে সেটার কারণে ভেসে আছে বিমান এখন, উচ্চতা কমছে আগের চেয়ে ধীরে। কন্ট্রোল কলামের ওপর অবিশ্বাস্য প্রেশার সৃষ্টি হয়েছে, ইয়োক ধরে কাঁপছে কনওয়ে, টডকে সতর্ক করে দিতে পাশে তাকাতেই চমকে উঠল। হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেছে কো-পাইলটের, সামনের দিকে এলিয়ে পড়েছে সে, মুখ-কান-চোখ থেকে রক্তের ধারা বের হতে শুরু করেছে। আতঙ্ক বোধ করল মেজর, কী ঘটছে এসব?

কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার। পরে সাহায্য করা যাবে সঙ্গীদের, আগে নিরাপদে নামাতে হবে বিমানটাকে। কন্ট্রোল কলাম ধরে দাঁতে দাঁত পিষল সে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ভারি একটা বলের মত সারফেসে ড্রপ খেল স্ট্র্যাটোফ্রেইটার। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সামনে এগোচ্ছে, ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো। নাকের সামনে একরাশ তুষার

ছিটকে উঠেছে, কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাল কনওয়ে। বরফের সঙ্গে ঘষা খেয়ে অবশিষ্ট দুটো প্রপেলার ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল, ডানাটারও বিশাল একটা অংশ অদৃশ্য হয়েছে একইসঙ্গে। আহত পশুর মত ছুটতে থাকল বিমানটা, কিছুক্ষণের মধ্যে ফাটল ধরল ফিউজলাজে, তাও ছুটছে আগেরই মত।

ককপিটে ইয়োক থেকে হাত ছুটে গেছে কনওয়ের, সীটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় গোটা বিমানের সঙ্গে সে ঝাঁকি খেয়ে চলেছে, এখনও যে ঘাড় মটকে যায়নি এটাই আশ্চর্য। স্পীডোমিটার এখনও একশো নট দেখাচ্ছে... অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, গতি অনেক কমে যাবার কথা এতক্ষণে, হয়তো ইন্ডিকেটরটাই কাজ করছে না। দৃষ্টিসীমার মধ্যে শুধু শ্বেতশুভ্র বরফ দেখছে সে, কোনও রকম পয়েন্ট অভ রেফারেন্স নেই কোথাও। কোথায়, কতদূরে চলে যাচ্ছে বিমানটা, বোঝার কোনও উপায় নেই। ডানদিকে একটু কাত হয়ে আছে ফিউজলাজ, ঝাঁকিতে প্রবলভাবে কাঁপছে গোটা এয়ারফ্রেম, ক্যাঁচকোঁচ করে এই ভয়াবহ অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হাত ইয়োকে না থাকলেও পা দুটো এখনও পেডালে রয়েছে, বাঁয়ের রাডার ব্যবহার করল কনওয়ে, সিধে করল বিমানটাকে, যখন মনে হলো স্কিডটা কন্ট্রোলে এসেছে, ছেড়ে দিল পেডাল। নিঃশব্দে প্রার্থনা শুরু করল।

কিন্তু বেচারা জানে না, হিসেবে মারাত্মক ভুল হয়েছে তার। এতক্ষণ বাঁকা হয়ে থাকলেও ফাঁকা জায়গা ধরে সোজাই এগোচ্ছিল বিমানটা, এখন সেটার মুখ ঘুরে গেছে। বিপুল বেগে ছুটে যাচ্ছে একটা ছোট টিলা লক্ষ্য করে। সোজা গিয়ে সেটার গায়ে আছড়ে পড়ল স্ট্র্যাটোফ্রেইটার, তীব্র গতির কারণে ঢাল বেয়ে উঠে গেল ওপরে। চূড়া পর্যন্ত গিয়ে লাফ দিল শূন্যে, যেন র‍্যাম্প দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে কোনও কম্পিটিশনে অংশ নেয়া স্কিয়ার। আচমকা নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিৎকার করে উঠল

কনওয়ে, কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। টিলার ওপারে হাজারো উঁচু-নিচু বরফের ঢিবির মাঝখানে গিয়ে পড়ল বিমান, ঝাঁকিতে খসে গেল লেজের অংশ। এবার সত্যিই মাতাল হয়ে উঠল পৃথিবী, একেকটা টক্করের সঙ্গে খসে পড়তে থাকল প্লেনের একেকটা অংশ, এয়ারফ্রেম বেঁকে যেতে থাকল বিশ্রীভাবে, ককপিটের একের পর এক কাঁচ ভেঙে যেতে থাকল।

গতি কমতে শুরু করেছে সি-নাইন্টি সেভেনের। ধাক্কা খেয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত কুঁকড়ে যাচ্ছে ওটা, দেহ পরিণত হচ্ছে ধ্বংসস্তূপে। ঠোকর খেতে খেতে একটা ফুটহিলের বরফে নাক গুঁজে শেষ পর্যন্ত থামল ওটা। কনওয়ের শরীরে আর কোনও অনুভূতি অবশিষ্ট নেই, অবশ হয়ে গেছে সমস্ত নার্ভ। ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে ককপিটে ঢুকছে তুষার, ঠাণ্ডা অনুভব করল না সে। পায়ের কাছে জমা হচ্ছে বরফ, আটকা পড়ে যাচ্ছে বৈমানিক।

সবকিছু প্রথমে শুনশান মনে হলো, আসলে শ্রবণশক্তি কাজ করছে না। ধাতস্থ হয়ে নিল কনওয়ে, এখনও নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভয়াবহ ক্র্যাশটার পরও বেঁচে আছে সে। এই তো, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরুচ্ছে সাদা বাষ্প—বেঁচে থাকার সবচেয়ে' বড় প্রমাণ। বাইরে ফিউজলাজের গায়ে গুলির মত বিদ্ধ হয়ে ঝড়ো বাতাস আর তুষার বিকট শব্দ করছে, সেদিকে মনোযোগ দিল না মেজর। খালি হাতে মুখ মুছতেই তালুতে চাপা রক্ত দেখতে পেল। ব্যথা অনুভব করছে না, কিন্তু বুঝতে পারছে—আঘাতটা মারাত্মক। সামান্য কাটাছেঁড়া নয়, অঝোর ধারায় বইছে রক্ত। পাশে তাকিয়ে লেফটেন্যান্ট টডকে দেখল, প্যানেলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কো-পাইলটের নিষ্প্রাণ দেহ, রক্ত জমে লাল একটা মুখোশের মত হয়ে আছে।

'প্যাট!' দুর্বল গলায় ডাকল কনওয়ে। 'প্যাট, তুমি ঠিক আছ?'

কোনও সাড়া নেই। ক্রু-রা সবাই মারা গেছে। শোক করল না

অভিজ্ঞ পাইলট, জানে—এখন ভেঙে পড়লে তাকেও ওদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। মন শক্ত করে কাজে নামতে হবে। পরিস্থিতি একেবারে প্রতিকূল নয়। প্লেনে থিউলি বেসের জন্য ত্রিশ টন সাপ্লাই আছে, যাতে রয়েছে খাবার, ফুয়েল, কাপড়-চোপড় আর আর্কটিক গিয়ার। খুব শীঘ্রি রেসকিউ পার্টি আসবে তার খোঁজে, ততক্ষণ টিকে থাকা কোনও ব্যাপারই নয়।

শুধু যদি মাথার ব্যথাটা চলে যেত! শুধু যদি নাক-মুখ দিয়ে বের হওয়া রক্তের ধারাটা বন্ধ হতো!

দুই

সাম্প্রতিক সময়। ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

আবহাওয়া ভাল থাকলে কারনাটস্ট্রাসে নিয়মিতই দেখা যায় বৃদ্ধ আর তাঁর ড্যাকশুন্ডটাকে। শহরের প্রাণবিন্দুতে বিখ্যাত অপেরা হাউসের গা ঘেঁষে চলে আসা এই শপিং স্ট্রিটটা প্রতিদিনই হাজারো ট্যুরিস্টের ভিড়ে সরগরম থাকে, তারপরও নিত্যদর্শনে দোকানদাররা চিনে নিয়েছে সৌম্য মানুষ আর তাঁর পোষা ছোট্ট কুকুরটাকে। বছরের পর বছর এই পথে নিয়মিত হাঁটছেন বৃদ্ধ, বেশিরভাগ লোকই তাঁকে "*হের ডক্টর*" বলে চেনে, সঠিক নাম জানে না। অবশ্য উপাধিটা মোটেই ভুল নয়, সত্যিই একজন শিক্ষাবিদ তিনি।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। আবহাওয়ায় আরামদায়ক একটা উত্তাপ, বাতাসে খাবারের দোকান থেকে

ভেসে আসা পেস্ট্রি আর রাস্তার যানবাহনের গন্ধ। বৃদ্ধ ডক্টর বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়লেও একেবারে ভেঙে পড়েননি। নব্বুই চলছে তাঁর, অথচ দেখে অতটা মনে হয় না। সচরাচর দশটার আগে বের হন না, কিন্তু এখন বাজে মাত্র আটটা। আজ সকালে কুকুরটার চেইন হাতে ধরে দ্রুত পা চালাচ্ছেন তিনি, অন্যান্য দিনের মত চারপাশে চোখ বোলাচ্ছেন না। তাড়াটা সম্ভবত অবলা প্রাণীটাও বুঝতে পারছে, ছুটছে সেটাও।

জোহানেসগাসের মোড়ে এসে একটু দাঁড়ালেন বৃদ্ধ, রাস্তা পার হবেন। চোখের সামনে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল কয়েকটা লাল রঙের ট্রাম আর গাড়ি। একরাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারপাশ। প্রাচীন এই শহরের ঐতিহাসিক ভবনগুলোকে ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলছে এই ধোঁয়া। রুমাল দিয়ে নাক ঢাকলেন ডক্টর, তারপর অন্যান্য পথযাত্রীর সঙ্গে অতিক্রম করলেন রাস্তা। কিছুক্ষণের মধ্যে সেইন্ট অ্যান চার্চ এলাকার সংকীর্ণ পথে পৌঁছে গেলেন। গন্তব্য এসে গেছে।

সরু লেনের একপাশে ছোট্ট বাড়িটা—মাত্র দোতলা। সামনে একটা ছোট বাগান আছে, সেটার মাঝখান দিয়ে নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ চলে গেছে সামনের বারান্দা পর্যন্ত। ঢালু ছাদের দুপ্রান্ত বেঁকে গেছে খান্দানি গোঁফের মত, জানালাগুলোর উপরে রট আয়রনে নকশা করা। সদর দরজার পাশে ব্রোঞ্জের একটা ছোট নামফলক ঝুলছে। তাতে লেখা:

"ইন্সটিটিউট ফর অ্যাপ্লাইড রিসার্চ"

সদর দরজা খোলা। ভিতরে পা রাখতেই মাঝবয়েসী ফ্রাউ হার্জকে দেখতে পেলেন ডক্টর। বাড়ির হাউসকিপার মহিলা, থাকে নীচতলারই একটা কামরায়। বাতাসে তাজা কফি আর টর্ট কেকের গন্ধ ভাসছে, নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে সে। নিচু হয়ে ডাকশুন্ডটার চেইন খুলে দিলেন বৃদ্ধ, মুক্তি পেয়ে পিছনের বারান্দায় নিজের প্রিয় জায়গায় ছুটে চলে গেল কুকুরটা—রোদ

পোহাবে।

দরজায় শব্দ শুনে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসেছে ফ্রাউ হার্জ। অভিবাদন জানাল, 'গুটেন মর্গেন, হের নোভাক!' এগিয়ে এসে ডক্টরের জ্যাকেট খোলায় সাহায্য করল।

'গুটেন মর্গেন, ফ্রাউ হার্জ!' হেসে প্রত্যুত্তরে বললেন ডক্টর রাইমুন্ড নোভাক।

ত্রিশ বছর ধরে পরিচয় দুজনের, কিন্তু আজ অবধি কেউ কাউকে নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকেনি। দোষ-গুণ যা-ই হোক, সেটা ফ্রাউ হার্জের। ডক্টর নোভাক আর তাঁর সঙ্গী প্রফেসর সেমিল ড্রেশেল—এই প্রতিষ্ঠানের দুই কর্ণধারকে দেবতার মত সম্মান করে সে, কখনও ইনফর্মাল হবার চেষ্টা করে না। বহুবার বলেও কাজ হয়নি, ফলে সম্বোধনটা এখনও আগের মত রয়ে গেছে।

'প্রফেসর ড্রেশেল এসে গেছেন আগেই,' জানাল ফ্রাউ হার্জ। 'ওপরতলায় আছেন তিনি।'

'এসেছে কখন?' প্রশ্ন করলেন নোভাক।

'এই তো, ঘণ্টাখানেক হবে।'

মৃদু হাসলেন নোভাক। 'দশটায় বসব বলেছিলাম, ওর দেখছি তর সইছে না।'

'ঠিকই বলেছেন।' হাউসকিপারও হাসল। এই দুই বৃদ্ধকে ভাল করেই চেনে সে। শুধু প্রফেসর ড্রেশেল নন, ডক্টর নোভাকও কাজপাগল। যে-কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই। অবাক লাগে তার, পুরনো দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে এত পছন্দ কেন এঁদের? এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন, যেন ছোট্ট শিশু তার প্রিয় খেলনা পেয়েছে। 'নাশতা দেব?' জানতে চাইল সে।

'দরকার নেই, আমি খেয়ে বেরিয়েছি।' বলে সিঁড়ির দিকে এগোলেন নোভাক।

'ঠিক আছে, তা হলে শুধু কফি দিচ্ছি। লাঞ্চের সময় নাহয়

ওষুধগুলো নিয়ে-আসব।'

সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠতে শুরু করলেন নোভাক। এই ইন্সটিটিউট তাঁর ও প্রফেসর ড্রেশেলের দীর্ঘ সাধনার ফসল। গত চল্লিশ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছেন তাঁরা। আর সেটার প্রমাণ হিসেবেই যেন গোটা বাড়ি দখল করে আছে কয়েক লক্ষ বই আর পুরনো কাগজপত্রের স্তূপ। গুছিয়ে রাখতে আর পরিষ্কার করতে করতে ফ্রাউ হার্জ হাঁপিয়ে ওঠে। যত রুম আছে, তার সবই বুকশেলফে ঠাসা। তারপরও জায়গা হয়নি এই বিশাল কালেকশনের, করিডর থেকে শুরু করে যত রকম খালি জায়গা আছে, সবই দখল করেছে বই—শেলফ নয়তো মেঝেতে। বাড়ির একটা দেয়ালও উন্মুক্ত নেই। শুধু জানালাগুলোকে ছাড় দিয়েছেন দুই বৃদ্ধ স্কলার।

সিঁড়িসোজা ছোট্ট একটু দেয়াল শুধু রেহাই পেয়েছে এই অত্যাচার থেকে। সেখানে ভারি ফ্রেমে ঝুলছে একটা বিরাট পোর্ট্রেট... দুই বৃদ্ধের আদর্শ আর অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন ছবির মহান মানুষটি। নিজহাতে কোনও এক সময় ছবির কোনায় অটোগ্রাফ দিয়েছেন ভদ্রলোক—সাইমন ওয়েইসেনথাল। সঙ্গে লিখেছেন ছোট্ট একটা বাক্য—*"আর কখনও নয়।"*

বিখ্যাত এই মানুষটার পথই বেছে নিয়েছেন নোভাক আর ড্রেশেল। তাঁর মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বিভীষিকা থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসা ইহুদি তাঁরা। গত চল্লিশটা বছর ধরে ওয়েইসেনথালের অনুকরণে নাৎসি হান্টার হিসেবে কাজ করছেন। পুরনো দলিল-দস্তাবেজ আর বইপত্র ঘেঁটে খুঁজে বের করছেন ইহুদিদের কাছ থেকে জার্মানদের লুঠ করা স্বর্ণ আর মূল্যবান সম্পদের হদিস আর সেগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থা।

দোতলার ল্যান্ডিঙে পৌঁছে বাঁয়ে ঘুরে নিজের অফিসে ঢুকলেন নোভাক। রুমটা মাঝারি আকারের, জানালা দিয়ে তাকালে বাগানটা চোখে পড়ে। চারপাশের দেয়াল একটার পর একটা

বুকশেলফে ঢাকা পড়ে গেছে, ঠিক মাঝখানে মুখোমুখি বসানো হয়েছে দুটো ঢাউস ডেস্ক-টেবিল... ওখানে বসেই কাজ করেন তাঁরা। ধূমপানের কারণে তামাকের কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে, ডাক্তারের কড়া নিষেধ থাকলেও সেটা মানেন না দুই বৃদ্ধের কেউই।

'সেমিল, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি বসার কথা ছিল না,' অভিযোগের সুরে বললেন নোভাক, যদিও গলার স্বরে কোনও অসন্তোষ নেই।

টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকালেন প্রফেসর ড্রেশেল। মাথাজুড়ে টাক তাঁর, সেটাকে পুষিয়ে নেয়ার জন্যই বুঝি মুখভর্তি দাড়ি রেখেছেন। হাসিমুখে বললেন, 'তা হলে তুমিই বা আগেভাগে এসেছ কেন?'

জবাব দিতে না পেরে হেসে ফেললেন নোভাক। ডেস্কের পিছনে থাকা অ্যান্টিক চেয়ারটা টেনে বসলেন। 'নতুন ম্যাটেরিয়ালগুলো স্টাডি করা শুরু করে দিয়েছ বুঝি?'

'নইলে খামোকা সাত-সকালে এসেছি?' পাইপে টান দিয়ে ভকভক করে ধোঁয়া ছাড়লেন ড্রেশেল।

'ইম্পরট্যান্ট কিছু পেলে?'

'নিজেই দ্যাখো। আমি তোমার মাথায় কোনও আইডিয়া ঢোকাব না।'

ড্রয়ার থেকে নিজের পাইপ বের করলেন নোভাক, তামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন, তারপর একটা টান দিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়লেন। ফ্রাউ হার্জ রূপার একটা ট্রে-তে করে কফি নিয়ে হাজির হলো, সঙ্গে দু'গ্লাস পানি।

'আপনারা আজ এত সকাল-সকাল এসেছেন কেন, জানতে পারি?' কফি দিতে দিতে বলল হাউসকিপার। 'মনে হচ্ছে কাল লাস্ট আওয়ারে যে কুরিয়ারটা এসেছিল, সেটার কোনও ব্যাপার আছে।'

‘ঠিকই ধরেছ,’ বললেন ড্রেশেল। ‘স্টালিনগ্রাদের একটা সোর্স নিয়ে বেশ ক’দিন ধরে কাজ করছি আমরা, সেখান থেকেই এসেছে প্যাকেজটা।’ এখনও বিভিন্ন জায়গার পুরনো নাম ব্যবহার করতে পছন্দ করেন তিনি।

‘ওখান থেকে আগেও তো বিভিন্ন আর্কাইভ ম্যাটেরিয়াল এসেছে,’ বলল ফ্রাউ হার্জ।

‘আরে সেজন্যই তো উতলা হয়ে আছি। খুব বড় একটা ব্যাপারে আমাদের তথ্য দেয়া হচ্ছে ওখান থেকে। অথচ লোকটার নাম-ধাম কিচ্ছু জানি না আমরা। নিজ থেকেই কাগজপত্র পাঠানো শুরু করেছে। কোত্থেকে আমাদের খোঁজ পেল ঈশ্বরই জানেন। যেসব ডকুমেন্ট পাঠাচ্ছে সেগুলোও খুব ক্লাসিফায়েড। কীভাবে যোগাড় করছে, কে জানে!’

‘ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই,’ নোভাক যোগ করলেন। ‘সব ফার্স্টহ্যান্ড জার্মান অফিশিয়াল ডকুমেন্ট। আমরা যদ্দূর জানি, ১৯৪৫ সালে বার্লিন দখলের পর এগুলো সোভিয়েত আর্মির কবজায় চলে গিয়েছিল। যখের ধনের মত বিভিন্ন ডকুমেন্ট আগলে রেখেছিল তারা, কাউকে দেখতে দেয়নি। এখন দেখি সব বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে।’

‘আর সেগুলো বুঝি কেউ আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছে?’ হাউসকিপারের গলায় প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার সুর।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছেন দুই বৃদ্ধই। তাঁদের এই ইন্সটিটিউট অন্যান্যদের মত বড় বা নামকরা নয়। বিখ্যাতগুলোকে বাদ দিয়ে কেউ তাঁদের ওপর নির্ভর করবে, এমনটা ঠিক আশা করা যায় না। ড্রেশেল বললেন, ‘ব্যাপারটা যে রহস্যজনক, তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ যা পাচ্ছি, সব অথেনটিক। দু’মাস হলো আসা শুরু হয়েছে এগুলো। প্রথমে ছোট ছোট চিঠির আকারে আসছিল, মাঝে একটা বড় বাক্স এল—খেয়াল আছে? কাল যেটা পেয়েছি, সেটাতেও অনেক কাগজপত্র। আশ্চর্য একটা

ঘটনা জানতে পারছি আমরা ডকুমেন্টগুলো থেকে। শেষ পর্যন্ত কী ঘটল, সেটা হয়তো এই নতুন ডেলিভারিটা থেকে জানতে পারব।'

'তা হলে কাজ করুন আপনারা, আমি আর বিরক্ত করব না। বারোটায় লাঞ্চ দেব। এর মাঝে কিছু লাগলে বেল বাজাবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, ফ্রাউ হার্জ।' বলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নোভাক, ড্রেশেল মোটাসোটা একটা ফাইল বাড়িয়ে ধরেছেন তাঁর দিকে, ওপরে জার্মান আর্মির মনোগ্রাম।

গতকালকের ডাকে প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার ডকুমেন্ট এসেছে, এক এক করে সব পড়তে শুরু করলেন দুই বৃদ্ধ—দাঁড়ি-কমা কিচ্ছু বাদ দিচ্ছেন না। বেশিরভাগই বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর বার্লিন হেডকোয়ার্টারের মধ্যে পত্রালাপ, এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের ইনভয়েস আর মেমোর‍্যান্ডাম আছে। এক আলাদা জগতে মগ্ন হয়ে গেছেন তাঁরা, পুরনো কাগজের টুকরোগুলো তাঁদের নিয়ে গেছে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অতীতে। নাৎসিদের কর্মকাণ্ড আর চিন্তাচেতনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাচ্ছেন। ক্যাম্পে বন্দি মানুষগুলো তাদের চোখে একদল পশু ছাড়া আর কিছু ছিল না। স্থানান্তরের বিবরণগুলো এমনভাবে লেখা, যা দেখে বোঝার উপায় নেই যে জলজ্যান্ত মানবসন্তানদের কথা বলা হচ্ছে। *"নভেম্বরের ১০ তারিখে ডাকাউ থেকে ছ'হাজার, পিনেমুন্ডে থেকে এক হাজার"*—ঠিক এভাবেই শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হতভাগ্য মানুষগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে, নাম-ধাম হারিয়ে তারা পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র সংখ্যায়... পশুদের মত।

বেলা যত গড়াল, কাজে তত ডুবে গেলেন দুই গবেষক। পরস্পরের সঙ্গে কথা বললেন খুব কম; যখন বললেন সেটা কাজ সংক্রান্ত কোনও রেফারেন্স জানতে। ঘন ঘন পাইপ ধরালেন তাঁরা, পোড়া তামাকের ধোঁয়া আর গন্ধে রুম আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দুপুরে লাঞ্চের জন্য মাত্র পনেরো মিনিট বিরতি নিলেন তাঁরা, খেলেনও দ্রুত—নিঃশব্দে। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন

কাজে। দুপুরের ওষুধ টেবিলের ওপর পড়ে রইল, ফ্রাউ হার্জ এসে বার বার তাগিদ দেয়ার পর সেগুলো মুখে দিলেন তাঁরা।

বিকেল চারটায় সমস্ত ম্যাটেরিয়াল স্টাডি করা শেষ হলো। ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাগজপত্র সরিয়ে রাখলেন প্রফেসর ড্রেশেল। বললেন, 'নতুন কিছুই তো নেই দেখছি। শিপমেন্টটার শেষ গন্তব্য সম্পর্কেও কিছু জানা গেল না।'

কথাটা সত্যি। এতদিন ধরে যা যা তথ্য পেয়েছেন তাঁরা, সেসবেরই আরেকটু বিস্তারিত বিবরণ এই ডকুমেন্টগুলো। যেসব এসএস অফিসার আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম দেখেছেন, তার বেশিরভাগই পরিচিত।

ডক্টর নোভাক অবশ্য হাল ছাড়তে রাজি নন। বললেন, 'এত অস্থির হচ্ছ কেন? ধৈর্য ধরো, বন্ধু। রেকর্ড রাখার ব্যাপারে জার্মানরা অসম্ভব নিখুঁত ছিল। চাইলে একটা পেপারক্লিপের ইতিহাসও জানা যাবে, যদি কাগজপত্র সব পাওয়া যায় আর কী। আর আমরা তো খোঁজ করছি রাশিয়া থেকে লুঠ করা আটাশ টন সোনার! ওগুলো কোথায় গেছে না গেছে, কোথাও না কোথাও তার রেকর্ড থাকতে বাধ্য।'

ড্রেশেল হাসলেন। 'নেই তো বলছি না। আমি শুধু ভাবছি, আমাদের রহস্যময় পৃষ্ঠপোষকের কাছে সেগুলো আছে কি না। আর থাকলে আমাদের কাছে পাঠাবে কি না।'

'খামোকা দুশ্চিন্তা করছ,' ইতোমধ্যে দেখে ফেলা একটা ফাইলের পাতা নতুন করে উল্টাচ্ছেন নোভাক। 'ভুলে যাচ্ছ কেন, কনসাইনমেন্টটার ব্যাপারে সে-ই আমাদের প্রথম জানিয়েছে। এমনকী এখন পর্যন্ত যত কাগজপত্র পেয়েছি, সবই তার পাঠানো। আমার তো মনে হয় সোনাগুলো খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের চেয়ে লোকটার নিজেরই বেশি আগ্রহ। কোনও রকম রেকর্ডের হদিস পেলে ঠিকই পাঠিয়ে দেবে আমাদের...' বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। চোখের ওপর চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পড়লেন ফাইলের একটা অংশ। 'সেমিল, তুমি তো দেখি একটা জিনিস ঠিকমত খেয়াল করোনি।'

'ঠিকমত খেয়াল করিনি মানে?' আহত কণ্ঠে বললেন ড্রেশেল। 'কোথায়?'

ফাইল থেকে একটা ইনভয়েস বের করে বন্ধুর হাতে দিলেন নোভাক। 'তলার সাইনটা... জনৈক মেজর সেবাস্টিয়ান গ্রাব। সোনাগুলো যখন ১৯৪৩ সালের ২৯শে জুন হ্যামবার্গ পৌঁছায়, সে রিসিভ করেছিল!'

'তা-ই তো দেখছি,' বললেন ড্রেশেল। 'এটা আমার চোখ এড়াল কী করে?'

'ও কিছু না,' বললেন নোভাক। 'কাজের চাপ বাড়লে ছোটখাট দু'একটা ভুল হতেই পারে। সে যাক গে, এই মেজর গ্রাবটা আবার কে? এই প্রথম তার নাম দেখছি।'

'আমিও,' ড্রেশেল একমত হলেন। 'আগে কখনও শুনিনি নামটা। অন্তত এই পার্টিকুলার কেসটাতে তো নয়ই। কে এই লোক? এসএস বা ইউ-বোট স্কোয়াড্রনের কেউ হতে পারে না। মেজর আর্মির র‍্যাঙ্ক, নৌবাহিনীর নয়।'

দুশ্চিন্তা ভর করল দুই বৃদ্ধ গবেষকের মধ্যে। হ্যামবার্গের মত একটা বন্দরনগরীতে কেন নেয়া হয়েছে সোনাগুলো? সাগরপথে ইয়োরোপের বাইরে পাচার করে দেয়ার জন্য নয়তো? সেক্ষেত্রে সেগুলোর হদিস বের করা তাঁদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে। বিশাল আকারের কোনও ইনফরমেশন-সার্চ করার মত সামর্থ্য নেই তাঁদের। কে জানে, হয়তো শেষ পর্যন্ত বড় কোনও এজেন্সির কাছেই কেসটা পাঠিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন দুই বৃদ্ধ।

'আমি এখুনি হাল ছাড়ার কোনও কারণ দেখছি না,' দৃঢ় গলায় বললেন নোভাক। 'আমাদের হাতে ছোট্ট একটা সূত্র তো আছে! মেজর সেবাস্টিয়ান গ্রাবকে খুঁজে বের করতে পারি

আমরা। সে নিশ্চয়ই বলতে পারবে, হ্যামবার্গ থেকে কোথায় গেল সোনাগুলো।'

'এতদিন বেঁচে আছে কি না কে জানে!' ড্রেশেলের গলায় শঙ্কা।

'সে না থাকলে তার ছেলেমেয়ের কাছে যাবো। তাদের কাছেও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।'

'এত ঝামেলায় না গিয়ে ক'টা দিন অপেক্ষা করি না কেন?' শান্তস্বরে বললেন ড্রেশেল। 'রাশিয়া থেকে নতুন আরও তথ্য আসতে পারে। সেখান থেকেই হয়তো জানা যাবে কনসাইনমেন্টটার খবর।'

'আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে চাই না,' গম্ভীর গলায় বললেন নোভাক। 'রাশিয়ার সোর্সের ওপর নির্ভর করে থাকলে রিসার্চ চলবে কীভাবে? ভুলে যাচ্ছ কেন, এতবড় কেস আগে কখনও পাইনি আমরা। আটাশ টন সোনা! তারমানে আজকের হিসেবে এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি দাম ওগুলোর। আমাদের হতভাগ্য ইহুদি ভাই-বোনদের কাছ থেকে জার্মান জানোয়াররা ওগুলো লুঠ করে এনেছিল। যতক্ষণ না আসল মালিকদের কাছে ওই সোনা ফিরিয়ে দিতে পারছি, ততক্ষণ শান্তি পাবো না আমি।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তিনি।

বন্ধুর আবেগ ড্রেশেলকেও স্পর্শ করল। দৃঢ় গলায় তিনি বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত, বন্ধু। যেমন করে হোক, ওই সোনা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।'

বিকেলের চা নিয়ে ফ্রাউ হার্জ এসেছে, ঢুকেছে ঘরে। দুই ভদ্রলোকের চেহারা দেখে টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'কী নিয়ে আপনারা এত উত্তেজিত, বলুন তো?'

'এক জার্মান মেজরের নাম পেয়েছি আমরা,' বললেন ড্রেশেল। 'তার কাছে একটা হারানো কনসাইনমেন্টের খবর পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।'

'মেজর? যুদ্ধের সময়ের?' ভুরু কোঁচকাল ফ্রাউ হার্জ। 'মাঝখানে যে ষাট বছরের বেশি কেটে গেছে, সেটা ভুলে যাননি তো?'

'এত অবাক হচ্ছ কেন?' নোভাক বিরক্ত হলেন। 'আমি আর সেমিল যদি বেঁচে থাকতে পারি, সে পারে না? ভাগ্যদেবী প্রতারণা না করলে ঠিকই তাকে পাবো আমরা। আমাদের টপ অপারেটিভকে পাঠাব তাকে ইন্টারভিউ করতে...'

কার কথা বলা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল অভিজ্ঞ হাউসকিপার। প্রতিবাদের সুরে সে বলল, 'মেয়েটাকে আবারও এসবে না জড়ালে বুঝি আপনার চলে না, হের নোভাক? তার নিজের একটা জীবন আছে, তাতে কেন শুধু শুধু বাগড়া দেয়া?'

কথাটায় মনে হলো ডক্টর নোভাক আহত হয়েছেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'লিয়া আমার নাতনি, তার ভালমন্দ আমি ভালই বুঝি। তুমিই বা সবসময় এত বাধা দাও কেন? ও তো কখনও আপত্তি করে না।'

'করবে কীভাবে? আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তো কেবল আপনিই বেঁচে আছেন। এই অবস্থায় কিছু বললে বেচারি ফেলতে পারে?'

কথা হচ্ছে ডক্টরের নাতনি লিয়া নোভাককে নিয়ে। যুদ্ধের সেই বীভৎসতা দেখার পর আর কখনও মাতৃভূমি জার্মানিতে ফিরে যাননি বৃদ্ধ গবেষক, অস্ট্রিয়ায় নতুন ঠিকানা গড়ে এখানেই থিতু হয়েছেন, নিভৃতে গবেষণা করে যাচ্ছেন। তাঁর ছেলে বড় হবার পর অবস্থাটা মেনে নিতে পারেনি। চাকরি পেয়ে দেশে ফিরে যায় সে, বিয়ে করে, বাচ্চারও জন্ম হয়। লিয়ার বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন মারা যায় সে। মেয়েটা মাকে হারায় আঠারোয় পড়ার পর। এরপর কয়েক বছর দাদার সঙ্গে কাটিয়েছে সে। এমবিবিএস করে চলে গেছে জার্মানিতে। এখন মিউনিখের একটা হাসপাতালে রেসিডেন্ট ডাক্তার হিসেবে কাজ করছে। এমনিতে খুব দুঃসাহসী প্রকৃতির মেয়ে সে, সুযোগ পেলেই কোনও

না কোনও অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। দুই গবেষকের ইন্সটিটিউটের অপারেটিভ হিসেবেও কাজ করে সে। জার্মানির কোথাও তথ্য সংগ্রহ করতে হলে তাকেই দায়িত্ব দেন ডক্টর নোভাক।

'আপনাদের হয়ে কাজ করতে করতে কোনও ফুরসতই পায় না মেয়েটা,' বলল ফ্রাউ হার্জ। 'এতদিনে বিয়ে-শাদী করে বাচ্চাকাচ্চার মা হয়ে যাবার কথা তার।'

'এটা ঠিক না,' নোভাকের সমর্থনে বললেন ড্রেশেল। 'আমরা থাকায় বরং সে কিছুটা স্থির আছে। নইলে এতদিনে পুরো যাযাবর হয়ে যেত, অ্যান্টার্কটিকা থেকে স্পিটজ্‌বার্গেন পর্যন্ত যত পাহাড় আছে, সবগুলোয় চড়ে বেড়াত। কাজ যা দিই, তাতে একটা লক্ষ্য খুঁজে পায়।'

'ওটা আপনাদের জীবনের লক্ষ্য, ওর নয়,' জানাল ফ্রাউ হার্জ। কথাটা এমনভাবে শেষ করল, যেন আর কিছু বলার নেই তার। তাকাল ডক্টর নোভাকের দিকে। 'আপনি কি এখন বাড়ি ফিরবেন, হের নোভাক? দেরি করলে কিন্তু সাপারের আগে পৌঁছাতে পারবেন না।'

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নোভাক। 'চলেই যাই। সেমিল, তুমি উঠবে না?'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর ড্রেশেল। 'আমি আরেকটু থাকব। আর্কাইভের পুরনো কাগজপত্র খুঁজে দেখি, হয়তো মেজর গ্রাবের ব্যাপারে কোনও তথ্য আছে কোথাও।'

'ঠিক আছে, আমি তা হলে আসি। আগামীকাল দেখা হবে। বলা যায় না, এর মধ্যে রাশিয়া থেকে নতুন কিছু চলেও আসতে পারে। গুড নাইট।'

•

ইনস্টিটিউট থেকে কয়েক ব্লক দূরে একটা বহুতল ভবন দাঁড়িয়ে আছে। স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য তৈরি করা ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টের এই বিল্ডিংটা আশপাশের বাড়িঘরের তুলনায়

একেবারেই বেমানান। সেটার একদম ওপরের তলা থেকে ইন্সটিটিউটটা পরিষ্কার দেখা যায়, যদিও এই উচ্চতা আর দূরত্বে দোতলা ভবন আর সামনের বাগানটা এই বিশাল নগরীর পাথুরে জমি আর অ্যাসফল্টের মাঝখানে স্রেফ দুটো বিন্দুর মত দেখায়। টপ ফ্লোরের মনুষ্যবিহীন একটা অ্যাপার্টমেন্টের জানালার পাশে স্থাপন করে রাখা আছে অত্যাধুনিক একটা স্বয়ংক্রিয় লং রেঞ্জ রেকর্ডিং ডিভাইস, যেটা দরজা বা জানালার কাঁচের ভিতর থেকে আসা শব্দের ভাইব্রেশন লেজারের মাধ্যমে পরিমাপ করে কথোপকথন রেকর্ড করতে পারে। এই মুহূর্তে যন্ত্রটার বীম তাক করা আছে ডক্টর নোভাক আর প্রফেসর ড্রেশেলের অফিসের জানালার দিকে। দুই বৃদ্ধ নাৎসি হান্টার জানেন না, যে-শত্রু বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে বলে তাঁরা ভেবেছেন, তারা ওঁদের সমস্ত গোপন কথা জেনে ফেলতে যাচ্ছে।

তিন

হ্যামবার্গ, জার্মানি।

অদ্ভুত এক স্থির ভঙ্গিতে কনফারেন্স রুমের চেয়ারে বসে আছে ইয়োহান শ্নাইডার। নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস নিলেও কোটের আড়ালে তার বুকের ওঠানামা তেমন একটা বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে চোখের পলক না ফেললে হয়তো বা মূর্তি বলেই ভ্রম হতো। গত একটি ঘণ্টা ধরে এভাবেই বসে আছে সে।

পাশেই টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ

করে। এতক্ষণে নড়ল সে, তবে সেটাও খুব সামান্য, শরীর স্থির রেখে ডান হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল, ঠেকাল কানে।

'ইয়েস, সোনিয়া?'

ওপাশ থেকে পার্সোনাল সেক্রেটারির গলা শোনা গেল। 'বোর্ড মেম্বাররা সবাই এসে গেছেন, হের শ্নাইডার। তাঁদের কি ভিতরে নিয়ে আসব?'

'প্লিজ,' বলে টেবিলের তলার একটা বোতাম চাপল ইয়োহান। মৃদু গুঞ্জনের সঙ্গে সক্রিয় হলো জানালার স্বয়ংক্রিয় পর্দা, সরে এসে ঢেকে দিল বিশালাকার পিকচার উইন্ডোগুলোকে। দূরে আলস্টার নদীর দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে।

কনফারেন্স রুমের ভারি দরজা খুলে গেল, মিটিঙের জন্য আসা ছ'জন বোর্ড মেম্বারকে পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে এল সেক্রেটারি, আসন দেখিয়ে দিল। তাদের বসার জন্য সময় দিল ইয়োহান, তারই ফাঁকে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'প্যারিস থেকে ফ্রেডারিখ কার্ন কি ফিরেছে, সোনিয়া?'

'জী। এই এক ঘণ্টার মত হবে।'

'ওকে বোলো মিটিঙের পর আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।'

'ইয়েস, স্যর,' মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারি। বন্ধ করে গেল কনফারেন্স রুমের দরজা।

এবার আগতদের দিকে তাকাল ইয়োহান। তার মুখোমুখি, কনফারেন্স টেবিলের উল্টোদিকে বসে আছে বোর্ডের সত্তর বছর বয়স্ক চেয়ারম্যান হাইঞ্জ গেরহার্ড। তার ঠিক পাশেই বসা মারিয়া শিলার, এ বছর বাষট্টিতে পা দিয়েছে সে। অবশিষ্ট চারজন ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য হলেও কোম্পানি চলে ইয়োহান, গেরহার্ড আর মারিয়ার সিদ্ধান্তে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তারা তিনজন হচ্ছে *স্যাকলিচ এজি* মানে স্যাকলিচ কর্পোরেশনের মূল তিন প্রতিষ্ঠাতার সন্তান, শেয়ারের দিক থেকেও অন্যদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ক্ষমতার মালিক তারা।

'গুড আফটারনুন, জেন্টলমেন। গুড আফটারনুন, মারিয়া,' প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবাইকে স্বাগত জানাল ইয়োহান।

'কেমন আছ, ইয়োহান?' হাসিমুখে বলল মারিয়া শিলার। 'গ্লোরিয়া আর বাচ্চারা ভাল আছে তো?'

'ওরা সবাই বাভারিয়ার লজে ছুটি কাটাতে গেছে,' জানাল ইয়োহান।

'তুমিও যাবে নাকি?'

'যদি সময় করতে পারি,' বলে হাতের কাছের পানির গ্লাসটা তুলে চুমুক দিল ইয়োহান। এটা আসলে ইঙ্গিত, ব্যক্তিগত বিষয়ে আর আলোচনা করতে চায় না সে।

এবার অন্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মারিয়া। ব্যাপারটাকে নারীসুলভ দুর্বলতা ভাবার কোনও অবকাশ নেই। ব্যবসাটাকে যে কোনও পুরুষের চেয়ে ভাল বোঝে মহিলা, কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে এক ইঞ্চিও পিছপা হয় না। আড়ালে তাকে অনেকে ডাইনী বলে ডাকে। এসব ভদ্রতা বা আন্তরিকতা সম্পূর্ণই লোক দেখানো।

হালকা কথাবার্তা শেষ হলে মুখ খুলল হাইঞ্জ গেরহার্ড। মোটামুটি বিশালদেহীই বলা যায় তাকে, বয়েসের খুব একটা ছাপ পড়েনি শরীরের কোথাও। 'এবারের কোয়ার্টারলি প্রজেকশন দেখেছি আমি। আমাদের ক্যাপিটাল রিজার্ভের যে অবস্থা, তাতে শুধু ইউরোফাইটারের অ্যাভিয়োনিক্স কন্ট্রাক্টের ওপর এভাবে নির্ভর করে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ডিলটা পানিতে পড়লে পরিস্থিতি সামাল দেয়ায় কোনও উপায় থাকবে না।'

'ইউরোফাইটারের নেক্সট জেনারেশন কম্পিউটারগুলো কারা বানানোর দায়িত্ব পাবে, এই ঘোষণা আসতে এখনও এক মাস বাকি আছে বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয়তা পেয়েছি—স্যাকলিচের কম্পিউটার উইংই পেতে যাচ্ছে কাজটা।' কথাটা ইয়োহান এমন দৃঢ়ভাবে বলল যে চেয়ারম্যান চুপ হয়ে গেলেন। বাকি বোর্ড

মেম্বাররাও এটা জানতে চাইল না—তাদের প্রেসিডেন্ট কীভাবে এই মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্টটা বাগিয়েছেন। এটাই ঘটে আসছে দিনের পর দিন। নিজের বুদ্ধি, মেধা আর চতুরতা দিয়ে একটার পর একটা কাজ হাত করে ইয়োহান; এ নিয়ে আর কাউকে মাথা ঘামাতে হয় না। এ কারণেই মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসেই জার্মানির সবচেয়ে বড় কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছে সে। বিজনেস উইক পত্রিকা তাদের একটা ফিচারে তাকে *"সুপারম্যান অভ বিজনেস ওয়ার্ল্ড"* বলে আখ্যা দিয়েছে।

'তা হলে কি আমরা ধরে নেব, ফ্রেঞ্চরা আমাদের টেক্কা দিতে পারছে না?' জানতে চাইল ক্লাউস ওবারব্যাচ, স্যাকলিচ এজি'র চিফ লিগাল কাউন্সেল।

ইয়োহানের মুখে হাসি ফুটল। 'আমাদের চেয়ে ত্রিশ পার্সেন্ট বেশি বিড করেছে ওরা। তাই স্যাকলিচের অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে গ্যাপটাকে দশে নামিয়ে আনতে যাচ্ছি আমরা। কন্ট্রাক্ট তো পাবোই, মাঝখানে ন্যাটোর পকেট থেকে অতিরিক্ত দুশো মিলিয়ন মার্ক ফাও আদায় করা যাবে।'

'বিড সংক্রান্ত এই ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশনই কি হের কার্ন প্যারিস থেকে এনেছেন?'

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত নয়। মুচকি হেসে ইয়োহান বলল, 'আমার স্পেশাল-প্রজেক্টস্ ডিরেক্টর তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে খুব সতর্ক। ফ্রেঞ্চরা টের পেয়ে গিয়ে অ্যামাউন্ট পাল্টে ফেলবে, এমন ভয় নেই।'

'সেটা নিশ্চিত করতে বেআইনী কোনও পদক্ষেপ নেয়া হয়নি তো?'

কথাটা শুনে বিরক্ত চোখে ওবারব্যাচের দিকে তাকাল ইয়োহান। লোকটার বাঁকা প্রশ্ন তার মোটেই পছন্দ হয়নি। এ নতুন কিছু নয়, সুযোগ পেলেই তাকে খোঁচা মারতে চায় ওবারব্যাচ। কারণটাও একেবারে অবোধগম্য নয়। আজ পঁচিশ

বছর ধরে স্যাকলিচের সঙ্গে জড়িত সে, অনেক শ্রম দিয়েছে এ কোম্পানিতে। আঠারো মাস আগে যখন শেষ প্রেসিডেন্ট মারা গেলেন, মনে মনে পদটা সে-ই আশা করেছিল। কিন্তু বোর্ড মেম্বাররা, বিশেষ করে গেরহার্ড আর মারিয়ার চিন্তাভাবনা ছিল অন্যরকম। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব তাদের তিন পরিবারের বাইরে যেতে দিতে রাজি ছিল না তারা, এ কারণে মাত্র ত্রিশের কোঠায় থাকা ইয়োহানের শিকেয় ছিঁড়েছে ভাগ্য। অবশ্য সিদ্ধান্তটা একেবারে ভুল ছিল না, দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে রীতিমত চমক দেখিয়ে চলেছে ইয়োহান। ইয়োরোপের শীর্ষ বিশটা কোম্পানির ভিতর তুলে এনেছে স্যাকলিচ এজি'কে। তারপরও বঞ্চনার জ্বালায় জ্বলছে ওবারব্যাচ, ব্যাপারটাকে সে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছে। যদিও করার কিছু নেই, তারপরও সুযোগ পেলেই দুয়েকটা কথা শুনিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। হাজার হোক, কোম্পানিতে ইয়োহানের চেয়ে বিশ বছর বেশি অভিজ্ঞতা আছে তার।

কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল কনফারেন্স রুমের ভিতর। ঠাণ্ডা চোখে ওবারব্যাচের দিকে তাকিয়ে রইল ইয়োহান, দৃষ্টির ঠাণ্ডা আগুনে ভস্ম করে দিতে চায় অবাধ্য লিগাল কাউন্সেলকে। ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল ওবারব্যাচ। এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর গলা খাঁকারি দিল ইয়োহান।

'আপনাদের সবাই জানেন কেন আজকের এই মিটিং ডাকা হয়েছে,' গমগম করে উঠল তার কণ্ঠস্বর। 'জার্মানির সবচেয়ে বড় কোম্পানি হওয়া সত্ত্বেও রিকনসিলিয়েশন কমিশনকে এখন পর্যন্ত কোনও সহযোগিতা করিনি আমরা। তবে স্যাকলিচের যুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ডের ডকুমেন্টেশন ওদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দিন দিন চাপ বাড়ছে। এ ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের।'

পৃথিবীব্যাপী মানবতাবাদী সংগঠনগুলোর ক্রমাগত দাবির মুখে দেরিতে হলেও সম্প্রতি আন্তর্জাতিকভাবে গঠিত হয়েছে

ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকনসিলিয়েশন কমিশন—কথা হচ্ছে সেটার ব্যাপারেই। বিভিন্ন ধরনের তদন্ত চালাচ্ছে তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের সহায়তায় অন্যায়ভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান অবৈধ অর্থের মালিক হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জরিমানা করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের অর্থ, যা কিনা যুদ্ধে নিহত আর ক্ষতিগ্রস্তদের বংশধরদের পুনর্বাসনসহ অন্যান্য মানবকল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হবে। স্যাকলিচ কর্পোরেশনও প্রাথমিকভাবে দোষী প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় পড়েছে। যদিও সে আমলের বোর্ড অভ ডিরেক্টরসের কেউ এখন আর বেঁচে নেই, তারপরও পূর্বপুরুষদের পাপের দায় এখনকার কর্ণধারদেরই বহন করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা একেবারেই মানতে পারছে না কেউ, শুরু থেকেই নানাভাবে কমিশনকে এড়াতে চেষ্টা করছে তারা।

'যতদিন সম্ভব তদন্তটাকে বাধা দিয়ে রেখেছি আমরা,' বলে চলল ইয়োহান, 'কিন্তু ফলাফলটা একদমই ভাল হয়নি। মিডিয়া কীভাবে হইচই করছে, তা তো আপনারা সবাই দেখছেন। শুরুতে প্রতিক্রিয়া না দেখালেও এসব অপপ্রচারে সাধারণ জনগণ এখন আমাদের সন্দেহ করছে, আমাদের প্রোডাক্টও এড়িয়ে চলতে চাইছে। বলতে দ্বিধা নেই, কমিশনের সঙ্গে লুকোচুরি করতে গিয়ে কোম্পানির রেপিউটেশন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অ্যাডভার্টাইজিং আর মার্কেটিঙে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়তি বিনিয়োগ করার পরও সব ডিভিশনের সেলস কমে গেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হেভি কনস্ট্রাকশন সেক্টরে। অবস্থা যা দেখছি, নিজেদের নাম পরিষ্কার না করা পর্যন্ত লোকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহী নয়।'

'রিকনসিলিয়েশন কমিশনকে কো-অপারেট না করার বুদ্ধিটা আপনারই ছিল,' ওবারব্যাচের গলায় স্পষ্ট অভিযোগ। 'সেজন্য এসব ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।' এতক্ষণে কিছুটা

সমর্থন পেয়েছে সে, অন্যান্য মেম্বাররা মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

ইয়োহান শান্ত রইল। 'এখনও আমি মনে করি, সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল না। ভুলে যাচ্ছেন কেন, যুদ্ধের সময় আমরা কেউই এই চেয়ারে ছিলাম না। সে-সময় কোম্পানি কী কী কাজ করেছে, সেসব ঠিকমত না জেনে কমিশনের কাছে সমস্ত পুরনো রেকর্ডস্ জমা দিলে খাল কেটে কুমির ডেকে আনা হতো। চোখের পলকে দেখতেন, বিলিয়ন-বিলিয়ন মার্কের মামলা-মোকদ্দমার তলায় চাপা পড়ে গেছি আমরা। সেজন্য কিছুটা সময় দরকার ছিল, যাতে সমস্ত কাগজপত্র স্টাডি করে নিতে পারি।'

'স্টাডি করে লাভ কী?' ঠোঁট ওল্টাল ওবারব্যাচ। 'জরিমানা না দিয়ে কী পার পাওয়া যাবে? যুদ্ধের আগে স্যাকলিচ স্রেফ একটা লোহার কারখানা ছিল, যাতে মাত্র একশো শ্রমিক কাজ করত। কোম্পানির যা এক্সপ্যানশন হয়েছে, সবই নাৎসি আমলের মিলিটারি আর সরকারী কন্ট্র্যাক্টের কল্যাণে। অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে আমাদের পুরনো বোর্ড ডিরেক্টরদের শুধু ওঠাবসা নয়, রীতিমত দহরম-মহরম ছিল। এই কোম্পানির ফুলে-ফেঁপে ওঠার পিছনে নাৎসিদের সরাসরি আশীর্বাদ ছিল।'

'সেটা কেউ অস্বীকার করছে না,' বলল ইয়োহান। 'কিন্তু সেই আমলের স্যাকলিচ ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে আজকেরটাকে মেলালে তো হবে না। আমরা এখন সম্পূর্ণ বৈধ ব্যবসা করছি। তারপরও অতীতকে একেবারে ভুলে যেতে বলছি না। জনসমক্ষে আসতে রাজি আছি আমি, কিন্তু তার আগে জানতে হবে—যুদ্ধের সময়ে যা যা ঘটেছে, তাতে কোম্পানির দায়বদ্ধতা কতটুকু। কমিশন আমাদের কী পরিমাণ জরিমানা করতে পারে, আর সেটা কমানোর কোনও কায়দা আছে কি না।'

'চমৎকার ভাষণ,' বলল মারিয়া শিলার। 'সবাই তোমার রিস্ক-ম্যানেজমেন্ট স্কিলের প্রশংসা করে। এখন কথা হচ্ছে, এই বিশেষ ব্যাপারটা তুমি কীভাবে ট্যাকেল করতে যাচ্ছ?'

'স্ট্র্যাটেজিটা খুব সিম্পল,' জানাল ইয়োহান। 'আমরা জরিমানা দেব। তবে অঙ্কটা আমাদের নিজেদের ঠিক করা থাকবে। এমন একটা অ্যামাউন্ট, যেটা একই সঙ্গে কমিশনকে সন্তুষ্ট করবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও আমাদের কোম্পানির বিশ্বস্ততা প্রমাণ করবে।'

ভুরু কোঁচকাল গেরহার্ড। 'এটা কীভাবে সম্ভব যে আমাদের ঠিক করে দেয়া অ্যামাউন্ট নিতে রাজি হবে কমিশন? ওখানে আমাদের কোনও লোক নেই।'

'এখানেই কৌশল খাটাতে যাচ্ছি আমরা,' ইয়োহান মুচকি হাসল। 'গত এগারোটা মাস ধরে আমি এ নিয়েই কাজ করছি। কোম্পানির সমস্ত পুরনো নথি যাচাই-বাছাই করেছি। কমিশনের সামনে এমনভাবে বিভিন্ন ডকুমেন্ট দেয়া হবে, যাতে আমাদের প্রজেক্ট করা অ্যামাউন্টের চাইতে বেশি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে ওরা না পারে।'

'পরিমাণটা কত?'

'দুশো মিলিয়ন মার্ক।'

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল কনফারেন্স রুমের ভিতর। ইয়োহান সামান্য সময় দিল সবাইকে ব্যাপারটা হজম করার জন্য, তারপর উঁচু গলায় বলল, 'অ্যাটেনশন, প্লীজ। যে অঙ্কটা বললাম, সেটা অনেক গবেষণা করে বের করা। এরচেয়ে কম দিতে গেলে কমিশন মানবে না, আমরা কী কী গোপন করছি—সেটার ব্যাপারেও সন্দিহান হয়ে উঠবে।'

'দুশো মিলিয়ন আপনার কাছে কম মনে হচ্ছে?' খ্যাপাটে গলায় বলল ওবারব্যাচ।

'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই খরচ আমাদের লঙ-টার্ম গ্রোথে কোনও প্রভাব ফেলবে না,' শান্ত গলায় বলল ইয়োহান। 'টাকাটা আমরা দু'বছরের ভিতর তুলে আনতে পারব। কিন্তু তার আগে কমিশন আর ভোক্তা শ্রেণীকে সন্তুষ্ট না করলে সব মাঠে মারা

যাবে। আর কোনও ব্যবসাই করতে পারব না আমরা।'

'কবে নাগাদ কাগজপত্রগুলো রেডি হবে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'সব তৈরি আছে,' জানাল ইয়োহান। 'ফ্রেডারিখ কার্ন আর স্টাফরা মিলে প্রায় এক লাখ পৃষ্ঠা সাজিয়েছে। ওগুলোই কমিশনের হাতে তুলে দেব আমরা। শুধু বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষা।'

'ক্ষতিপূরণের অঙ্ক আবার বেড়ে যাবে না তো?'

'কমিশন খুব বেশি হলে আড়াইশো মিলিয়ন দাবি করতে পারে।'

'আড়াইশো! এইমাত্র না বললে দুশো!'

'দর কষাকষির জন্য হাতে সামান্য মার্জিন থাকা দরকার, নইলে লোকে সন্দেহ করবে। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, দুশো মিলিয়নের বেশি এক মার্কও দিতে হবে না আমাদের।'

আবারও নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। মাঝখান থেকে হারমান ফ্রিৎজ নামে এক বোর্ড মেম্বার জানতে চাইল, 'কমিশনের কাছে কী কী গোপন রাখছি আমরা?'

'সত্যি বলতে কী, খুব সামান্য,' উত্তর দিল ইয়োহান। 'আমাদের কোম্পানি মূলত যুদ্ধবন্দিদের স্লেভ লেবার হিসেবে ব্যবহার করেছে, আর কিছু না। কন্ট্র্যাক্ট-টন্ট্র্যাক্ট যা পেয়েছিল, তাতে তেমন কোনও অনিয়ম নেই। শুধুমাত্র নাৎসিদের একটা বিশেষ প্রজেক্টের সঙ্গে যদি আমরা জড়িত না থাকতাম, তা হলে কোনও কিছুই গোপন করার প্রয়োজন ছিল না।' চকিতে গেরহার্ড আর মারিয়ার দিকে তাকাল সে। 'এ মুহূর্তে গোপনীয়তার স্বার্থে আর কিছু বলতে পারছি না। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, খুঁজলেও আমাদের সাপ্লাই করা নথিপত্রের বাইরে এক টুকরো কাগজ পাবে না কেউ।'

'জেন্টলমেন,' বলে উঠল হাইঞ্জ গেরহার্ড, 'আমি আর মারিয়া

কিছুক্ষণ একান্তে ইয়োহানের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনারা দয়া করে একটু বাইরে যান।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল বাকি বোর্ড মেম্বাররা, তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেল। সবার প্রস্থানের জন্য অপেক্ষা করল চেয়ারম্যান, তারপর ফিরল ইয়োহানের দিকে।

'তুমি তা হলে প্যান্ডোরা প্রজেক্টের কথা ধামাচাপা দিতে চাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল স্যাকলিচ এজি'র কমবয়েসী প্রেসিডেন্ট। 'দিতেই হবে। ওটা ফাঁস হলে আমরা শেষ হয়ে যাব। শুধু ক্ষতিপূরণই বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। কোম্পানির নৈতিকতার রেপিউটেশনের কথা কী আর বলব! সাধারণ মানুষ জানতে পারলে ঘৃণায় স্যাকলিচের সব প্রোডাক্ট বর্জন করবে। স্রেফ পথে বসব আমরা।'

'আমি এখনও এটা মেনে নিতে পারছি না,' বলল মারিয়া। 'অন্যের দোষের দায়ভার আমরা কেন নিতে যাব? ওই সময়ের বোর্ড অভ ডিরেক্টরের কেউ এখন আর কোম্পানিতে কেন, পৃথিবীতেই নেই। আমার তো জন্মও হয়নি যুদ্ধের সময়। আমাদের তিনজনের কেউ কোনও মানুষ মারিনি, কাউকে গ্যাস চেম্বারেও ঢুকাইনি। তা হলে কেন পূর্বপুরুষদের কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সেটা ধামাচাপা দিতে যাব? ওসবের জন্য কেউ আমাদের দায়ী করতে পারে না।'

'দায়ী তো করছেই,' বলল ইয়োহান। 'নইলে কমিশন আমাদের পিছনে লেগে আছে কেন? চেষ্টা যতই করি, কাউকে বোঝাতে পারব না এসব। যতকিছু হোক, ওইসব পাপের আয় তো আমরাই ভোগ করছি।'

'সব ঝামেলার মূল বুড়ো অটো শ্নাইডার!' রাগে গজগজ করে উঠল মারিয়া। 'প্যান্ডোরার মত একটা প্রজেক্টের রেকর্ড রাখার

দরকারটাই বা কী ছিল?'

'আমার বাবাকে দোষারোপ করার আগে নিজেদের কথাও ভাবুন,' থমথমে গলায় বলল ইয়োহান, পিতার অবমাননা সহ্য করতে পারছে না সে। 'তিনি একা কোম্পানি চালাতেন না। আপনাদের সবার বাবাই তাঁর প্রত্যেকটা কাজের সঙ্গী ছিলেন।'

'থাক, ভুল তো যা হবার হয়েই গেছে,' তাড়াতাড়ি বলল গেরহার্ড। 'কাগজপত্রগুলো আগেই কেন ধ্বংস করা হয়নি, সেটা ভেবে লাভ কী? কথা হলো, ওগুলো আমাদের আর্কাইভে রয়ে গেছে। এখন ব্যাপারটা আমাদের মাথাব্যথা।'

'কী করবে ভাবছ?' প্রেসিডেন্টের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মারিয়া।

'প্যান্ডোরা প্রজেক্টের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে হবে। কাগজপত্র তো পুড়িয়ে ফেলবই, এমনকী প্রজেক্টের অরিজিনাল সাইটটাও ধ্বংস করে দেব। কেউ কোনওদিন ওটার সঙ্গে আমাদের কোম্পানির সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারবে না।'

'সাইট ধ্বংস করবে?' বলল মারিয়া। 'কীভাবে? ওটার সঠিক লোকেশন কেউ জানে না। যারা জানত, তাদের কেউ বেঁচে নেই। আমরা যেসব কাগজ পেয়েছি, তাতেও উল্লেখ নেই জায়গাটার।'

'এ নিয়ে কাজ করছি আমি,' জানাল ইয়োহান। 'যেভাবেই হোক, সাইটটা খুঁজে বের করে সব প্রমাণ ধ্বংস করে দিতে হবে। নইলে ভবিষ্যতে কেউ ওটার খোঁজ পেয়ে গেলে আমরা সবাই জড়িয়ে যাব।'

'সম্ভাবনা কি আছে?' গেরহার্ড সন্দিহান। 'হাজার হোক, গত ষাট বছরের বেশি সময় ধরে জায়গাটা গোপন আছে। এখন আমরা খোঁজাখুঁজি করতে গেলেই বরং ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'রিস্ক-ম্যানেজমেন্ট, হাইঞ্জ,' বলল ইয়োহান। 'ওটা যতক্ষণ টিকে আছে, ততক্ষণ আমাদের কেউ বিপদমুক্ত নই। বরং

রিকনসিলিয়েশন কমিশন যদি টের পেয়ে যায়, এত বড় একটা ব্যাপার আমরা ধামাচাপা দিয়েছি, তা হলে জেলের ভাত খেতে হবে সবার। আর্কাইভের কাগজপত্র আর প্রজেক্টের সাইট—এ দুটোই হচ্ছে প্যান্ডোরার প্রমাণ। দুটোকেই নিশ্চিহ্ন করতে হবে।'

'সবার অজান্তে কাজটা সারতে পারবে ভাবছ?'

'চাকা ইতোমধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে,' শান্ত গলায় বলল ইয়োহান। 'কাজটার জন্য বেশ কয়েক মিলিয়ন মার্ক খরচও করে ফেলেছি আমি। আর হ্যাঁ, কেউ যাতে টের না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে।'

'জটিল কাজ,' মন্তব্য করল মারিয়া। 'খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াবে না তো? তা হলে কিন্তু নতুন কেলেঙ্কারি দেখা দেবে।'

'আমার কাজের তরিকা এতদিনে আপনাদের বুঝে ফেলার কথা,' বলল ইয়োহান। 'রক্তপাত পছন্দ করি না আমি, কাজ সারি কৌশলে। এক্ষেত্রেও তা-ই করব।'

'প্ল্যানটা নিখুঁত তো?'

'দুয়েকটা ছোটখাট সমস্যা আছে, সেসব যে-কোনও পরিকল্পনাতেই থাকে। তবে সবমিলিয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা চমৎকার। তারপরও আপনারা যদি রাজি না থাকেন, প্যান্ডোরা সাইট ধ্বংসের প্ল্যানটা বাতিল করতে পারি।'

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দৃষ্টিবিনিময় করল গেরহার্ড ও মারিয়া। তারপর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল বোর্ড চেয়ারম্যান।

'ডু ইট! কোম্পানি আর আমাদের পিঠ বাঁচানোর এই একটাই রাস্তা। প্যান্ডোরা প্রজেক্টের সাইট আর কাগজপত্র—আর যেন কখনও খুঁজে পাওয়া না যায়।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, ঠিক তা-ই ঘটতে যাচ্ছে,' দৃঢ় গলায় বলল ইয়োহান শ্নাইডার।

চার

ভ্যাটিক্যান সিটি। রোম, ইটালি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, নতুন একজন পোপ নির্বাচিত হবার সঙ্কেত হিসেবে অ্যাপোস্টলিক প্যালেসের চিমনিতে যে সাদা ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল, তা ভাল করে মিলিয়ে যাবার আগেই নতুন শপথ নেয়া পোপ চতুর্দশ লিও, সেইন্ট পিটারের আসনে বসা ২৬৬তম ব্যক্তি, রোমান ক্যাথলিক চার্চ আর হোলি সী-কে বদলে ফেলতে শুরু করেছেন। ভ্যাটিক্যানের অভ্যন্তরে যারা কাজ করে তারা এটা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও মনে মনে একেবারে দ্বিমত পোষণ করবে না। বিশেষ করে এই প্রাক্তন কার্ডিনাল আলেসান্দ্রো কাসানো যখন তাঁর সুপ্ত মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন বেশিরভাগ মানুষেরই চোখ কপালে উঠে গেল।

কাসানোকে শুরুতে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি, তাঁকে ধরে নেয়া হয়েছিল পোপ নির্বাচনে কিউরিয়া পরিষদের দুটো দলের মধ্যকার সাময়িক একটা মধ্যস্থতা হিসেবে। নির্বাচনটা ছিল খুবই উত্তাল, দিনের পর দিন শুধু ব্যালটই জমা পড়েছে, কোনও সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না। পঞ্চম দিনে যখন বোঝা গেল, পদপ্রার্থী দুজনের কেউই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাচ্ছেন না, তখন পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া স্রেফ একটা ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াল, যাতে দ্বাদশ দিনে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে একজনকে জয়ী ঘোষণা করা যায়।

এই অচলাবস্থার প্রধান কারণ কিউরিয়ার বিভক্তি। একদিকে যেমন বদলে যাওয়া পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চার্চের আধুনিকীকরণের পক্ষে একদল কার্ডিনাল আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, অন্যদিকে আরেকদল ছিলেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে মরিয়া। দুই দল যে যার প্রার্থীকে জেতানোর জোর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, আর মাঝখান থেকে অন্যেরা এটা ভেবে পাচ্ছিল না—প্রার্থীদের মধ্যে কে এই দু'পক্ষের দাবিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে নতুন শতাব্দীতে শক্ত হাতে চার্চের হাল ধরতে পারবেন।

অষ্টম দিনে এসে দূরদর্শী কয়েকজন কার্ডিনাল উপলব্ধি করলেন, শেষ পর্যন্ত আইনের মারপ্যাঁচে যে-ই নির্বাচিত হোন না কেন, কিউরিয়ার এই বিভক্তি ও মতভেদ শেষ পর্যন্ত শুধু চার্চে নয়, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে খ্রিস্টান সমাজকে বাঁচাতে কূটনৈতিক একটা সমাধান তাঁরা বের করলেন। দুই পক্ষের সম্মতিতে নিরপেক্ষ তৃতীয় প্রার্থী হিসেবে কার্ডিনাল আলেসান্দ্রো কাসানোকে দাঁড় করানো হলো। তাঁর বয়স চুয়াত্তর, স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল নয়, বেশিদিন পোপের পদে থাকতে পারবেন না। কাজেই অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে অস্থায়ী সমাধানই বলা যায়, যাতে তাঁর শাসনামলের মধ্যে কিউরিয়া তাদের বিভক্তি ভুলে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী পোপ নির্বাচনের আগে একটা ঐকমত্যে আসতে পারে।

চতুর্দশ লিও হবার এক সপ্তাহের মধ্যে কাসানোকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। কার্ডিনালরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, তাঁদের অস্থায়ী সমাধানের মেয়াদ বুঝি বড্ড সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে... ঠিক ১৯৭৮ সালের পোপ প্রথম জন পলের মত, যিনি মাত্র চৌত্রিশ দিন টিকেছিলেন। তবে অচিরেই সুসংবাদ এল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা জানালেন, পোপের রোগটা জটিল কিছু নয়—পাকস্থলীর একটা ডিজঅর্ডারে ভুগছেন তিনি,

যেটার কথা আগে কাউকে বলেননি। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণও ওটাই। জরুরি একটা সার্জারি করা হলো, আর তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায়-অলৌকিকভাবেই সম্পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পেলেন নতুন পোপ। ভ্যাটিক্যানে ফিরলেন একেবারে নতুন এক মানুষ হয়ে, হাসপাতালে যাওয়া ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধের সঙ্গে যাঁর কোনও মিল নেই।

এবার সত্যিকার মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন চতুর্দশ লিও। যারা তাঁর নিয়োগকে মধ্যপন্থী একটা ব্যবস্থা ভেবে সিরিয়াসলি নিচ্ছিল না, তাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে কঠিন কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলেন। সারাজীবন চার্চকে যে রূপে দেখার স্বপ্ন দেখেছেন, তা বাস্তবে পরিণত করতে শুরু করলেন। হাজারো প্রতিবাদের মুখে প্রথমেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু উদারপন্থী কার্ডিনাল সাইমন পাগনানিকে ভ্যাটিক্যানের সেক্রেটারি অভ স্টেট হিসেবে নিয়োগ দিলেন—গুরুত্বের দিক থেকে পদটা ঠিক পোপের পরেই। এই একটা সিদ্ধান্তই জানান দিয়ে দিল, তিনি কোনও নমনীয় মানুষ নন, পরিবর্তনেও বিশ্বাসী। এবার তিনি হাতে নিলেন সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জটা। লিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, আজ পৃথিবীতে ধর্মে ধর্মে যত বিভেদ আর হানাহানি, তার মূল কারণ গোঁড়ামি আর ধর্মান্ধতা। নির্দিষ্ট কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই, এই একটা ক্ষেত্রে কোনও ধর্মই কারও চেয়ে কম যায় না। যেভাবে হোক, এই বিভেদ আর শত্রুতা দূর করতে হবে। আর সেজন্য সাধারণ ধর্মাবলম্বীদের আগে শোধরাতে হবে ধর্মীয় নেতাদের।

একটা বিশেষ সাইনোড বা ধর্মীয় মহাসম্মেলনের ডাক দিলেন তিনি, যাতে শুধু ক্যাথলিক বিশপেরা নয়, বরং পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। খোলামেলা আলোচনা হবে সবার মধ্যে, যাতে নিজেদের বিভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একটা ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও ঘটেনি, এমন একটা বোঝাপড়া হবে সব ধর্মের মধ্যে। সাধারণ একটা সাইনোডে ক্যাথলিকদের পাশাপাশি ইস্টার্ন অর্থোডক্সের

প্যাট্রিয়ার্ক এবং বিশপেরা থাকেন, কিন্তু এবারের সম্মেলনে ইজরায়েল আর যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি নেতারা, দালাই লামাসহ বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ নেতা, মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী ও শিয়া সম্প্রদায়ের নামকরা ও প্রভাবশালী কিছু ইমাম ও মোল্লা, জাপানি শিন্টো সন্ন্যাসী, ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ—এমন কয়েকশো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন। একটা মাত্র সম্মেলনে এই বিশাল লক্ষ্য অর্জন এক কথায় অসম্ভব, তবে পোপ আত্মবিশ্বাসী—যে মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর মনে রয়েছে, সেটার পথে এই অনুষ্ঠান প্রথম পদক্ষেপ হয়ে থাকবে।

এই ব্যাপক আয়োজনের পুরোটাই বর্তেছে পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক কার্ডিনাল পাগনানির ওপর। সাধারণত যে কোনও সাইনোডের প্রস্তুতিপর্বে এক বছর সময় নেয়া হয়, কিন্তু তাঁকে মাত্র ছ'মাস বেঁধে দিয়েছেন লিও। দিনরাত নিজের সমস্ত স্টাফদের নিয়ে খাটছেন তিনি, কাজ আর শেষ হচ্ছে না।

অ্যাপোস্টলিক প্যালেসের দোতলায় নিজের অফিসে বসে কাজ করছিলেন পাগনানি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। পাল্লা ফাঁক করে অল্পবয়েসী একজন প্রিস্ট উঁকি দিয়ে বলল, 'মাফ করবেন, কার্ডিনাল। হিজ হোলিনেসের লাঞ্চ খাওয়া শেষ। তিনি আপনার দর্শনপ্রার্থী।'

রিডিং গ্লাসটা খুলে সাধারণ একটা চশমা পরলেন পাগনানি, দুরকম চশমা ব্যবহার করেন তিনি, বাইফোকালে প্রচণ্ড মাথাব্যথা করে। ডেস্ক ছেড়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঝাড়া সাড়ে ছ'ফুট তাঁর উচ্চতা, হোলি সী'র পুলিশ ফোর্স *কর্পো ডি ভিজিল্যাঞ্জা* আর সুইস গার্ডের দুয়েকজন সদস্যকে বাদ দিলে পুরো ভ্যাটিক্যানের সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তি তিনি। ছোটবেলায় বাস্কেটবল খেলতেন, এখনও দেহ যে কোনও অ্যাথলিটের মত। মুখে বয়সের তেমন একটা ছাপ পড়েনি, চোখদুটো উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত—তাতে লুকিয়ে আছে বুদ্ধির ঝিলিক। দু'বান্ডিল কাগজ নিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে

এলেন তিনি।

দ্রুতপায়ে প্যালেসের করিডর ধরে এগোলেন কার্ডিনাল, পাপাল অ্যাপার্টমেন্টের মার্বেল পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন। লাইব্রেরিতে পাওয়া গেল পোপকে, সঙ্গে রয়েছেন বিশপ আলবার্তো জিয়ান্নি—সাইনোডের কো-অর্ডিনেটর তিনি, সমস্ত ডেলিগেটদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন আলোচনার নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে।

কুশল বিনিময় হলো। চতুর্দশ লিও তাঁর সেক্রেটারি অভ স্টেটকে বললেন, 'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'শুধু দেখানো না, সত্যিই ক্লান্ত আমি,' মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসলেন পাগনানি। 'সামর্থ্যের রীতিমত পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আমাকে।'

'আর মাত্র একটা সপ্তাহ, সাইমন,' সান্ত্বনা দিলেন পোপ। 'সাইনোড শুরু হয়ে গেলে সব দায়িত্ব আলবার্তোর। তখন তুমি শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারবে। আর হ্যাঁ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা আমি সংক্ষিপ্ত করে ফেলছি, যাতে মূল আলোচনাটা তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়।'

উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব বর্ণনা করে বিশপ জিয়ান্নি হালকা প্রতিবাদের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু হাত তুলে লিও তাঁকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'চিন্তাভাবনা করেই যে কোনও সিদ্ধান্ত নিই আমি। ভুললে চলবে না, সাধারণ সাইনোডের চেয়ে অর্ধেক সময় চলবে এবারেরটা—মাত্র দু'সপ্তাহ। উদ্বোধনের মত নিছক আনুষ্ঠানিকতায় সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।' অকাট্য যুক্তি শুনে চুপ করে গেলেন জিয়ান্নি। কার্ডিনালের দিকে তাকালেন এবার পোপ। 'কাজের অগ্রগতি কেমন? শেষ মুহূর্তে কোনও নতুন সমস্যায় পড়ছ না তো?'

'হাজারটা,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন পাগনানি। 'যদ্দূর পারছি চেষ্টা করে যাচ্ছি সমাধানের। কী আর বলব, হোলিনেস'

একেকজন অতিথি যা ঝামেলা করছে না! কেউ চায় সম্মেলনে ভাল বসার জায়গা, কেউ আপত্তি জানাচ্ছে খাবারের মেন্যু নিয়ে, কেউ আবার তাদের কেবিন নিয়ে অসন্তুষ্ট। বড় লজ্জার কথা, মানুষকে যারা ইহজগতের লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থাকতে বলে, তাদেরই কেউ কেউ এসব তুচ্ছ জাগতিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে।'

'অধৈর্য হয়ো না,' বললেন পোপ। 'নানা ধর্মের, নানা বর্ণের আর নানা জাতির অতিথি আসছে। তাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে আমাদের।'

'তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি সাইনোডে বউকে সঙ্গে আনার জন্যে জেদ ধরে, তা হলে সেটা কি সহ্য করা যায়?'

'কার কথা বলছ?'

'গ্যাব্রিয়েল হিলার, অ্যামেরিকান ধর্মপ্রচারক। রোজ আমাকে ফোন করে প্যানর প্যানর করে—কেন তার বউকে সঙ্গে আনতে পারবে না! শেষে বিরক্ত হয়ে বলে দিয়েছি আনতে। কিছু মনে করবেন না, ইয়োর হোলিনেস। তবে এসব ভূঁইফোঁড় লোককে আমন্ত্রণ না জানালেও চলত। এর কথাই ধরুন। ছিল পুরনো গাড়ির সেলসম্যান, অল্প কিছু টাকা জমতেই ছোট একটা টিভি স্টেশন কিনে পাদ্রী সেজে বসেছে... মানুষকে দীক্ষা দেয়! এসব হলো ভণ্ডামি, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ছাড়া আর কিছু না। গাড়ি বেচার চেয়ে আয় ভাল, তাই সাধু সেজেছে। তার জন্য এটা সম্মেলন না, সাগরে প্রমোদ বিহার, সেজন্যই বউকে আনার জন্য পীড়াপীড়ি।'

'এভাবে বলা উচিত হচ্ছে না তোমার,' বললেন পোপ। 'হাজার হোক, প্রচুর অ্যামেরিকান তাকে আধ্যাত্মিক গুরু মানে। তাকে আমন্ত্রণ না জানালে ওদের অপমান করা হতো। যাক গে, ভাল কথা মনে করেছ। জাহাজের প্রস্তুতি কদ্দূর?'

'পরশু থেকে শুরু হবার কথা ছিল সম্মেলন, কিন্তু বেশ কিছু

ধর্মীয় নেতা ভ্যাটিক্যানে আসার ব্যাপারে বেঁকে বসেন। দ্বিতীয় পছন্দ ছিল জেরুসালেম, সেখানেও একই অবস্থা। শেষে দেখা গেল, যেখানেই প্রস্তাব করা হোক—কারও না কারও সেই দেশ বা জায়গায় যেতে আপত্তি আছে। অবশেষে সবদিক চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে, সাইনোডটা অনুষ্ঠিত হবে সাগরে, যেখানে কোনও ভৌগলিক সীমারেখা নেই। *সী-এম্প্রেস* নামে একটা বিশাল লাক্সারি লাইনার লিজ নেয়া হয়েছে, যাতে অনায়াসে সম্মেলনে অংশ নেয়া দু'হাজার মানুষের জায়গা হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত কেউ ব্যবস্থাটায় আপত্তি জানায়নি। তবে সমস্যা অন্যখানে—সারা পৃথিবীর এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যেখানে সমবেত হতে যাচ্ছেন, সেখানে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকাটা খুব স্বাভাবিক। এই গুরুদায়িত্বটা দেয়া হয়েছে পোপের ব্যক্তিগত সিকিউরিটি ফোর্স—সুইস গার্ডকে। তারা শিপের সমস্ত ক্রু'র ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ও ক্লিয়ারেন্স করাচ্ছে। এ ছাড়া ডেলিগেটদের সঙ্গে যেসব সিকিউরিটি পার্সোনেল আসবে, তাদেরকেও সুইস গার্ডের অধীনে কাজ করতে হবে। অতিথিদের নিরাপদে জাহাজে ওঠা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দেখবে এরা। *সী-এম্প্রেস* সমুদ্রে পৌঁছুলে সেটার এক্সটারনাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করবে ইটালিয়ান নেভির একটা ডেস্ট্রয়ার, সমুদ্রযাত্রার পুরো সময়টাই এসকর্ট হিসেবে থাকবে ওটা।

'জাহাজ সম্পূর্ণ রেডি, ইয়োর হোলিনেস,' জানালেন পাগনানি। 'ইন্টারপোলের মাধ্যমে ক্রু'দের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয়ে গেছে। এখন ক্লিয়ারেন্স ছাড়া কাউকে ওটার ধারে-কাছেও ভিড়তে দেয়া হচ্ছে না। খাবার-দাবার থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রভিশন লোডিংও প্রায় শেষের পথে।'

'আর যেসব আইটেম আমরা অতিথিদের ফিরিয়ে দিচ্ছি?'

'সব এখন সী-এম্প্রেসে। আপনার এই উদ্যোগটা কিন্তু দারুণ সাড়া ফেলেছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, শুধু এই একটা কাজই

আমাদের এই সম্মেলনকে সফল করে তুলতে পারে।'

কথা হচ্ছে ভ্যাটিক্যানের আর্কাইভে থাকা নানা ধরনের স্মৃতিচিহ্ন আর ধর্মীয় নিদর্শনের ব্যাপারে। যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টীয় যোদ্ধা আর ধর্মীয় নেতারা এসব জিনিস বিভিন্ন জাতি আর ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে কেড়ে এনে ভ্যাটিক্যানে জমা করেছেন। এখান থেকেই অভ্যাগত অতিথিদের হাতে তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ কিছু আইটেম ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিও, শুভেচ্ছা আর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে। ব্যাপারটা ঘোষণা দেয়ার পর বেশ সাড়া পড়ে গেছে গোটা পৃথিবীতে।

'এত হইচই পড়ে যাবে ভাবিনি,' বললেন পোপ। 'ক'টা জিনিসই বা আর ফিরিয়ে দিচ্ছি? ইনকুইজিশন, ক্রুসেড আর শুদ্ধি অভিযানের নামে অতীতে আমাদের যোদ্ধারা কী সব অন্যায় করেছেন! আর যা-ই হোক, লুটতরাজকে কখনও সমর্থন করা যায় না। যা যা জমা পড়েছে, সবই চার্চের জন্য বিশাল এক পাপের বোঝা ছাড়া আর কিছু না। পারলে সবই আমি ফিরিয়ে দিতাম।'

'যা দিচ্ছেন, তা-ও একেবারে কম নয়,' বললেন পাগনানি।

'কী কী ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে, বলতে পারেন?' প্রশ্ন করলেন বিশপ জিয়ান্নি। 'উদ্বোধনী ভাষণের জন্য সংখ্যাটা লাগবে।'

সঙ্গে আনা কাগজের বান্ডিল খুললেন পাগনানি। ভিতর থেকে একটা লিস্ট বের করে বললেন, 'সাত হাজার আটশো বই—বেশিরভাগ হচ্ছে জিউয়িশ টেক্সট আর আইনের; ইসলামী গ্রন্থও আছে, যেগুলো ক্রুসেডের সময় লুঠ করা হয়েছিল। আর আছে কিছু ইস্টার্ন অর্থোডক্স ম্যাটেরিয়াল, ৪৫১ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল অভ চ্যালসেডনের পর থেকে যেগুলো আমাদের দখলে আছে।'

'মাত্র এই-ই?' সংখ্যাটায় মনে হলো পোপ খুশি হননি।

'আমরা মাত্র ছ'মাস সময় পেয়েছি, হোলিনেস,' বললেন পাগনানি। 'এটা অভিযোগ নয়, বাস্তবতা। 'ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরিতে

বিশ লাখের ওপর বই আছে, দেড় লাখ আছে পাণ্ডুলিপি। বাকি পঁচাত্তর কিলোমিটার ডকুমেন্টের কথা বাদই দিলাম। এই বিশাল সংগ্রহ ঘেঁটে নির্দিষ্ট কিছু বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা তো কেবল শুরু করেছি।'

'দুঃখিত,' হাসলেন লিও। 'আমি ব্যাপারটা ওভাবে ভাবিনি। যাক গে, আর কী কী ফেরত দিচ্ছি আমরা?'

'ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চকে পাঁচশো আইকন দেব আমরা, সেগুলো কোথায় কোথায় যাবে ওরাই ঠিক করবে। এ ছাড়া আছে চল্লিশটা মূর্তি, দু'শোর মত পেইন্টিঙ, বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় নিদর্শন—যেমন মোমবাতিদান, অর্নামেন্টাল ক্রুশ, পানপাত্র, ইত্যাদি। তালিকাটা একেবারে ছোট নয়। মোট এগারোটা কন্টেইনার আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি জাহাজে।'

'হুঁ, মন্দ নয়,' স্বীকার করলেন লিও। 'চমৎকার কাজ দেখিয়েছ তুমি, সাইমন। আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তার পিছনে তোমার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

'প্রচারণা চাই না আমি, হোলিনেস। যদি ধর্মের নামে মানুষ হত্যা বন্ধ হয়, তা হলে আমি নাম-পরিচয়হীন একটা কবরে শেষ শয্যা নিতেও দ্বিধা করব না।'

'এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সবার মধ্যেই আছে,' বললেন জিয়ান্নি। 'আমরা শুধু এই সাইনোডের সাফল্য চাই, আর কিছু নয়।'

'তা হলে এসো প্রার্থনা করি,' বললেন পোপ, 'ঈশ্বর যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সহায়তা করেন।'

'আমেন!'

পাঁচ

নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

গর্বের কোনও বিষয় নয়, তারপরেও মাসুদ রানা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে—পৃথিবীতে যত নিকৃষ্ট জায়গা আছে, তার সবই ওর দেখা। কিন্তু গ্রীষ্মকালে নিউ ইয়র্কের সিটি সার্ভিসের গার্বেজ ট্রাকের ছড়ানো উৎকট দুর্গন্ধ আর কোথাও পেয়েছে কি না, তা মনে করতে পারল না। সোনার বাংলাতেও, বিশেষ করে কোরবানির ঈদের দুদিন পর, অসচেতন নাগরিকদের রাস্তাঘাটে ফেলে দেয়া পশুর নাড়িভুঁড়ি ও বর্জ্য পচে গন্ধ ছড়ায়; তবে আর সব ক্ষেত্রের মত পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশটা দুর্গন্ধের বেলায়ও যে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেবে—কে ভাবতে পেরেছিল? আর্মস্টারডাম অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছে রানা। পাশ দিয়ে সকালের রুটিন অনুসারে ময়লা সংগ্রহ করছে ট্রাকগুলো। জানতে ইচ্ছে হলো, অ্যামেরিকানরা এমন কী ব্যবহার করে, যেটা থেকে এত ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুতে পারে। তবে কৌতূহলটা নিবৃত্ত করার কোনও আগ্রহ নেই ওর, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কেটে পড়তে পারলে বাঁচে। আবহাওয়াটা চমৎকার দেখে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল, কিন্তু এমন বিটকেলে দুর্গন্ধ যে প্রাতঃভ্রমণটাকে এভাবে মাটি করে ছাড়বে তা কে জানত!

দ্রুত হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে এল ও, কলম্বাস পেরিয়ে বাঁদিকে সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সম্ভ্রান্ত

এলাকা এটা, বাতাসে আশপাশের বাড়িঘরের সামনের বাগান থেকে ভেসে আসা ফুলের মিষ্টি সুবাস ভাসছে। সূর্যের উত্তাপ বেড়ে গেছে, জ্যাকেটটা খুলে কনুইয়ের ভাঁজে রাখল। দুপাশের গ্র্যানেট আর লাইমস্টোনে তৈরি দুনিয়ার সবচেয়ে দামি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলো দেখতে দেখতে এগোল।

সেভেন্টি নাইনন্থ্ আর এইটি ফার্স্ট স্ট্রিটের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে এই শহরে রানার সবচেয়ে প্রিয় আকর্ষণগুলোর একটা—অ্যামেরিকান মিউজিয়াম অভ ন্যাচারাল হিস্ট্রি। সময় পেলেই পরে একবার এসে দেখে যেতে হবে, ভাবল ও। নতুন একটা উইং খোলা হয়েছে বলে শুনেছে—রোজ সেন্টার, যেখানে পৃথিবী আর মহাবিশ্বের নানা রকম নিদর্শন রাখা হয়েছে। সেন্ট্রাল পার্কের ওয়েস্ট এন্ট্র্যান্সটা পার হবার সময় একটু থামল ও, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুণী প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের মূর্তিটা দেখার জন্য।

কানাডায় একটা রুটিন মিশন শেষ করে মাত্র দু'দিন আগে নিউ ইয়র্কে এসেছে রানা, ঢাকায় ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে অনুমোদনের অপেক্ষা করছে, একই সঙ্গে সেরে নিচ্ছে রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার বাৎসরিক পরিদর্শনটা। হঠাৎ করেই গতকাল দুপুরে বিনা নোটিসে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন করেছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, রানার বস। এটা-সেটা জিজ্ঞেস করে অবতারণা করেছেন প্রসঙ্গের।

'ছুটির দরখাস্ত পেলাম। কোথায় ছুটি কাটাবে কিছু ঠিক করেছ?'

'এখনও কিছু ভাবিনি, স্যর। ছুটি পেলে ভাবব।'

'হুম। সার্ভেয়ার্স সোসাইটি অভ অ্যামেরিকার নাম শুনেছ?'

এই রে! অসময়ে বসের ফোন পেয়েই রানার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লেগেছে। গলার ঢিলেঢালা ভাব দেখে বোঝাও যাচ্ছে না

বুড়োর উদ্দেশ্য কী! হঠাৎ করে ভিন্ন প্রসঙ্গের প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল। কোনও মতে বলল, 'জী, স্যর... রোমাঞ্চপ্রিয় অভিযাত্রীদের বিখ্যাত একটা সংগঠন। জগৎজোড়া নাম আছে।' রানা জানে, বহুদিনের পুরনো অ্যাসোসিয়েশন ওটা। নামী-দামি-কীর্তিমান অনেক লোক ওটার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও আছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও তাঁদের মধ্যে একজন। গোটা পৃথিবীতে শৌখিন অ্যাডভেঞ্চারারদের এত নামকরা, ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আর একটাও নেই। নিউ ইয়র্কে ওটার হেড-অফিস। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, স্যর?'

'তুমি তো এখন নিউ ইয়র্কেই। ওই ক্লাবের এক সদস্য আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু—হুবার্ট র‍্যামসে, আমেরিকান আর্মির রিটায়ার্ড কর্নেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্জ আর আমার সঙ্গে প্যাসিফিকে কাজ করেছিল অনেকদিন।' জর্জ মানে নুমার চিফ, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'ইদানীং খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে বেচারা, সেদিন আমাকে ফোন করেছিল—ওর ছেলে স্যামকে নাকি গ্রিনল্যান্ডে পাঠাচ্ছে পুরনো একটা আর্মি বেস রি-ওপেন করতে। পঞ্চাশের দশকে কাজ করত হুবার্ট ওখানে। আমাকে জিজ্ঞেস করল ওর ছেলের সঙ্গে একজন আর্কটিক এক্সপার্ট দিতে পারব কি না। স্যাম নাকি মেরু অঞ্চলে একেবারেই আনাড়ি। সরাসরি যদিও বলেনি, তবে আমি বুঝতে পারলাম তোমাকেই চাইছে।'

'আমাকে!' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'হঠাৎ আমাকে চাওয়ার কারণটা কী, স্যর? মিস্টার র‍্যামসের তো আমাকে চেনার কথা নয়।'

'আমার কাছেও একটু অস্বাভাবিক লেগেছে ব্যাপারটা,' রাহাত খান স্বীকার করলেন। 'কারণ, শুধু তুমিই নও, জর্জের সঙ্গে কথা বলে নুমা থেকে তোমার বন্ধু ববি মুরল্যান্ডেরও সাহায্য চেয়েছে ওই একই অভিযানের জন্যে।'

'আর্কটিক এক্সপার্ট হিসেবে? এক্সপার্ট যদি প্রয়োজনও হয়, শুধু দুজন কেন? তা ছাড়া সার্ভেয়ার্স সোসাইটির মত একটা ক্লাবে নিজস্ব কোন বিশেষজ্ঞ নেই, এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, স্যর।'

'আমারও হয়নি, জর্জেরও না। তবে নেহায়েত বন্ধু মানুষ, তার ওপর অসুস্থ বলে মুখের ওপর মানা করতে পারিনি। রাজি হয়েছি: তোমাকে অনুরোধ করে দেখব। কথায় যা মনে হলো, গরজটা হুবার্টের নয়, সোসাইটিই চাইছে তোমাদের: হুবার্টকে ধরেছে জর্জ আর আমার মাধ্যমে তোমাদের রাজি করাতে।'

'এতে মনে হচ্ছে জটিল কোনও প্যাঁচ আছে, স্যর।'

'থাকলে অবাক হব না,' বললেন রাহাত খান। 'আমি অবশ্য কথা দিইনি। তোমার ছুটি আমি মঞ্জুর করে দিয়েছি, যদি খুব বেশি অসুবিধে না হয় তা হলে সোসাইটির সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার। ওদের প্রস্তাব পছন্দ না হলে স্রেফ মানা করে দেবে। মনে হচ্ছে সার্ভেয়ার্স সোসাইটি বড় কোনও সমস্যায় পড়েছে, সরাসরি সাহায্য চাইতে পারছে না বলে হুবার্টের মাধ্যমে যোগাযোগ করছে।' একটু থামলেন বৃদ্ধ, কেশে গলা পরিষ্কার করলেন, তারপর আমতা-আমতা করে বললেন, 'ওদের একটা-দুটো কাজ করে দিতে পারলে কিন্তু মন্দ হয় না। আমেরিকার অনেক উচ্চপদস্থ আর প্রভাবশালী কর্মকর্তা, কংগ্রেস ও সিনেটের সদস্য ওই ক্লাবের মেম্বার। ওদের উপকার করে দিতে পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নানান ইস্যুতে সাহায্য চাওয়া সহজ হবে।'

'ঠিক আছে, স্যর। আমি যোগাযোগ করে দেখছি।'

বিকেলেই ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির ববি মুরল্যান্ডের সঙ্গে কথা বলেছে ও। দুজনে মিলে ঠিক করেছে, যাবে ওরা ব্যাপার কী জানার জন্য। আজ সকালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ওদের।

এইটি ফার্স্ট স্ট্রিটের পনেরো তলা উঁচু আর্ট-ডেকো অ্যাপার্টমেন্টগুলোকে পিছে ফেলে এল রানা, একটা ব্লক পার হতেই দেখা মিলল উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাউনস্টোনে তৈরি স্থাপত্যশিল্পের। পুরনো আমলের একটার পর একটা বাড়ি যেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে এই এলাকায়। সার্ভেয়ার্স সোসাইটি খুঁজে পেতে তেমন অসুবিধে হলো না, ঠিকানা দেখেই বাড়িটা বের করে ফেলল ও। অবশ্য দূর থেকেও চেনা যেত, চওড়া খিলানঅলা তিনতলা উঁচু ভবনটা অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা, সদর দরজার পাশেই বড় করে কাঠ খোদাই করা সোসাইটির মনোগ্রাম লাগানো আছে—গোলাকৃতি একটা কম্পাস ফেসের মধ্যে আড়াআড়িভাবে বসানো একটা সেক্সট্যান্ট।

দরজা খুলে ভিতরে পা দিতেই রিসেপশনের সোফায় বসা মুরল্যান্ডকে দেখতে পেল রানা, আগেই এসে পড়েছে। ছোটখাট মানুষ সে, তবে সৃষ্টিকর্তা উচ্চতার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছেন শরীরভর্তি দৃঢ় পেশি আর অমানুষিক শক্তি দিয়ে। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্বপুরুষেরা রোমান ছিলেন। নুমায় একসঙ্গে কাজ করার সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এখন পৃথিবীতে রানা তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আর বন্ধুর জন্য পারে না এমন কোনও কাজ তার অভিধানে নেই। রানাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, প্রায় ছুটে এসে জাপটে ধরল। 'হাই, দোস্ত!'

বহুদিন পর দেখা দুজনের, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু হাঁসফাঁস করে উঠল রানা। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি মুরল্যান্ডের, লম্বা ও চওড়ায় মাঝারি আকৃতির ভালুকের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাবে তার। উত্তেজনায় এত জোরে রানাকে চাপ দিচ্ছে যে মনে হলো, হাড্ডিগুড্ডি ভেঙে যাবে এখুনি।

'আরে... ছাড়ো, ছাড়ো! মেরেই ফেলবে নাকি!'

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ করে পারিপার্শ্বিকতার কথা মনে পড়ল মুরল্যান্ডের। রানাকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল দু'পা, মুখে লজ্জার হাসি।

মুচকি হাসল রানা। 'কেমন আছো, ববি?'

'ভাল,' বলল মুরল্যান্ড। 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। চুপচাপ একেকবার অ্যামেরিকায় এসে ঘুরে যাও, অথচ আমার সঙ্গে দেখাও করো না।'

'রাগ কোরো না,' রানা বলল। 'আসলে এত অল্প সময়ের জন্য আসি, আর ব্যস্ত থাকি যে তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় হয় না।' ঘড়ি দেখল ও। 'আমরা কি আগেই এসে পড়েছি?'

'হুঁ, পনেরো মিনিট।' জানাল মুরল্যান্ড।

'তা হলে তো ভালই। রাস্তার মোড়ে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান দেখেছি। চলো ওখানে গিয়ে কফি খেয়ে আসি।'

'এত নামকরা জায়গায় এসেছি, এককাপ কফি খাওয়াবে না?'

'হাব-ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে, না চাইলে দেবে না।'

'অ্যাঁ? চাইতে হবে? উপকার করতে এসেও?'

'চলো, চলো,' হাসল রানা। 'কফিটা বাইরেই খাব।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে ওরা, কিন্তু তখুনি ভিতর থেকে কালো টাক্সিডো পরা এক স্টুয়ার্ড উদয় হলো।

'মিস্টার মাসুদ রানা? মিস্টার ববি মুরল্যান্ড?'

'জী,' রানা বলল। 'দুঃখিত, আমরা বোধহয় একটু আগেই এসে পড়েছি।'

'কোনও সমস্যা নেই, স্যর,' বলল স্টুয়ার্ড। 'মিস্টার ডেমেঙ্কো আপনাদের অপেক্ষায় আছেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

লোকটাকে অনুসরণ করে ফয়েইয়ে পৌঁছুল দুই বন্ধু, সঙ্গে সঙ্গে যেন সময়ভ্রমণ করে উনবিংশ শতাব্দীতে পা রাখল। রিসেপশন লবিটা আধুনিক সাজে সজ্জিত ছিল, কিন্তু এখান থেকে

সবকিছু সেই পুরনো আমলের, সম্ভবত যখন সার্ভেয়ার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তখনকার। সামনেই ওপরে যাবার সিঁড়ি—ইয়া চওড়া, ওক কাঠের তৈরি; এত প্রাচীন যে কালের আবর্তনে ধাপগুলো কালো হয়ে গেছে। দোতলায় উঠে আরও বিস্মিত হলো ওরা, কোনও বাড়িতে এত কাঠের কাজ দেখেনি কখনও। হলঘরের মত একটা ওয়েইটিং রুমে বসানো হলো ওদের।

'মিস্টার ডেমেঙ্কোকে আপনাদের সংবাদ দিচ্ছি আমি,' বলল স্টুয়ার্ড। 'দয়া করে একটু বসুন।' বেরিয়ে গেল সে।

হলঘরের ছাদ থেকে শুরু করে দেয়াল পর্যন্ত সবই মেহগনি কাঠের প্যানেলিং করা, তাও যে সে প্যানেল নয়—রীতিমত জটিল নকশাকাটা... অদ্ভুত সুন্দর! মেঝের কথা বলা গেল না, সেটা ঘন, নিপুণ বুনোটে গাঁথা ওরিয়েন্টাল কার্পেটে ঢাকা। চারপাশের দেয়ালের শোভা বর্ধন করছে নানান রকম জিনিস।

প্রথমেই চোখে পড়ে হান্টিং ট্রফি—নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঝুলছে বিভিন্ন পশুর মাথা। হরিণ আছে, বাঘ আছে... গণ্ডারের মাথাটা এমনভাবে বসানো, হঠাৎ দেখায় মনে হয় ওপাশ থেকে কাঠের প্যানেল ভেদ করে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওটা। ট্রফিগুলোর আকার দেখে আন্দাজ করল রানা, সবই নিশ্চয়ই রোল্যান্ডস্ গাইডে ঠাঁই পেয়েছে। এসব ছাড়াও হরেক আকারের ফ্রেমে ঝুলছে ছবি। বেশিরভাগই সোসাইটির বিভিন্ন এক্সপিডিশনের। *বর্ন ফ্রি* বইয়ের বিখ্যাত লেখক জয় অ্যাডামসনের আঁকা দুটো তৈলচিত্রও দেখা গেল। আর বসে থাকা গেল না। উঠে পড়ল কামরার বাকি জিনিসগুলো দেখতে।

দেয়াল ছাড়াও চারপাশে দেখার মত অনেক জিনিস আছে। একপাশে জানালার নীচে পড়ে আছে বড় সাইজের একটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরখণ্ড—ওটা আসলে উল্কাপিণ্ড। আরেক দিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে একটা সোনার তৈরি ঈজিপশিয়ান মামি-কেস; নকল নয়, সত্যিকারের। কাঁচের তৈরি ডিসপ্লে-কেস

আছে অনেকগুলো, তাতে শোভা পাচ্ছে নানা রকম কালচারাল আর ন্যাচারাল আর্টিফ্যাক্ট। একটায় রয়েছে তিমির দাঁত খোদাই করে আদিবাসী অ্যামেরিকানদের তৈরি করা ভাস্কর্য, আরেকটাতে রয়েছে জাপানি নেটসুক মূর্তি। প্রজাপতির কালেকশন দেখা গেল একটা শো'কেসে, রত্নভর্তি ক্রিস্টালেরও ডিসপ্লে আছে। দেখতে দেখতে অনুভব করল রানা আর মুরল্যান্ড—মিউজিয়ামের চেয়ে কোনও অংশে কম নয় এই ঘরটা। এ তো কেবল একটা কামরা, অন্যান্যগুলোতে আরও কী কী আছে, কে জানে। গুজব শোনা যায়, সোসাইটির ভল্টে অমূল্য সব আর্টিফ্যাক্ট আছে; আছে এমন সব জিনিসও, বিতর্কের ভয়ে কখনও যেগুলো জনসমক্ষে বের করা হয় না। কিম্বারলাইট ম্যাট্রিক্সে থাকা একটা নিখুঁত হলদে হীরা দেখছিল ওরা, এমন সময় পিছনে পায়ের শব্দ হলো।

'ওটা একটা ঐতিহাসিক উপহার,' পিছন থেকে বলে উঠল একটি কণ্ঠ। ঘুরে দাঁড়িয়ে সার্ভেয়ার্স সোসাইটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর নিকোলাই ডেমেস্কোকে দেখতে পেল রানা আর মুরল্যান্ড। 'বার্নি বার্নার্টো দিয়েছিলেন সোসাইটিকে। নিউ ক্লেইম রাশে পাওয়া তাঁর ভাগের অংশ থেকে তোলা হয়েছে এটা। ওটা না পাওয়ায় সিসিল রোডস্ হীরা ব্যবসায় একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করতে পারেননি। ভাগ্যিস পাননি, নইলে আজ ডি বিয়ার্স ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনও হীরার কোম্পানি থাকত না।'

ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশি নয়, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মত হবে; রাশান ইমিগ্রান্ট—শুনেছে ওরা। লম্বায় রানার কাছাকাছি, চেহারাটা সম্ভ্রান্ত, পাতলা ভুরুর নীচে কালো দুই চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, চিকন ফ্রেমের একটা চশমা পরেছেন। মাথায় সোনালি চুল ভদ্রলোকের, কপালটা বেশ বড়, সম্ভবত টাক পড়তে শুরু করেছে।

'গুড মর্নিং, জেন্টলমেন,' হাত বাড়িয়ে দিলেন ডেমেস্কো। 'আমি নিকোলাই ডেমেস্কো।'

'চিনি আপনাকে,' বলে হ্যান্ডশেক করল রানা। 'মাসুদ রানা, ও হলো ববি মুরল্যান্ড।' করমর্দন করল ববিও।

'আপনাদেরকেও আমি খুব ভাল করেই চিনি,' হাসলেন ডেমেঙ্কো। 'বিশেষ করে পৃথিবীবিখ্যাত কিছু আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধারে আপনাদের কৃতিত্ব ভুলবার নয়। আসুন, আমরা অফিসে গিয়ে বসি। ওখানেই আলাপ করা যাবে।'

হলঘর থেকে বড় একটা ডাইনিং রুমে ঢুকলেন ভদ্রলোক, পিছন পিছন চলল ওরাও। বিশাল আকৃতির আটটা টেবিল সাজানো ডাইনিং হলে। এক কোণে একটা ফায়ারপ্লেস, আর তার সামনে ইজিচেয়ারে বসা কয়েকজন বৃদ্ধকে দেখা গেল—পেপার পড়ছেন, নয়তো গল্প করছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সরু একটা প্যাসেজ পড়ল, দেয়ালে নানা রকম অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু কিছু চিনতে পারল রানা—পুরনো আমলের গাদা বন্দুক, মধ্যযুগের তলোয়ার, আফ্রিকান উপজাতীয়দের তীক্ষ্ণফলা বর্শা, অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের ব্লো-গান, আরও অনেক কিছু। প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে বন্ধ একটা দরজা খুললেন ডেমেঙ্কো, পাল্লায় তাঁর নাম ও পদবী লেখা ফলক রয়েছে। ভিতরে সুসজ্জিত অফিস, চারপাশের দেয়ালজুড়ে শেলফ, তাতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা রকম বই আর আর্টিফ্যাক্ট।

ডেস্কের দুপাশে মুখোমুখি চেয়ারে বসল সবাই। ড্রয়ার খুলে দুই অতিথির হাতে একটা করে ম্যাগাজিন ধরিয়ে দিলেন ডেমেঙ্কো—*দ্য সার্ভেয়ার,* ক্লাবের নিজস্ব প্রকাশনা। 'এগুলো আপনাদের জন্য... আমাদের নতুন সংখ্যা।'

এ-জাতীয় পত্রিকাগুলোর মধ্যে *সার্ভেয়ার* ইতোমধ্যেই সেরা আসন জিতে নিয়েছে। ফটোগ্রাফাররা সবাই আন্তর্জাতিক মানের, আর্টিকেল আর প্রতিবেদন যাঁরা লেখেন, তাঁদের অনেকেই পুলিৎজার বিজয়ী। সার্কুলেশনের দিক থেকে *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের* ধারেকাছে না থাকলেও তার ছোট্ট পাঠককুলের

কাছে *সার্ভেয়ার* জিয়োগ্রাফিকের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পড়াই নয়, তারা পত্রিকাটা সংরক্ষণ করে। তা ছাড়া *ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকের* চেয়ে পনেরো বছর আগে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সার্ভেয়ার্স সোসাইটি, প্রথম দিককার সংখ্যাগুলো নিলামে লাখ লাখ ডলারে বিক্রি হয়।

'প্রকাশনা ভাল বুঝি না আমি,' বলল রানা, পুরু আর্ট পেপারে ছাপা দুশো পৃষ্ঠার মোটাসোটা পত্রিকাটা উল্টাচ্ছে। 'তবে এর চেহারা-সুরত দেখে আমার ধারণা, কাটতি তত বেশি নয়।'

'ঠিকই ধরেছেন,' অপ্রতিভ দেখাল ডেমেঙ্কোকে। ট্রেতে করে ধূমায়িত কফির পট ও তিনজোড়া কাপ-তস্তুরি এনে রেখেছে স্টুয়ার্ড। সবার জন্য কফি ঢালছেন তিনি। 'প্রতি সংখ্যায় কী পরিমাণ লস দিই, ভাবলে পিলে চমকে যায় আমাদেরই। সাবস্ক্রিপশন, সার্কুলেশন আর বিজ্ঞাপনেও ছাপার খরচ উঠে আসে না।'

রানাকে উসখুস করতে দেখে বুঝলেন এবার কাজের কথায় আসা দরকার। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'আপনাদের মত এক্সপ্লোরার...'

কফির কাপ নামিয়ে রেখে বাধা দিল রানা, 'আমরা কেউই কিন্তু এক্সপ্লোরার নই। আমি আর ববি দুজনেই সামান্য সরকারি চাকরি করি।'

'বিনয় করছেন,' বললেন ডেমেঙ্কো। 'আপনারা এ পর্যন্ত যা যা আবিষ্কার করেছেন, যত জায়গায় গেছেন, তা অনেক ফুল-টাইম এক্সপ্লোরারের পক্ষেও সম্ভব হয় না।'

'তারিফটা একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড। 'তারচেয়ে...'

'হ্যাঁ, কাজের কথায় আসছি এখনই,' লজ্জিত হাসি হাসলেন ডেমেঙ্কো, 'ইয়ে... আসলে আমরা একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। আর্কটিকে একটা এক্সপিডিশনে খুব দরকার, অথচ আমাদের যে-

সব মেম্বার ওই এলাকার ওপর এক্সপার্ট, তাঁদের কেউই সময় দিতে পারছেন না। বাধ্য হয়েই আমাদেরকে আপনাদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। তবে বেগার খাটাব না আপনাদের, বিনিময়ে সোসাইটির স্থায়ী সদস্যপদ আর সেইসঙ্গে ভাল একটা সম্মানীও পাবেন।'

'আপনাদের সদস্যপদ কিংবা পারিশ্রমিকের আশায় আসিনি আমরা। আমাদের মান্যবর দুজন ব্যক্তির অনুরোধে জানতে এসেছি, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে কেন আমাদের দুজনের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বিস্তারিত কিছুই জানা নেই আমাদের। সব খুলে বলুন, বুঝে দেখি সত্যিই আমরা আপনাদের কোনও কাজে আসতে পারব কি না। যদি মনের সাড়া পাই, হয়তো যাব আর্কটিকে, সদস্যপদ বা সম্মানী ছাড়াই।'

মনে হলো রানার বক্তৃতায় খুশি হলেন ডেমেঙ্কো। বললেন, 'তেমন ঝামেলার কিছু নয়। আমার জানা মতে আগেও ওখানে গেছেন আপনারা বেশ কয়েকবার।'

লোকটা কিছুতেই কাজের কথায় আসছে না। ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কম ঝামেলার অভিযান! তাও আবার গ্রিনল্যান্ডে? আপনার বোধহয় আর্কটিক সার্কেল সম্পর্কে ভাল জানা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম জায়গা ওটা। ওখানে ঝামেলাহীন, ছোটখাট এক্সপিডিশন করা সম্ভব নয়! রীতিমত মহাযজ্ঞ সাজিয়ে তারপর যেতে হয়।'

'সব জানি আমি,' আশ্বস্ত করলেন ডেমেঙ্কো। 'মহাযজ্ঞ না কী যেন বললেন, সেসব ব্যবস্থা করা আছে। ট্রান্সপোর্টেশন, অ্যাকোমোডেশন, লজিস্টিকস্—এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আপনাদের। শুধু অংশগ্রহণ করবেন, ব্যস।'

'ওসব কে করছে?'

'জিয়ো-রিসার্চ নামে জার্মান একটা ইন্সটিটিউট। মূল এক্সপিডিশনটা তাদেরই, ড্যানিশ সরকার আমাদেরকে ওদের

সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে। একদিক থেকে ভালই হয়েছে, বাড়তি কোনও টেনশন থাকছে না আপনাদের। শান্তিতে আসল কাজ করতে পারবেন।'

'এর সঙ্গে ড্যানিশ সরকারের সম্পর্ক কোথায়?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'গ্রিনল্যান্ড এখনও ডেনমার্কের অংশ, ওখানে যেতে হলে সরকারি অনুমতি দরকার হয়। আমরা আলাদা দলই পাঠাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা শর্ত জুড়ে দিল—গেলে জিয়ো-রিসার্চের সঙ্গে যেতে হবে।'

'কেন?'

'কিছুদিন হলো ডেনমার্ক সরকার বেশ সতর্ক হয়ে গেছে গ্রিনল্যান্ডের আইস শিটে রিসার্চ টিম পাঠানোর ব্যাপারে। গত বছর জাপানি একটা এক্সপিডিশনে দুর্ঘটনায় পাঁচজন মানুষ মারা গেছে, বরফের ওপর এগারো হাজার গ্যালন ফুয়েলও ছড়িয়ে পড়েছিল। মৃতদেহগুলো উদ্ধার করা গেলেও ফুয়েলের বিষয়ে কিছু করা যায়নি। ওগুলো পরিবেশ দূষিত করছে। এর তিন মাস পরে অ্যামেরিকান চার পর্বতারোহী মারা পড়েছে বরফ চাপা পড়ে। ওদের খোঁজে একটা রেসকিউ হেলিকপ্টার গিয়েছিল, সেটাও ক্র্যাশ করেছে। তখন থেকে কড়াকড়ি আরোপ করেছে ড্যানিশরা, বেশ কিছু বিদেশী মিটিয়োরোলজিক্যাল স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে—পরিবেশের জন্য ঝুঁকির অজুহাতে। শৌখিন পর্বতারোহীদের জন্য দক্ষিণের ছোট কিছু পাহাড় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এমনকী থিউলি এয়ারফোর্স বেসও বন্ধ করে দেয়া হবে বলে গুজব শোনা যাচ্ছে। এখন আর যাকে-তাকে গ্রিনল্যান্ডে অভিযানে যেতে দিচ্ছে না ওরা, বিশেষ করে ছোট-খাট কোনও টিম তো নয়ই। যেতে হলে বড় আর ফুললি ইকুইপড্ কারও সঙ্গে যেতে হবে। সেজন্যই জিয়ো-রিসার্চের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছি আমরা।'

'ওরা যাচ্ছে কেন?'

'যদ্দূর শুনেছি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ করতে। বেশ বড় একটা টিম নিয়ে লম্বা সময়ের জন্য যাচ্ছে ওরা। আপনাদের ভাল সাপোর্ট দিতে পারবে।'

'উড়ে গিয়ে জুড়ে বসতে বলছেন, ওরা কী ব্যাপারটা ভাল চোখে নেবে?'

'না নিয়ে উপায় কী? ড্যানিশরা ওদেরও শর্ত দিয়ে দিয়েছে, যেতে চাইলে ছোট টিমগুলোকে সঙ্গে নিতে হবে।'

'আমি হলে ব্যাপারটা পছন্দ করতাম না।'

'ভাববেন না,' হাসলেন ডেমেস্কো। 'ওদের অসন্তোষ ভাগাভাগি করার আরও লোক পাবেন। সোসাইটি একা নয়, ছোট আরও একটা টিম যাচ্ছে জিয়ো-রিসার্চের সঙ্গে। অবশ্য এত ভাবছেন কেন, তা-ই বুঝতে পারছি না। ওঁরা সবাই নিরীহ বিজ্ঞানী, আপনাদের দুয়েকটা কটু কথা শোনানো ছাড়া কী আর করতে পারবেন?'

'কী করতে হবে, সেটাই তো বলেননি এখনও! ' মুরল্যান্ড বলল। 'অসুবিধে হবে কি হবে না, বুঝব কী করে?'

'বলছি,' ডেমেস্কো ব্যাখ্যা করলেন। 'পঞ্চাশের দশকে গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে *ক্যাম্প ডিকেড* নামে একটা অ্যামেরিকান বেস ছিল। *প্রজেক্ট আইসওয়ার্ম* বলে একটা রিসার্চ করছিল ওরা—সম্ভবত আইস শীটের নীচে বসবাসযোগ্য শহর বানানো যায় কী না, এ সংক্রান্ত কিছু। তিপ্পান্ন সালে বেসটা যখন বন্ধ করে দেয়া হয়, আমাদের একজন বোর্ড মেম্বার সেখানে কাজ করতেন, রিটায়ার্ড কর্নেল হুবার্ট র‍্যামসে—আপনাদের দুজনের বসের বন্ধু—এতদিন পর হঠাৎ তাঁর শখ হয়েছে, বেসটা এখন কী অবস্থায় আছে, দেখবেন। ভদ্রলোক গত দু'বছর ধরে হুইলচেয়ারে আছেন। নিজে যেতে পারছেন না, তাই ছোট একটা এক্সপিডিশন স্পন্সর করছেন, উনি চান, ক্যাম্প ডিকেড রি-ওপেন করে

ভিতরের ভিডিও করে আনা হোক।'

মুরল্যান্ডের গলায় বিস্ময়। 'হুইম? শুধু ক'টা ভিডিওটেপে ছবি দেখবেন বলে তিনি পুরো একটা এক্সপিডিশনের খরচ দিচ্ছেন?'

'ওঁর মত সদস্যদের জন্য টাকা কোনও ব্যাপারই না।'

'হুঁ,' রানাকে চিন্তিত দেখাল। 'কাজটা যতটা সহজ বলছেন, ততটা নয়। আমি একটা অভিযানের কথা জানি, যাতে সাউদার্ন গ্রিনল্যান্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্র্যাশ করা একটা পি-৩৮ লাইটনিং উদ্ধার করা হয়েছিল। প্লেনটা অক্ষত পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু ওটা ছিল আড়াইশো ফুট বরফের তলায়, আর অরিজিন্যাল ক্র্যাশ-সাইট থেকে দু'মাইল দূরে চলে গিয়েছিল। আপনার এই ক্যাম্প ডিকেডের ওপরও লাখ লাখ টন বরফ জমা হয়ে থাকতে পারে, গ্লেসিয়াল ফ্লো'র কারণে লোকেশনও বদল হয়ে যেতে পারে। খুঁজে বের করা সহজ হবে না।'

'তেমন কোনও ভয় নেই,' অভয় দিলেন ডেমেঙ্কো। 'আমি গ্লেশিয়োলজিস্ট নই, তারপরও যতটুকু পারছি জানাচ্ছি। বেসটা ছিল সাব-সারফেসে। পাথর আর বরফের সংমিশ্রণে গড়া একটা পাহাড়ের শরীর কেটে বানানো হয়েছে ওটা। পাহাড়টা স্থির, যেটা ন্যাচারাল গ্লেসিয়াল ফ্লো'কে কেটে দু'ভাগ করছে... অনেকটা নদীর মাঝখানে চর থাকলে যেমন হয় আর কী! বেসটা রয়েছে সারফেস থেকে ত্রিশ ফুট নীচে। প্রতি বছর বরফ পড়ে বটে, কিন্তু পাহাড়টার দু'পাশ দিয়ে যেহেতু ফ্লো আছে, জমে থাকতে পারে না। যে অভিযানটার কথা বললেন, সেটার কথা আমিও জানি। ইন ফ্যাক্ট একটা নয়, মোট ছ'টা পি-৩৮ ক্র্যাশ করেছিল... গোটা একটা স্কোয়াড্রন। তুষারঝড়ে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল ওরা। পরে ওই একটাই খুঁজে পাওয়া গেছে, আর কোনওটা নয়। এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না; আপনারা যে এলাকায় যাচ্ছেন, সেখানে ওই ক্র্যাশ সাইটের চেয়ে অনেক কম তুষার জমে।'

'বরফ খুঁড়তে কী ধরনের টেকনিক ব্যবহার করব আমরা?'

'থারমাল কেমিক্যাল, যেটা বরফ গলিয়ে ফেলে। পদ্ধতিটার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে?'

রানা সায় দিল। 'হ্যাঁ। মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা ওটাকে হট রকস্ বলে। কেমিক্যাল সেটআপটা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে আগে দুয়েকবার টেকনিকটা ব্যবহার করেছি আমি। পদ্ধতিটা ভালই, তবে সাবধানে কাজ করতে হয়, গন্ধও ছড়ায় ভীষণ। ঘণ্টায় এক ফুটের মত গর্ত করা যায়... যদি ডায়ামিটার খুব বড় না হয়। সমস্যা হয় গলে যাওয়া পানিটা নিয়ে, দ্রুত নিষ্কাশন না করলে কেমিক্যালটার সঙ্গে মিশে ওটাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। সেজন্য শক্তিশালী পাম্প লাগবে আমাদের। অভিজ্ঞ লোকও। আমাদের সঙ্গে কে কে থাকছে?'

'মিস্টার র‍্যামসের ছেলে স্যাম। অভিযানটার নেতৃত্বে সে-ই থাকবে। এ ছাড়া আছে গর্ডন হোয়াইট নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার। মিস্টার হোয়াইট এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ।'

'রানাকে টিম লিডার করছেন না?' মুরল্যান্ড অবাক হলো।

ডেমেক্কো বিব্রত হলেন। 'দুঃখিত, ব্যাপারটা আগেই বলিনি বলে। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার রানা। আপনাকে দায়িত্বটা দিতে পারলে আমিও খুশি হতাম। কিন্তু সোসাইটির একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম আছে: বোনাফাইড পার্মানেন্ট মেম্বার ছাড়া আর কেউ আমাদের স্পন্সর করা কোনও মিশনে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। আপনাদের কোনও আপত্তি থাকলে খোলাখুলি বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে যতই অসুবিধে হোক না কেন, বিকল্প কিছু ভাবতে হবে আমাদের।'

'অত উদ্বিগ্ন হবেন না,' রানা ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করল। 'নেতৃত্ব নিয়ে আমার কোনও মোহ নেই।'

ডেমেক্কোর মুখে স্বস্তি ফুটল। 'বাঁচালেন। তবে ভাববেন না কিছু। স্যাম র‍্যামসেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। অত্যন্ত

ভালমানুষ। তেমন বেকায়দা কিছু দেখলে আনঅফিশিয়ালি নেতৃত্ব আপনার হাতে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করবে না।'

'ইটস্ ওকে,' রানা হাসল। 'কিন্তু আর কোনও টিম মেম্বারের কথা বলছেন না যে? মাত্র চারজনে গোটা একটা শহর খুঁড়ে বের করব নাকি?'

'শহর না, *ক্যাম্প ডিকেড* আসলে ইংরেজি *"এইচ"* আকৃতির একটা বিল্ডিং। আপনারা শুধু প্রবেশপথটা বরফ সরিয়ে বের করতে পারলেই পুরো বেসে অ্যাকসেস পেয়ে যাবেন। পোর্টেবল সাব-সারফেস রেইডার থাকছে আপনাদের সঙ্গে, এন্ট্র্যান্সটা খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। তা ছাড়া আপনারা চারজনই আইস-টানেলিঙে অভিজ্ঞ, সহজেই কাজ সারতে পারবেন বলে আশা করি।'

'তারপরেও, মাত্র চারজন কম হয়ে যায়। বাড়তি লোক লাগলে কী করব?'

'জিয়ো-রিসার্চের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আমাদের—খাবার, থাকার ব্যবস্থা, যাতায়াত... সব ওদের মাথাব্যথা। প্রয়োজনে ওদের টিম থেকে লোকও নিতে পারবেন। আমরা এজন্য টাকা দেব। আসলে পুরো এক্সপিডিশনে মোট লোকের সংখ্যা কমাতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

মুরল্যান্ড জানতে চাইল, 'যাচ্ছে কতজন?'

'চল্লিশজনের মত। জিয়ো-রিসার্চের টিমে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী আর তাঁদের সাপোর্ট স্টাফরা আছে।'

'আরেকটা টিমের কথা বলেছিলেন...'

'ওটাও ছোট। মিটিয়োরোলজি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য যাচ্ছে ওরা। এর বেশি কিছু জানি না।'

'সবই বুঝলাম,' রানা বলল। 'কিন্তু বাড়তি লোক লাগবে কি না তা আগে থেকে তো বোঝা যাবে না। দেখা গেল, আমাদের এক্সকাভেশন সাইটে যাবার পর লোক লাগছে। তখন

জিয়ো-রিসার্চকে পাবো কোথায়?'

'সেই ব্যবস্থাও করা আছে,' ডেমেস্কো জানালেন। 'তিন গ্রুপের মধ্যে শুধু আমাদের এক্সপিডিশনই সাইট-কেন্দ্রিক। ড্যানিশ সরকার তাই বলে দিয়েছে, জিয়ো-রিসার্চের বেস স্টেশন আমাদের এলাকায় করতে হবে। ওরা তো গ্লোবাল-ওয়ার্মিং নিয়ে রিসার্চ করবে, যে কোনও একটা জায়গায় ক্যাম্প করলেই চলে। সবসময় হাতের কাছেই পাবেন ওদের।'

'ড্যানিশরা দেখছি ওদের ওপর ভালই চাপ দিয়েছে। ব্যাপারটা কীভাবে নিয়েছে ওরা?'

'খেপেছে তো বটেই। আরও একশো মাইল উত্তরে ক্যাম্প করতে চেয়েছিল ওরা। আমাদের অসুবিধে হবে বলে পারমিশন পায়নি।'

'হুঁ,' কৌতুক ঝরল মুরল্যান্ডের গলায়। 'ভালই বন্ধুবৎসল পরিবেশে পাঠাচ্ছেন আমাদের।'

'আর কোনও ব্যাপারে ওদের সঙ্গে খিটিমিটি করতে হবে না তো?' রানা নিশ্চিত হয়ে নিতে চায়।

'মনে হয় না,' ডেমেস্কো মাথা নাড়লেন। 'যতই রাগুক, শান্ত হবার জন্য এক মাসের মত সময় পেয়েছে ওরা। তারপরও যদি কোনও সমস্যা থাকে, সেটা আমাদের পোহাতে হবে না। দু'সপ্তাহের ভিতর ফিরে আসবেন আপনারা। এরপর গতবছরের সেই জাপানি টিমটা আপনাদের জায়গা নেবে। জিয়ো-রিসার্চ ঝামেলা করতে চাইলে ওদের সঙ্গে করুক। তো... আর কিছু জানতে চান?'

'ইন্সটিটিউটটা সম্পর্কে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কাজ করছে... কোনও ধরনের পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নয় তো?'

'না, না,' আশ্বাস দিলেন ডেমেস্কো। 'ওরা সিরিয়াস সায়েন্টিস্ট। লোক-দেখানো আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। প্রতিষ্ঠানটার বয়স ছ'বছর। সাধারণত বিভিন্ন সরকার আর

বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে রিসার্চ করে।' সামনের দিকে ঝুঁকলেন ভদ্রলোক। 'সবই তো শুনলেন। এখন বলুন, আপনাদের মতামত কী?'

'আমি রাজি,' বলে উঠল মুরল্যান্ড। বন্ধুকে কনুইয়ের গুঁতো দিল। 'তুমি কিছু বলছ না কেন?'

রাহাত খানের কথায় রানা তো আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, এখন সব শুনেও এর মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ কিছু দেখতে পেল না, তাই সৌজন্যের হাসি হেসে বলল, 'আমিও তেমন কোনও অসুবিধে দেখছি না। হাতে কিছু টুকটাক কাজ আছে, সেগুলো সারলেই আমি ফ্রি। কবে নাগাদ যেতে হবে?'

'এ সপ্তাহেই,' বললেন ডেমেঙ্কো। 'ট্রাভেল প্ল্যানটা পরে জানিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, আশা করি ততদিনে ছুটিটাও মঞ্জুর হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি।'

'ওয়ান্ডারফুল!' হেসে উঠলেন ডেমেঙ্কো। 'মিস্টার র‍্যামসেকে জানিয়ে দিচ্ছি সুসংবাদটা। সোসাইটির ওয়েবসাইটেও আপনাদের নাম পাঠাতে হবে।'

'আমরা কি উঠব তা হলে?'

'না, না, সে কী!' তাড়াতাড়ি বললেন ডেমেঙ্কো। 'আজ লাঞ্চ পার্টি আছে একটা। সেটায় যোগ না দিয়ে এক পা-ও নড়তে দিচ্ছি না আপনাদের।'

হাসিমুখে সম্মতি দিল দুই বন্ধু। তবে রানার মনে একটু খটকা রয়েই গেল; মনে হলো, কী যেন লুকিয়ে গেলেন ডেমেঙ্কো। কী হতে পারে সেটা? দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, সময়ই বলে দেবে তা। আবার, কিছু না-ও হতে পারে।

বেলা একটায় ওদেরকে বিদায় দিয়ে নিজের অফিসে এসে ঢুকলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর। রিসিভার তুলে নির্দিষ্ট একটা

নম্বরে ডায়াল করলেন।

'এন.ডি. রিপোর্টিং,' ফিসফিসালেন ডেমেঙ্কো।

'কেমন হলো কাজটা?' ওপাশ থেকে ভারি কণ্ঠে জানতে চাওয়া হলো।

'নিখুঁত। ওরা যাচ্ছে গ্রিনল্যান্ডে।'

'চমৎকার!' ওপাশে উল্লাস। 'আগেই বলেছিলাম, ওদের রাজি করাতে কষ্ট হবে না।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' ডেমেঙ্কোর গলায় অস্বস্তি। 'ওদের জানা থাকা দরকার, কীসের ভিতর গিয়ে পড়তে যাচ্ছে।'

'ডিয়ার নিকোলাই! এমনকী তুমিও জানো না কীসের ভিতর ওরা পড়তে যাচ্ছে।'

'এটা তো জানি, বিপদ আছে ওখানে। তার ভিতর দুজন নিরীহ মানুষকে ঠেলে দেয়ার আগে তাদের অন্তত কিছুটা আভাস দিয়ে রাখা উচিত ছিল।'

'পুরো অপারেশনটা নিড-টু-নো বেসিসে করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে রানা বা মুরল্যান্ডের কিছু জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তা ছাড়া, ওরা স্রেফ ব্যাকআপ। এমনও হতে পারে, কী ঘটছে তার কিছুই টের পাবে না। যাবে, ক্যাম্প ডিকেড খুলে ছবি তুলে ফিরে আসবে। ব্যস!'

'কিন্তু যদি ঝামেলা বেধে যায়? যদি বিরাট কোনও গোলমাল শুরু হয়?'

'নিকোলাই, তুমি ওদের ব্যাপারে বোধহয় কিচ্ছু জানো না। ওরা দুজন অসাধ্য সাধন করতে পারে। পারে যে কোনও বিপদ সামাল দিতে। আমাদের মিশনটা ভেস্তে যেতে বসলে ওরাই তুরুপের তাস হিসেবে কাজ করবে। সেজন্যই ওদের রিক্রুট করা হয়েছে।'

'তারপরও বলব কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ওরা অন্ধের মত

যাচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডে কী অপেক্ষা করছে—কিচ্ছু জানে না।'

'সময় এলে সবই জানানো হবে ওদের। তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তোমার কাজ শেষ হয়েছে, এটাই বড় কথা। গুড বাই।'

লাইন কেটে গেল। শূন্য অফিসে কিছুক্ষণ নিথর বসে রইলেন নিকোলাই ডেমেঙ্কো। শেষে নামিয়ে রাখলেন রিসিভারটা।

'দুঃখিত, মাসুদ রানা! দুঃখিত, ববি মুরল্যান্ড!' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'আপনাদের জড়িয়ে কাজটা বোধহয় আমি ঠিক করলাম না!'

ছয়

মিউনিখ, জার্মানি।

সারাটা সকাল ধরে ব্যস্ত আছে লিয়া নোভাক, জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। ছুটি শুরু হয়ে গেছে আজ থেকে, আগামীকাল রওনা দেবে গ্রিনল্যান্ড অভিযানে। একটু আগেই যাচ্ছে, মূল অভিযানটা শুরু হবার আগে কয়েকটা দিন আইসল্যান্ডে কাটাবে। রোমাঞ্চপ্রিয় মেয়ে সে, আর দশটা মানুষের মত সহজ জীবনযাপন তার স্বভাবের বাইরে। কাজের চাপে বহুদিন কোথাও যাওয়া হয় না, হাসপাতালের চাকরি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই গ্রিনল্যান্ডে একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ টিমের জন্য ডাক্তার খোঁজা হচ্ছে শুনেই আবেদন করেছিল, আগেও বিভিন্ন অভিযানে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা থাকায় নির্বাচিত হতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

চেষ্টা করেও লাঞ্চের আগে গোছগাছ শেষ করতে পারল না লিয়া। খাওয়াদাওয়া শেষে বিশ্রাম নিল খানিকটা, তারপর অভ্যাসমত বিকেলে বেরুল জগিঙে, অত্যন্ত স্বাস্থ্যসচেতন সে। টানা দেড় ঘণ্টা দৌড়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। আধঘণ্টা সময় নিয়ে শাওয়ার করল, তারপর বসল আয়নার সামনে। দীর্ঘদিন যত্ন না নেয়া চেহারাটাকে গোছাতে শুরু করল। তিনমাস হলো ভ্রূগুলো টুইয করা হয় না, এখন যখন একবারে সব করতে বসল, ব্যথায় চোখে পানি এসে গেল। মাথার চুলেরও খারাপ অবস্থা। ইচ্ছে করেই অনেকটা ছেলেদের মত চুল রাখে সে, ঘাড়ের পিছনে সামান্য দৈর্ঘ্যটা না থাকলে বয়কাটই বলা যেত। এখন জেল মেখে সেগুলোকে ভদ্রস্থ করল।

বেশ সুন্দরী বলা চলে লিয়াকে। মুখটা ডিম্বাকৃতি, তাতে বড় বড় জলপাই আকারের দুটো উজ্জ্বল চোখ। উঁচু নাক, সুডৌল চিবুক আর লোভনীয় ঠোঁট যে কোনও পুরুষেরই মাথা ঘুরিয়ে দিতে যথেষ্ট। ছিপছিপে দেহ দেখে অ্যাথলিট বলে ভ্রম হতে পারত, কিন্তু বিধাতা তার সঙ্গে মানিয়ে এত সুন্দর আকৃতির স্তন আর নিতম্ব দিয়েছেন যে বিশ্বসেরা মডেল ভেবে বসা বিচিত্র নয়। অবশ্য পুরুষকুলকে কামনার আগুনে পোড়াতে একেবারেই আগ্রহ নেই লিয়ার। ইচ্ছে করেই কম সাজ নেয়, তার বুদ্ধিমত্তা বা ব্যক্তিত্বের চেয়ে লোকে সৌন্দর্যকে কদর করুক—এটা পছন্দ করে না। লিয়ার বয়স তেত্রিশ পেরিয়ে গেছে, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। বরং হাসলে তাকে নিতান্ত টিনএজারের মত দেখায়। আর কিছু না করলেও ত্বকের যত্ন নেয় সে, বয়স কম মনে হওয়ার সেটাই বোধহয় গোপন রহস্য।

আজ হঠাৎ কেন রূপচর্চা করছে, সেটা বোধহয় খুলে বলা দরকার। দাদু রাইমুন্ড নোভাকের হয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে। বুদ্ধি করে মানুষটার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নিতে হবে। এজন্য শুধু মগজ নয়, রূপও ব্যবহার করতে

হবে। তাই এই সাজসজ্জা। মুখে মেকাপ নিয়ে উজ্জ্বল রঙের একটা স্কার্ট পরল লিয়া, সঙ্গে মানানসই সিল্ক ব্লাউজ, পায়ে ফ্ল্যাট স্যান্ডেল। নিজের উচ্চতা নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই তার, একান্ত প্রয়োজন না হলে হিল পরে না।

কিচেন হয়ে বেরুনোর সময় একটা ঠাণ্ডা পানির বোতল নিয়ে নিল। তারপর গ্যারাজে গিয়ে নিজের পুরনো ফোক্সভাগেনে উঠল। তিনবারের চেষ্টায় স্টার্ট নিল গাড়িটা, গিয়ার দিয়ে ওটাকে নিয়ে রাস্তায় নামল লিয়া। মিউনিখ থেকে ইসমানিং শহর মাত্র আধঘণ্টার পথ। কাছে হওয়ায় ভালই হয়েছে। নইলে সেবাস্টিয়ান গ্রাবের সঙ্গে দেখা করতে যদি দূরে কোথাও যেতে হতো, ব্যাপারটা গ্রিনল্যান্ড থেকে ফেরা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। ডক্টর নোভাক অবশ্য বার বার করে বলে দিয়েছেন, কাজটা খুব জরুরি, যাবার আগে অবশ্যই যেন দেখাটা করে যায়; কিন্তু তাতে খুব একটা গুরুত্ব দেয়ার মানে হয় না। দাদু তাঁর সব কাজকেই জরুরি ভাবেন।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, বৃদ্ধ নাৎসি-হান্টারের মিশনটাকে লিয়া খুব হালকা চোখে দেখে। দাদুর মত ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয় বটে, কিন্তু তাঁকে যতভাবে পারে সাহায্য করে। ডক্টর নোভাক প্রায়ই বলেন, একজন মানুষের সত্যিকার মৃত্যু হয় তখন, যখন অন্যেরা সবাই তাকে ভুলে যায়। কথাটা ও প্রথম শুনেছিল বাবার মৃত্যুর পর। দাদু বলেছিলেন, যতদিন বাবাকে মনে রাখবে, ততদিন সে বেঁচে থাকবে। কথাটা শুধু সান্ত্বনার বাণী নয়, ডক্টর নোভাক মনেপ্রাণে নিজেও বিশ্বাস করেন। তাঁর যত সাধনা আর সংগ্রাম, সব এই বিশ্বাস থেকে। যতদিন তিনি সেই ষাট লাখ নিরীহ মানুষকে মনে রাখবেন, তাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন, ততদিন তাদের মৃত্যু হবে না। আর নাতনির মাধ্যমে যদি হতভাগ্য মানুষগুলোর স্মৃতি সামান্য হলেও জিইয়ে রাখতে পারেন, তা হলে ওদের অস্তিত্ব

নতুন প্রজন্মের কাছে পুরোপুরি হারিয়ে যাবে না। দাদুর এই আবেগ বোঝে লিয়া, তাই নীরবে তাঁর কাজে সাহায্য করে।

রাস্তায় যতটা আশা করেছিল, তার চেয়েও বেশি ট্রাফিক দেখা যাচ্ছে। ভুলেই গিয়েছিল, বেশ কয়েকটা প্রধান সড়কের মেরামত কাজ চলছে ক'দিন থেকে। অবশিষ্ট রাস্তাগুলোর ওপর তাই চাপ পড়ছে খুব, সারাক্ষণই যানজট লেগে থাকে। বার বার গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওকে, সামনের রাস্তা একটু ফাঁকা হলে আবার এগোচ্ছে, কিন্তু থেমে যেতে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই। অগ্রসর হবার গতি খুবই ধীর, বিরক্ত বোধ করতে শুরু করল ও। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত জ্বালাতন করছে তীব্র গরম—সারাদিনের কাঠফাটা রোদ তাতিয়ে রেখেছে রাস্তার অ্যাসফল্ট, এখন সেটা তাপ বিকিরণ করছে। এদিকে ফোক্সভাগেনের এয়ার কন্ডিশনারটাও নষ্ট, ঠাণ্ডা হবার উপায় নেই। জানালা খোলা রেখেছিল, কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের একজস্ট পাইপ থেকে বেরোতে থাকা কালো ধোঁয়া চোখে জ্বালাপোড়া ধরিয়ে দেয়ায় আবার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটা কিনে আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে, মনে মনে ভাবল ও; দুদিন পর পর একটার পর একটা ঝামেলা... ভবিষ্যতে আর এমন ভুল করা যাবে না। অস্বস্তি বোধ করল লিয়া। সীটবেল্টটা যেন লোহার তৈরি, বুকের ওপর চেপে বসেছে। ঘামে ভিজে চপচপ করছে ব্লাউজের পিঠ। যা থাকে কপালে, ভেবে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল ও—সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে নাসারন্ধ্রে ঢুকে পড়ল পোড়া পেট্রোল আর ডিজেলের কটু গন্ধ।

পানির বোতলে এক ঢোঁক দিয়ে নিজেকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করল লিয়া, তা হলে যদি এই অস্বস্তিকর পরিবেশটা থেকে রেহাই পাওয়া যায়! ব্যাগ ঘেঁটে সেবাস্টিয়ান গ্রাবের ফার্মহাউসে যাওয়ার নির্দেশনাটা বের করে মন দিয়ে পড়তে শুরু করল। কাল রাতে ভিয়েনা থেকে ফোন করে ডক্টর নোভাক ওটা

দিয়েছেন ওকে। এতদিন পর তিনি কীভাবে এই প্রাক্তন আর্মি অফিসারকে খুঁজে বের করলেন, সেটা এক বিস্ময়। তবে পিতামহকে ভাল করেই চেনে লিয়া, তিনি একবার কারও পিছে লাগলে খোঁজ বের করে ছাড়েন।

কাগজে ঠিকানার পাশাপাশি প্রশ্নেরও একটা তালিকা আছে, এগুলোর উত্তর বের করতে হবে ওকে। গতকালই সেগুলো পড়েছে ও, উত্তেজনা বোধ করেছে। এ পর্যন্ত যত কাজ করেছে, তার তুলনায় এটা অনেক বড় মাপের। প্রশ্ন পড়ে বোঝা যাচ্ছে, রাশিয়া থেকে ১৯৪৩ সালে পাচার হওয়া সোনার একটা বিশাল শিপমেন্টের সন্ধান জানে এই সেবাস্টিয়ান গ্রাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হারিয়ে যাওয়া বহুল আলোচিত *'লস্ট শিপমেন্টে'র* সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ডক্টর নোভাক আর প্রফেসর ড্রেশেল নিশ্চিত, তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছেন।

অবশ্য যে ইন্টারভিউটার জন্য যাচ্ছে, সেটা কতখানি ফলদায়ক হবে, এ ব্যাপারে লিয়া সন্দিহান। দাদু জানতে পেরেছেন, হিটলার ক্ষমতায় আসার আগ থেকেই এই গ্রাব জার্মান সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিল। নাৎসি এলিটের অংশ ছিল না সে, এমনকী পার্টির সদস্যও ছিল না। তাই সোনাগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে—এই গোপন তথ্যটা তার জানা থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কথাটা দাদুকে জানিয়েছে ও, কিন্তু ডক্টর নোভাক এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নন। তিনি বলেছেন, গ্রাব আসল খবর জানুক আর না-ই জানুক, তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য তাঁকে সোনাগুলোর দিকে অন্তত একটা ধাপ এগোতে সাহায্য করবে। বৃদ্ধ মানুষটার একনিষ্ঠা আর উদ্যম দেখে অবাক হতে হয়, তাঁর সিকিভাগ গুণও যদি কেউ অর্জন করতে পারে, তা হলে জীবনে কোনও কাজে হার মানতে হবে না।

টানা দেড় ঘণ্টা যানজটের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুক্তি পেল লিয়া।

ইসমানিঙে যখন পৌঁছুল, তখন সূর্য ডুবতে বসেছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে পাথরের তৈরি একটা উঁচু টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে... মধ্যযুগের বেঁচে থাকা পুরাকীর্তি, কালের প্রবাহে যেটা কী উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল, তা লোকে ভুলে গেছে। টাওয়ারটাকে ডানে রেখে গাড়ি ছোটাল ও, মুহূর্তের মধ্যে শহরের যান্ত্রিকতা দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হলো। সরু রাস্তাটাকে দুপাশ থেকে আলিঙ্গন করে রেখেছে ফসলের খেত আর অবাধ্য বন। মাঝে মাঝে দুয়েকটা পাথুরে ড্রাইভওয়ে চোখে পড়ছে, সেগুলো গিয়ে ঠেকেছে ছিমছাম একেকটা ফার্মহাউসের গায়ে।

শান্তি অনুভব করছে লিয়া। গ্রাম্য পরিবেশ ওর খুব ভাল লাগে। মুক্ত-পরিচ্ছন্ন বাতাস আর সুন্দর প্রকৃতি, যেখানে মানুষের ভিড় নেই—কার না পছন্দ হবে? ঠিকানাটা আরেকবার দেখে নিল ও। সরু এই রাস্তাটা ধরে আট কিলোমিটার এগোতে হবে ওকে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে আরও তিন কিলোমিটার গেলেই পাওয়া যাবে বাড়িটা। দাদু জানতে পেরেছেন, আশপাশের জমির মালিক সেবাস্টিয়ান গ্রাব নিজেই, তবে সেগুলোর দেখাশোনায় বিশেষ আগ্রহ নেই লোকটার। সমস্ত জমিজমা স্থানীয় চাষীদের কাছে লিজ দিয়ে শান্তিতে শেষজীবন কাটাচ্ছে।

দিগন্তে জমে থাকা কুয়াশার মত ধোঁয়ার আড়ালে সূর্য ডুবে গেল। চারপাশের ভুট্টা আর গমের খেতে ছড়িয়ে পড়ল লালচে আভা, বাতাসের সঙ্গে ঢেউ ওঠায় মনে হলো সেখানে আগুন নাচছে। মোড়টায় পৌঁছে গেছে লিয়া, মুখে একটা চিউয়িং গাম পুরে হুইল ঘোরাল। পথের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, রাস্তাটা খুব একটা ব্যবহার হয় না, এখানে-সেখানে গজিয়ে উঠেছে ঘাসের আস্তর। তাজা একজোড়া টায়ার ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে, বুড়ো গ্রাব আবার বাইরে কোথাও চলে যায়নি তো? সম্ভাবনাটা বেশ ক্ষীণ, নব্বুই বছর বয়েসে সন্ধ্যাবেলা আমোদফুর্তি করতে যায় না কেউ।

খানিক পরে মস্ত একসারি ওক গাছ পেরোতেই চোখে পড়ল বাড়িটা। একতলা, পাথরে তৈরি একটা ভবন, জরাজীর্ণ অবস্থা। টালি বসানো ছাদ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় শূন্যতা। পোর্চের বেশ কয়েকটা সাপোর্ট কলাম মাটিতে দেবে গেছে, সেখানটায় চাল ঝুঁকে পড়েছে নিচু হয়ে। মালিকের মত বাড়িটাও শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। সামনের ড্রাইভওয়েতে দুটো গাড়ি দেখা গেল। একটা মান্ধাতা আমলের ওপেল, ঝরঝরে অবস্থা। অন্যটা চকচকে একটা মার্সিডিজ।

সতর্ক বোধ করার প্রয়োজন বোধ করল লিয়া। জার্মানির সবচেয়ে কমন ব্র্যান্ড হলেও এই মুহূর্তে মার্সিডিজটা এখানে একেবারেই মানাচ্ছে না। কে এল হঠাৎ? বিশেষ করে ঠিক যখন ও ইন্টারভিউর জন্য এখানে এসেছে?

বাড়ি থেকে একটু দূরে ফোক্সভাগেনটা থামাল লিয়া। ব্যাগটা মাথা গলিয়ে কাঁধে ঝোলাল, তারপর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পাশেই একটা সেচের পানি যাবার নালা দেখা যাচ্ছে, ভিতরটা খটখটে শুকনো। নালায় নেমে সন্তর্পণে এগোল ও, বাড়ির কাছে গিয়ে মাটিতে উঠল। তারপরও ছায়ায় রইল, কিছু একটা গোলমালের আভাস দিচ্ছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মার্সিডিজটা এসেছে বেশিক্ষণ হয়নি বোধহয়। বন্ধ থাকলেও ইঞ্জিনটা ঠাণ্ডা হবার মৃদু শব্দ হচ্ছে। কে এল হঠাৎ করে? যদ্দূর জানে, সেবাস্টিয়ান গ্রাব নিভৃত জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। মানুষজনের সঙ্গে খুব একটা মেশেন না।

সদর দরজায় পৌঁছে গেল ও। কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছে না এখনও, অস্বাভাবিক কিছুও চোখে পড়েনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, ভাবল মিছেই ভয় করছিল। কিন্তু যখনই নক করতে যাবে, ঠিক তখুনি একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে পাথরের মত জমে গেল ও।

ভিতর নয়, বাড়ির পিছন থেকে এসেছে চিৎকারটা। সেদিকে

ছুটে যাবার অদম্য ইচ্ছাটাকে গলা টিপে মারল লিয়া। ঠাণ্ডা মাথায় ইতিকর্তব্য নির্ধারণের চেষ্টা করল। পিছিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না, তবে কাজ করতে হবে সাবধানে। পা টিপে টিপে বাড়ির কিনারায় এসে দাঁড়াল ও, উঁকি দিল। চার ফুট উঁচু একটা পাথরের দেয়াল চোখে পড়ল, পিছনের আঙিনাটা ঘিরে রেখেছে। যন্ত্রণাকাতর আরেকটা গোঙানি বুঝিয়ে দিল, দেয়ালের ওপাশেই কোথাও আছে আহত মানুষটা। নিশ্চয়ই গেট আছে কাছেই, ওটার খোঁজে দেয়ালে শরীর লাগিয়ে নিচু হয়ে এগোতে থাকল ও। একটা পাশ ঘুরে আসতেই ভাঙাচোরা একটা কাঠের গেট চোখে পড়ল। এই পর্যন্ত পৌঁছুতেই গলার স্বর শোনা গেল।

'প্রশ্নটা খুব সহজ, মিস্টার গ্রাব,' বলল ভারি একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'আমরা জানি, যুদ্ধের সময় আপনি একজন কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এ-ও জানি, প্যান্ডোরা প্রজেক্টের সঙ্গে আপনি জড়িত ছিলেন। কথা হচ্ছে, ব্যাপারটা সম্পর্কে আর কে কে জানে?'

আবারও যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চিৎকার করলেন গ্রাব। কী ঘটছে বুঝতে পেরে শিউরে উঠল লিয়া... তাঁকে টরচার করা হচ্ছে!

'কেউ না,' একজন বৃদ্ধের ভাঙা গলা শোনা গেল, কাতরাচ্ছেন। 'ক্...কাউকে বলিনি আমি। প্যান্ডোরায় আমরা কী করেছি, ত্...তা আমার সঙ্গেই চিরতরে কবরে চলে যাবে।'

'তা-ই বুঝি?' সকৌতুকে বলল আরেকটা কণ্ঠ। 'আমাদের সেটাই বিশ্বাস করতে বলেন?'

কমপক্ষে দুজন আছে ওপাশে, আন্দাজ করল লিয়া। বেশিও হতে পারে। একা কিচ্ছু করতে পারবে না। পুলিশে খবর দিতে হবে। মোবাইল ফোনটা ব্যাকপ্যাকের ভিতরে। এখানে বের করে কথা বলতে গেলে ধরা পড়ে যাবে। উল্টো ঘুরে এগোতে শুরু করল ও, যত দ্রুত সম্ভব দূরে গিয়ে কলটা করতে চায়।

হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখল লিয়া, ব্যথায় নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল। দেয়ালের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা হাত। সজোরে চেপে ধরেছে ওর চুলের মুঠি, টেনে ঝুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। সারা মাথা দপদপ করছে, খুলির চামড়া যেন ছিঁড়ে যাবে, মোচড়ামুচড়ি করতে থাকল ও। ব্যথাটা তাতে আরও কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় ক্ষান্ত দিতে হলো।

'বাহ্, বাহ্,' উৎফুল্ল ভঙ্গিতে বলে উঠল হাতের মালিক, কমবয়েসী একটা কণ্ঠ। 'দ্যাখো কী পেয়েছি! একেবারে জ্যান্ত ভিনাস!'

চুলে টান খেয়ে পায়ের আঙুলের ডগার ওপর দাঁড়িয়ে গেছে লিয়া, নড়তে পারছে না একদম। তারপরও টেনেই চলেছে বদমাশটা, চেঁচাতে থাকল ও। কাঠের গেটটা খুলে অটোমেটিক পিস্তল হাতে একজন বেরিয়ে এল। লোকটা বেশ লম্বা, মাথাভর্তি সোনালি চুল, গায়ের চামড়া গাঢ় রঙের। বন্দিনীর গায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, রাইন। আমি ধরেছি ওকে। এবার ছাড়তে পারো।'

মাথার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল লোকটা। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েই যাচ্ছিল লিয়া, কিন্তু শক্ত করে একহাতে ওকে ধরে রাখল লোকটা, অন্যহাতের পিস্তলটা দিয়ে কিডনির ওপর চাপ দিচ্ছে। 'হাঁটো!'

পিছনের আঙিনায় নিয়ে আসা হলো ওকে। কোনও এককালে হয়তো বাগান ছিল এটা, এখন অযত্নে-অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে। পুরো জায়গাটা জুড়ে বাসা বেঁধেছে ঘন আগাছা, ফ্ল্যাগস্টোনগুলো ঢেকে গেছে শ্যাওলায়। কংক্রিটের তৈরি একটা বেঞ্চের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে সেবাস্টিয়ান গ্রাবকে, তাঁর ওপর দুপাশ থেকে ঝুঁকে আছে দুজন। অল্পবয়েসী লোকটাই রাইন, ওর চুল আঁকড়ে ধরেছিল, অন্যজন সামান্য বয়স্ক। বাড়িতে ঢোকার দরজার কাছে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে চতুর্থ লোকটা, চেহারা দেখা যাচ্ছে না;

সে-ই বোধহয় এদের নেতা, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব ফুটে রয়েছে।

বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল লিয়া, বেচারার শরীর রক্তাক্ত। কী ঘটছে বুঝতে পেরে পেট উল্টে বমি এল ওর। লোকটার হাত ও পা থেকে অনেকটা মাংস ছুরি দিয়ে কেটে তুলে ফেলা হয়েছে। সাদা হাড় দেখা যাচ্ছে সেখান দিয়ে, চারপাশ রক্তে প্লাবিত। ব্যথা সহ্য করার জন্য ঠোঁট কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলেছেন বৃদ্ধ, অনবরত ফোঁপাচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে থাকা দুই দুর্বৃত্তের একজনের হাতে বড় একটা হান্টিং নাইফ দেখা গেল, সেটার ফলায় লাল রং। অন্যজন লবণভর্তি একটা বয়াম ধরে আছে।

'কে তুমি?' পিছন থেকে গমগম করে উঠল পিস্তল ধরা লোকটার গলা, বন্দিনীকে প্রশ্ন করছে।

জবাব দিল না লিয়া। বলা উচিত, দিতে পারল না। আতঙ্কে স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়েছে ও। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল দলনেতা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাবের ক্ষতে আবার লবণ ঢালল রাইন। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ। মাথা ঘুরতে শুরু করল লিয়ার, হাসপাতালে রোগীদের শারীরিক কষ্ট দেখে ও অভ্যস্ত, কিন্তু এই মুহূর্তে চোখের সামনে যা চলছে, তার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা চলে না।

'জবাব দাও, কে তুমি?' আবার প্রশ্ন করল সোনালিচুলো। 'নাকি বুড়োর পায়ে পুরো বয়ামটা খালি করব?'

এবারও জবাব দিতে পারল না লিয়া, শুধু অস্ফুট আওয়াজ করে মাথা নাড়ল।

'কথা বলছ না কেন?' ধমকে উঠল লোকটা। 'বোবায় ধরেছে নাকি?'

'বাদ দাও,' অন্ধকার থেকে বলে উঠল দলনেতা। 'মেয়েটা কে, তাতে কিছু যায় আসে না। মেরে ফেলো ওকে।'

পিছনে কুৎসিত হাসি শোনা গেল। লিয়াকে নিজের দিকে ফেরাল লোকটা, তারপর ধাক্কা দিয়ে কয়েক হাত দূরে ঠেলে দিয়ে ওর মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল।

'গুড়ুম!'

বজ্রপাতের মত গুলির আওয়াজ হলো। পিস্তলের মুখে মাজল ফ্ল্যাশ দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে গেল লিয়া। পরমুহূর্তে সেনালিচুলোর মাথার একটা পাশের হাড্ডি-মাংস ছিটকে উঠতে দেখল, রক্ত আর মগজের ছিন্নভিন্ন অংশ গায়ে এসে পড়ল ওর।

ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গেছে বাকি তিন দুর্বৃত্ত। এই সুযোগে ঝাঁপিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল লিয়া। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সচল হলো গ্রাবকে ঘিরে থাকা দুজন। ছুরি আর লবণ ফেলে দিয়ে জ্যাকেটের আড়াল থেকে মেশিন পিস্তল বের করে হাতে নিল।

আবার গুলি হলো। পাথরের বেঞ্চটার একটা কোণা উড়ে গেল তাতে, একটু আগে রাইন ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। দলনেতাকে চেঁচিয়ে কিছু বলতে শুনল লিয়া, কিন্তু কথাটা বোঝার চেষ্টা করল না। ও তখন হামাগুড়ি দিয়ে বেঞ্চটার তলায় আশ্রয় নিচ্ছে।

দূর থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে অচেনা আততায়ী। সেদিক লক্ষ্য করে গুলি করল 'দুর্বৃত্তরা। আগ্নেয়াস্ত্রের অবিরাম গর্জনে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হলো ওর, ছোট্ট বাগানটা ধোঁয়া আর ছিটকে ওঠা মাটিতে আবছা হয়ে যাচ্ছে। বেঞ্চের আরও তলায় সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করল ও, সারা শরীর যে সেবাস্টিয়ান গ্রাবের ঝরে যাওয়া রক্তে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। দু'হাতে কান চাপল লিয়া, শব্দের অত্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়।

বেঞ্চের ওপরে কয়েকটা গুলি এসে বিঁধল, সঙ্গে সঙ্গে নীচে ছলকে পড়ল রক্ত। ও বুঝল, বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোনও আর্তনাদ শোনা যায়নি। কারণটা পরিষ্কার—বেচারা মারা গেছেন, নয়তো চিৎকার করার শক্তি অবশিষ্ট নেই তাঁর। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে দুর্বৃত্তদের দলনেতার দিকে তাকাল ও, বাড়ির আড়ালে কাভার নিয়ে লোকটা পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে। লিয়াকে দেখতে পেয়ে পিস্তল তুলল সে, আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। কিন্তু নিশানা করার সুযোগ পেল না লোকটা, ক্যাট্ ক্যাট্ করে রাইফেলের একটানা গুলি ছুটে গেল তার দিকে। রিফ্লেক্সের বশে ট্রিগারে চাপ দিয়েই লক্ষ্য পাল্টাল দলনেতা, গুলিটা লিয়ার উরুর মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেল। কাতরে উঠল ও।

এই সময় রাইনকে দেখতে পেল লিয়া, ঝোপের আড়াল ছেড়ে ভাল কাভারের জন্য ছুটছে। অচেনা আততায়ীর সহজ শিকারে পরিণত হলো সে, পরপর পাঁচ-ছ'টা গুলি বিঁধল তার পিঠে। বেঞ্চ থেকে কয়েক হাত দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল লাশটা, দৃষ্টি বিস্ফারিত।

এবার রণে ভঙ্গ দিল দলনেতা আর তার শেষ সাগরেদ। তাদেরকে বাড়ির দিকে ছুটতে দেখল লিয়া, দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পর কানে এল মার্সিডিজের ইঞ্জিনের গর্জন, কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে গেল তা-ও।

যেমন করে শুরু হয়েছিল, ঠিক সেভাবে অতর্কিতে শেষ হয়ে গেল সব। নীরবতা গ্রাস করল বাগানটাকে। সাহস সঞ্চয় করে বেঞ্চের তলা থেকে বেরিয়ে এল লিয়া। চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে দাঁড়াল। কিন্তু না, ওর প্রাণ কেড়ে নিতে কোনও বুলেট ছুটে এল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পায়ের ক্ষতটা পরীক্ষা করল ও। মারাত্মক জখম নয়, সৌভাগ্যক্রমে নাজুক কোনও ধমনী ছিঁড়ে যায়নি। সেরে উঠতে সময় লাগবে না। এবার সেবাস্টিয়ান গ্রাবের দিকে নজর দিল ও। ভদ্রলোকের বুকে লেগেছে গুলি, ফুসফুস

ফুটো করে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার।

'সাহায্য করুন! কেউ সাহায্য করুন আমাদের!' চেঁচাল লিয়া। আশা করছে, অচেনা যে মানুষটা এতক্ষণ গুলি ছুঁড়ে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আগের মতই নিশ্চুপ রইল প্রকৃতি, কারও সাড়া পাওয়া গেল না।

পায়ের ব্যথাটা অগ্রাহ্য করে মুমূর্ষু মানুষটার কাছে এগিয়ে গেল লিয়া। সেবাস্টিয়ান গ্রাবের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে, দৃষ্টিতে পরাজয়, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুটাকে তিনি মেনে নিয়েছেন। শ্বাস নিচ্ছেন ছোট ছোট করে, বুক আর পায়ের ক্ষত থেকে আগের মত রক্ত বেরুচ্ছে না, সম্ভবত শরীরে খুব একটা অবশিষ্ট নেই বলেই। লিয়া বুঝতে পারছে, এই মুহূর্তে হাতের কাছে একটা অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও হাসপাতালে যাবার আগেই মারা যেতেন বৃদ্ধ।

বেঞ্চের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হতভাগ্য মানুষটার হাত নিজের হাতে তুলে নিল ও। বলল, 'আপনি ঠিক হয়ে যাবেন, মি. গ্রাব। একটু সহ্য করুন। সাহায্য আসছে।' আশ্বাসটা নিজের কানেই ফাঁপা শোনাল।

'আমাকে বলা হয়েছিল কেউ একজন আসবে,' রক্তাক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বললেন বৃদ্ধ। 'কথাটায় খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। তবে ওরাও খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। আমি মুখ খুলিনি।'

'কারা ছিল ওরা?' জানতে চাইল লিয়া। সময় কম, যতটুকু সম্ভব তথ্য জেনে নিতে হবে ওকে।

'জানি না,' বললেন গ্রাব। 'এক সপ্তাহ আগে একটা ফোন এসেছিল। বলল, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লোক আসবে। যেন তৈরি থাকি। রাজি হইনি।'

'কে ফোন করেছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না,' কেশে উঠলেন বৃদ্ধ, এক ঝলক রক্ত

বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। সযত্নে জামার হাতা দিয়ে মুখটা মুছে দিল লিয়া। গ্রাব মলিনভাবে হাসলেন। 'অতীত কারও পিছু ছাড়ে না। ভেবেছিলাম পুরো ব্যাপারটা আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। এখন দেখছি হবে না।'

'কী শেষ হবে না, মি. গ্রাব? কীসের কথা বলছেন?'

'ভয়ঙ্কর এক সত্য, যা আমি এতগুলো বছর ধরে গোপন করে রেখেছি!'

'সোনার কথা বলছেন?' জানতে চাইল লিয়া। 'লোকগুলো আপনার কাছে সোনার খোঁজ চাইছিল?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার। 'সোনার খবর তুমি কী করে জানো? কে তুমি?'

'আপনার একজন শুভানুধ্যায়ী,' সংক্ষেপে বলল লিয়া। 'লোকগুলো আপনার কাছে আটাশ টন সোনার খোঁজ চাইছিল, তাই না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গ্রাব। 'সোনা তো সামান্য একটা অংশ। ওরা জানতে চাইছিল বাকিটার ব্যাপারে। আর কাউকে বলেছি কি না।'

'বলেছেন? বলেছেন কাউকে?'

জবাব দিলেন না গ্রাব, নিথর হয়ে পড়েছেন। লিয়া পালস চেক করতে যাবে, এমন সময় আবার চোখ খুললেন। বললেন, 'রহস্যটা প্রাণ নেয়ার মত। কিন্তু আমাকেই মরতে হবে, এটা কখনও ভাবিনি।'

'কীসের কথা বলছেন, মি. গ্রাব?' বৃদ্ধের হাত ধরে ঝাঁকি দিল লিয়া। 'কী রহস্য?'

'প্যান্ডোরার অভিশাপ! আমি সারাজীবন প্রার্থনা করেছি, আমার সঙ্গে যেন এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে অন্যরকম। কী করার আছে আমার?'

দুশ্চিন্তা বোধ করছে লিয়া। আর বেশিক্ষণ টিকবেন না গ্রাব,

তার আগেই যা জানার জেনে নিতে হবে। কিন্তু কী সব বলছেন, পাগলের প্রলাপ নয়তো? ভদ্রলোকের হাতটা জোরে চাপ দিল ও। 'মি. গ্রাব, আমার দিকে তাকান। প্যান্ডোরার অভিশাপটা কী জিনিস?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'ওরা বলেছিল, একজন আছে... যে সাহায্য করতে পারবে...'

'কারা বলেছিল? যারা আপনাকে ফোন করে সাবধান করে দিয়েছিল, তারা?'

মাথা ঝাঁকালেন গ্রাব।

'কে? কে সাহায্য করতে পারবে?'

শেষবারের মত কাশলেন বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার। চোখ বন্ধ করার আগে ফিসফিস করে বললেন, 'একজন বাংলাদেশি... মাসুদ রানা...।' এলিয়ে পড়লেন নামটা বলেই। লিয়ার হাতের ফাঁক দিয়ে তাঁর নিস্তেজ হাতটা খসে পড়ল। মারা গেছেন ভদ্রলোক।

নিজের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে দেখে অবাক হলো না লিয়া। এই বৃদ্ধ মানুষটার জন্য ওর কষ্ট লাগছে। না জানি কী এক গোপন তথ্য এত বছর আগলে রেখেছিলেন তিনি, এমন ভয়াবহ অত্যাচারেও তা ফাঁস করেননি। কিন্তু এটা শোক করার সময় নয়। চোখের পানি মুছে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করতে বসল ও। তিন-তিনটে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পড়ে আছে এখানে। পুলিশের কাছে যাওয়ার, প্রশ্নই আসে না। সেক্ষেত্রে নিজের নাম-পরিচয় পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হবে। সেবাস্টিয়ান গ্রাবের খুনীরা ওকে চিনে ফেললে নিজেদের বাঁচানোর জন্য কী করতে পারে, ভাবতেও ভয় হচ্ছে। লোকগুলোর নিষ্ঠুরতা নিজ চোখে দেখতে পেয়েছে। ওর মুখ বন্ধ করতে যা খুশি করতে পারে তারা।

নিঃশব্দে কেটে পড়তে হবে এখান থেকে। পায়ের ক্ষতটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ও নিজে ডাক্তার, সেলাই থেকে শুরু করে ওষুধপথ্য—সব ম্যানেজ করে ফেলতে পারবে। আপাতত ওটাই

প্রথম কাজ। পরে কী করা যায় সেটা ভেবে দেখবে।

আহত পায়ের ব্যথাটা অগ্রাহ্য করে নিজের ফোক্সওয়াগেনে ফিরে এল লিয়া। পিছনের সীট থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে রক্তপাত বন্ধ করল। বোতলের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলল মুখে লেগে থাকা রক্ত। তারপর শেষবারের মত বাড়িটার দিকে তাকাল। সামনের রুমে জ্বলতে থাকা একমাত্র বাতিটা মলিন আলো ছড়াচ্ছে। ও নিশ্চিত, খুনীর দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় নয়। মোবাইল বের করে দাদুর নাম্বারে ফোন করল ও। ওপাশে "হ্যালো" শুনতে পেয়ে কেটে দিল লাইনটা, এখন বিস্তারিত আলাপের সুযোগ নেই। শুধু প্রফেসর নোভাকের গলা শুনে নিশ্চিত হয়ে নিল তিনি ঠিক আছেন কি না। ভয় হচ্ছিল, খুনীরা হয়তো দাদুকে অত্যাচার করে সেবাস্টিয়ান গ্রাবের খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটেনি। সুস্থই আছেন নোভাক।

তারমানে দাদুর কাছ থেকে নয়, অন্য কোনওভাবে বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের খবর পেয়েছে লোকগুলো। কীভাবে? কে খোঁজ দিয়েছে? এ নিয়ে দাদুর সঙ্গে কথা বলতে হবে পরে। রহস্য শুধু এই একটা নয়, অনেকগুলো। খুনীরা কারা ছিল? কী তাদের উদ্দেশ্য? হঠাৎ করে তাদের দুজনকে খুন করে কে-ই বা ওর জীবন বাঁচাল? এক সপ্তাহ আগে কারা সেবাস্টিয়ান গ্রাবকে ফোন করেছিল? তারাই বা কী চায়? আর বাংলাদেশি লোকটা... মাসুদ রানা... কে সে? পুরো ব্যাপারটায় তার ভূমিকা কী? কীভাবে সে সাহায্য করতে পারবে? আর প্যান্ডোরার অভিশাপ... সেটাই বা কী জিনিস?

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গিয়ার বদলাল লিয়া, ফিরতি পথ ধরে ছোটাল ফোক্সভাগেনটাকে। মাথায় চিন্তার ঝড়। সবচেয়ে বড় প্রশ্নটারই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কী জিনিস থাকতে পারে, যার তুলনায় আটাশ টন সোনা গ্রাবের চোখে সামান্য একটা অংশ?

সাত

রেইক্ইয়াভিক, আইসল্যান্ড।

পেশায় জিয়োলজিস্ট না হলেও আটলান্টিকের মাঝখানের একখণ্ড দ্বীপটা মাসুদ রানার চোখে এক বিস্ময়কর বস্তু। পৃথিবী নামের গ্রহটার প্রকৃতি কতটা অস্থিতিশীল হতে পারে, তার জলজ্যান্ত নমুনা আইসল্যান্ড, যা সমুদ্র তলদেশের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এক কোটি আশি হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে, আগ্নেয়গিরিগুলো আজও সক্রিয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে এখানে আলাদা কিছু নেই, ভূমিকম্প একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সারা দেশের অসংখ্য আগ্নেয়গিরির মধ্যে দুয়েকটা প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। একই জায়গায় এতসব ভৌগলিক বিশেষত্ব একসঙ্গে অন্য কোথাও সহজে চোখে পড়ে না। এখানে রয়েছে অংসখ্য জিয়ো-থারমাল ভেন্ট, উল্কাপাতের ফলে সৃষ্ট প্রাচীন সব অবিশ্বাস্য আকারের গর্ত,' সেইসঙ্গে একটা পাহাড়ি উপত্যকা—যেখানে মিড-আটলান্টিক রিজ শুকনো জমির সঙ্গে মিশেছে। একশো পঁচাশি মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গ্রিনল্যান্ড সহ এই দেশ এককালে প্যানজিয়া সুপার-কন্টিনেন্টের অংশ ছিল।

অবশ্য ভৌগলিকভাবে যতই আকর্ষণ বোধ করুক, বেড়ানোর জায়গা হিসেবে আইসল্যান্ডকে মোটেই পছন্দ করে না রানা। বিরূপ আবহাওয়াটাই একমাত্র কারণ নয়; আগে যতবার এখানে এসেছে, কোনওবারই সুখকর কোনও অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে

পারেনি। বিশেষ করে সোহানাসহ গুস্তাফ তাতাভস্কির তাড়া খেয়ে এদেশের এপ্রান্ত থেকে সেপ্রান্ত পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ছোটাছুটি করার কথা মনে পড়লে এখানকার আর কিচ্ছু ভাল লাগে না। নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে এখানে আসতে রাজি নয় ও। এবারও কাজের জন্যই পা রাখতে হয়েছে।

রেইক্‌ইয়াভিক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের অবস্থান অ্যামেরিকান একটা মিলিটারি বেসের পাশে, সমতল ভূমিটার বিভিন্ন জায়গায় রিকনাইস্যান্সের জন্য অসংখ্য রেইডার ডোম বসিয়েছে তারা, হঠাৎ দেখায় ফোস্কা পড়া চামড়ার কথা মনে পড়ে যায়। অত্যাধুনিক টার্মিনালটার রিভলভিং ডোর ঠেলে বাইরে পা রাখতেই উত্তর আটলান্টিক থেকে ধেয়ে আসা হিমশীতল বাতাসের স্পর্শে কেঁপে উঠল রানা। গালফ্ স্ট্রিম—ফ্লোরিডা থেকে ইয়োরোপ পর্যন্ত প্রবাহিত উষ্ণপ্রবাহ আইসল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল দিয়ে বইছে বলে দ্বীপটা মানুষের বসবাস করার মত উষ্ণ থাকে। তবে আবহাওয়াটা মোটেই আরামদায়ক নয়। জিয়ো-থারমাল প্ল্যান্টের মাধ্যমে গরম পানি আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা না করা হলে এখানে এস্কিমো ছাড়া আর কেউ থাকতে পারত না। এসব ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকাল রানা, ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে সেটা। মাত্র কয়েকশো ফুট ওপরে ঝুলে আছে কালচে মেঘ। সূর্যের দুর্বল আলোয় দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো নিয়ন বাতির মত ঝলমল করছে।

বম্বার জ্যাকেটের চেন ভালমত টেনে মাথায় একটা বেসবল ক্যাপ পরল রানা। ভারি ব্যাগদুটো নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে থাকল। সার্ভেয়ার্স সোসাইটিতে সাক্ষাৎকারের পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। ঢাকা থেকে ছুটির অনুমোদন দু'দিনের মধ্যে পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রানা এজেন্সির কাজগুলো শেষ করতে না পারায় আগে রওনা হতে পারছিল না। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে মুরল্যান্ডকে পাঠিয়ে দিয়েছে আগে, যাতে প্রাথমিক প্রস্তুতিগুলো

সেরে রাখতে পারে। প্রতিদিন নতুন নতুন কাজ জমা হয়ে যাচ্ছিল, শেষে দুত্তোর বলে সব ফেলে রেখে চলে এসেছে। শাখাপ্রধান জাকিরকে বলে এসেছে, খুব জরুরি কিছু হলে যেন কাগজপত্র রেইক্‌ইয়াভিকে জিয়ো-রিসার্চের স্যাটেলাইট অফিসের মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়।

এ ক'দিনে অবশ্য কিছু রিসার্চও সেরে নিয়েছে ও। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্যাম্প ডিকেড আর প্রজেক্ট আইসওয়ার্ম সম্পর্কে যা যা পেরেছে জেনে নিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অনুরোধ জানিয়ে কিছু রেফারেন্স ডকুমেন্টও চেয়েছিল। কিছু পেয়েছে, কিছু পায়নি। চলে আসার ঠিক আগে একটা ই-মেইল পেয়েছিল: মিউনিখ থেকে নাকি কিছু কাগজপত্র পাঠানো হচ্ছে ওর জন্য। একটু অবাক হয়েছিল, কারণ ওখানে কিছু চায়নি। হতে পারে যাদের কাছে চেয়েছিল, তাদেরই কেউ ওখানে আছে। কিন্তু সেগুলোর অপেক্ষায় বসে থাকার সময় ছিল না। জাকির পরে ওটা পাঠালে স্টাডি করা যাবে। অবশ্য যতটুকু তথ্য পেয়েছে, তা-ও মন্দ নয়। শুধু ক্যাম্পটা সম্পর্কেই নয়, পাশাপাশি আরও অনেককিছু জানা গেছে। এই যেমন... তিপ্পান্ন সালে ক্যাম্পটা বন্ধ হবার সময় অ্যামেরিকান একটা সি-নাইন্টি সেভেন স্ট্র্যাটোফ্রেইটার ওদের এক্সপিডিশন এলাকার কাছাকাছি ক্র্যাশ করেছিল। ব্যাপক তল্লাশি সত্ত্বেও সেটার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

টার্মিনালের সামনে পাঁচ মিনিট দাঁড়াতেই একটা টয়োটা ভ্যান এসে রানার সামনে থামল। প্যাসেঞ্জার ডোরের জানালার কাঁচ নামিয়ে গাঁট্টাগোট্টা আকারের যাত্রী জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মাসুদ রানা, *ডা?*' উচ্চারণটা রাশান।

'আমিই রানা।'

মুখে হাসি দেখা গেল রাশিয়ান লোকটার, দরজা খুলে নীচে নেমে এল। তাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল রানা। অস্বাভাবিক রকম

লম্বা লোকটা, ওর চেয়ে অন্তত এক ফুট বেশি। গায়ে কোনও পারকা নেই, তারপরেও দেহটা বিশাল দেখাচ্ছে। তেমনি চওড়াও। চেহারা বলছে, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়েস। অসম্ভব তাগড়া শরীর, সম্ভবত নিয়মিত কায়িক পরিশ্রমের ফলেই। থাবা দিয়ে রানার হাত ধরল সে। 'আইসল্যান্ডে স্বাগতম, মি. রানা। আমি ম্যাক্সিম বোরোশিন।'

লোকটার হাতের তালুতে রানার হাত অদৃশ্য হয়ে গেছে। 'ধন্যবাদ, মি. বোরোশিন। আপনি কি জিয়ো-রিসার্চের সদস্য?'

'*নিয়েত*। ওরা সবাই জার্মান। আমি এসেছি রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স থেকে। এই অভিযানের একমাত্র রাশান বলতে পারেন আমাকে। আমার টিমের অন্যেরা ওয়েস্টার্ন ইয়োরোপিয়ান।' লোকটা খুব দ্রুত কথা বলে।

ড্রাইভারও নেমে এসেছে ভ্যান থেকে। রানার মত বয়েস আর স্বাস্থ্য। মুখে একটা অসন্তুষ্ট ভাব দেখে মনে হলো ওটা তার চেহারারই অংশ। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। এক দেখায় রানা বুঝে গেল, বোরোশিনের সঙ্গে কাজ করছে না এই লোক। বিশালদেহী রাশিয়ানের মধ্যে একটা শিশুসুলভ চপলতা আছে, যা তার মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল বোরোশিন। 'মি. মাসুদ রানা... ইনি হচ্ছেন কোল ভলকার। আইসল্যান্ডে জিয়ো-রিসার্চের স্যাপোর্ট অফিসের হেড।'

'হাউ ডু ইউ ডু!' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

গ্লাভ না খুলেই হ্যান্ডশেক করল ভলকার। বলল, 'গুড ইভ্‌নিং, মি. রানা।' কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ। 'থ্যাঙ্ক গড যে এসে গেছেন। সবাই আপনার অপেক্ষাতে ছিল।'

রানার মুখে লজ্জার হাসি। 'হাতের কাজ শেষ করতে একটু দেরি হয়ে গেছে। সবার শেষে এসেছি, তাই না?'

'সেকেন্ড লাস্ট। ম্যাক্সিমের গ্রুপের একজন এখনও বাকি

আছে। নইলে আমাদের পুরো টিম রওনা হবার জন্যে তৈরি।'

রাশিয়ানের দিকে ফিরল রানা। 'কোনও সমস্যা?'

'একজন ডাক্তার আছে আমাদের দলে,' জানাল বোরোশিন। 'ভদ্রমহিলা জার্মান। আসার আগে ছোট্ট একটা দুর্ঘটনায় পড়েছেন বলে জানিয়েছেন। তবে মারাত্মক কিছু নয়। সুস্থ হয়ে সরাসরি গ্রিনল্যান্ডে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনার টিমের সবাই বুঝি মিটিয়োরোলজিস্ট।'

'না, না, তা হবে কেন? সৌরবিন্দুর সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পর্ক দেখে বেড়াবে তিনজন, আমি দেখব উল্কাপিণ্ড। আর ডা. নোভাক দেখবেন আমাদের।'

'একটা ব্যাপার আমার জানা হয়নি, ম্যাক্সিম,' বলল ভলকার। 'উল্কা খুঁজতে গ্রিনল্যান্ডে যাওয়া কেন?'

'উল্কা না, উল্কাপিণ্ড,' শুধরে দিল বোরোশিন। 'মাটিতে গোটা উল্কা এসে পড়ে না। আর কেন ওখানে যাচ্ছি? সাদা বরফের ভিতর কালো উল্কাপিণ্ড খুঁজে পাওয়া খুব সহজ বলে। মরুভূমি বা জঙ্গলে ওগুলোকে আর যে কোনও পাথরের মত দেখায়।'

হাসিখুশি রাশিয়ানকে ভাল লেগে গেল রানার। ভলকারের আচার-আচরণে শীতলতা আছে বটে, তবে লোকটা যখন গ্রিনল্যান্ডে ওদের সঙ্গে যাচ্ছে না, তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? ও জানতে চাইল, 'আমার বন্ধু ববি মুরল্যান্ড কোথায়? ভেবেছিলাম ও-ই আমাকে রিসিভ করতে আসবে।'

'মি. মুরল্যান্ড হোটেলে ফুর্তি করছেন,' হাসল বোরোশিন। 'তাই আমরাই এলাম।' তুলাভর্তি বালিশের মত রানার ভারি ব্যাগদুটো ভ্যানের পিছনে ছুঁড়ে দিল সে। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ভলকার, তার পাশে বোরোশিন। রানা ভ্যানের পিছনে উঠে বলল, 'স্যাম র‍্যামসে ঠিকমত পৌঁছেছেন তো... আমার টিম লিডার?'

'পৌঁছেছেন ঠিকই, তবে মন-মেজাজ ভাল নেই,' জানাল ভলকার, স্টার্ট দিয়ে ভ্যান চালাতে শুরু করেছে। 'আপনাদের সঙ্গে গর্ডন হোয়াইট নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের যাবার কথা ছিল না? তিনি আসছেন না। কী নাকি ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'বলছেন কী!' রানার গলায় হতাশা, লোক তো আরও কমে গেল। 'তা হলে তো মাত্র তিনজনে গোটা ক্যাম্প ডিকেড খুঁড়ে বের করতে হবে!'

'ওটার সমাধান করে ফেলেছেন মি. র‍্যামসে। আমাদের জিয়ো-রিসার্চের টিমে ত্রিশজন লোক যাচ্ছে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ওয়ার্কার নিতে পারবেন আপনারা। তা ছাড়া ইকুইপমেন্ট আর প্রভিশনেরও অভাব নেই।'

'কী কী নিচ্ছেন আপনারা?'

এবার কথা বলল বোরোশিন। 'ট্রেলারসহ চারটে স্নো-ক্যাট, একটা স্পেশাল টায়ারের ল্যান্ড ক্রুজার, অনেকগুলো প্রি-ফর্মড় বিল্ডিঙ... তা ছাড়া সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট আর মাসদুয়েক চলার মত খাবার-দাবার তো আছেই।'

'এতসব জিনিস ক্যাম্প সাইটে পৌঁছাবে কী করে? চপারে নিশ্চয়ই নয়? পরিমাণ অনেক বেশি।'

ব্যাকরেস্টের ওপর হাত রেখে রানার দিকে শরীর ঘোরাল বোরোশিন। 'জাহাজে করে আমাসালিক বন্দরে যাব আমরা। সেখান থেকে সব এয়ারলিফট করা হবে কার্গো-ব্লিম্পের সাহায্যে।' হাসল সে। 'জিনিসটার নাম শুনেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এক্সপেরিমেন্টাল এয়ারশিপ, তাই না? সেমি-রিজিড বডি, তাতে চারটে টিল্ট রোটরের ইঞ্জিন বসানো থাকে। হেলিকপ্টারের মত ভার্টিক্যাল টেকঅফ করতে পারে, আবার হরাইজন্টালি ছুটতে পারে বিমানের মত। ভি-২২ অসপ্রে মেরিন এয়ারক্র্যাফটেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাই না?'

'তবে এটা বেসিক্যালি একটা এয়ারশিপই, বৈশিষ্ট্য

হলো—হেভি লিফট-অফ করতে পারে,' বলল ভলকার, এয়ারপোর্টের সীমানা পেরিয়ে রুট-৪১ ধরে ভ্যান ছোটাচ্ছে সে। 'যে কোম্পানি বানিয়েছে, তারা এটার নাম দিয়েছে রোটর-স্ট্যাট। ডক থেকে প্রথমে এয়ারশিপটা আমাদের ভেহিকেলগুলোকে শহরের সীমানা পার করে দেবে। সেখান থেকে ওগুলো চালিয়ে নিয়ে যাবে টিম মেম্বাররা, কিছু যাত্রীসহ। বাকি সব ইকুইপমেন্ট এয়ারলিফট করে পৌঁছে দেয়া হবে ক্যাম্প-সাইটে। অ্যাডভান্স টিমের দায়িত্ব থাকবে বাকিরা পৌঁছানোর আগেই কমপক্ষে একটা বিল্ডিং দাঁড় করিয়ে ফেলা।'

'হুঁ, ভালই একটা ট্রিপ হবে দেখছি,' মন্তব্য করল রানা।

'ওই দেখুন,' হঠাৎ বলে উঠল বোরোশিন, আঙুল তুলে বাঁয়ে একটা রাস্তা দেখাচ্ছে। 'ওটা ব্লু লেগুনে যাবার রাস্তা। নাম শুনে থাকবেন হয়তো। জিয়ো-থারমাল উষ্ণ ঝর্ণা ব্যবহার করে একটা পুকুর তৈরি করা হয়েছে। তাতে গোসল করা যায়, রোগব্যাধিও নাকি সারে। আমি গতকাল গিয়েছিলাম দেখতে।'

ভলকার হাসল। 'পানিটা আসলে পাশের আড়াইশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র—*স্ভার্টসেঙ্গি'র* উচ্ছিষ্ট। ওখানে ভলকানিক্যালি হিটেড ওয়াটার দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পানিটাতে লবণাক্ততা সমুদ্রের মতই, তবে সিলিকা বেশি থাকে। এজন্য *সোরাইয়াসিস* জাতীয় স্কিন ডিজিজের লোকজন আরাম পায়, কিছুটা চিকিৎসাও হয়।'

'আমি অবশ্য একবার গেছি ওখানে,' বলল রানা। 'অন্য একটা কাজে আইসল্যান্ডে এসেছিলাম সেবার। জায়গাটা চমৎকার।'

বোরোশিন সোৎসাহে বলল, 'তা হলে রওনা হবার আগে কালই চলুন একবার ঘুরে আসি ওখান থেকে।'

রানা মাথা নাড়ল। 'দুঃখিত। কাল একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

মুখ গোমড়া করে সোজা হয়ে বসল বিশালদেহী রাশিয়ান। বাকি পথটা নীরবে কাটল। কিছুক্ষণ পর জমাট লাভার পাহাড় পেরিয়ে শহরতলিতে ঢুকল ভ্যান।

আইসল্যান্ডিক ভাষায় রেইক্ইয়াভিক শব্দের মানে "ধোঁয়াটে এলাকা"। আশপাশে সারাক্ষণ জিয়ো-থারমাল ভেন্ট থেকে বের হতে থাকা বাষ্পের কারণেই এমন নাম দেয়া হয়েছে। শহরের নতুন অংশগুলোর নির্মাণশৈলীতে ইয়োরোপীয় ছাপ স্পষ্ট। দূরে আকাশের পটভূমিতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে *হলগ্রিমস্কির্কইয়া:* সিমেন্টের তৈরি এক বিশাল গির্জা, যার মিনারটাই দুশো ফুট উঁচু। স্থানীয়রা একে 'কংক্রিটের ক্যাথিড্রাল' বলে ডাকে।

বন্দরের লাগোয়া প্রাচীন শহরটার সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলল গাড়িটা। নতুন করে সব আবার দেখতে থাকল রানা। পুরনো ভবনগুলো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। নতুন যা তৈরি হয়েছে, তাতে ঐতিহ্যের ছাপ রাখার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এমনটা কেন করা হয়েছে কে জানে! হয়তো এদেশি মানুষেরা পুরনোকে ঠেলে দিতে পারছে না, আবার পারছে না নতুনকেও পুরোপুরি বুকে টেনে নিতে।

বর্গ নামের একটা হোটেলের সামনে এসে ভ্যান থামাল ভলকার। সাদা রঙের একটা বিশাল কাঠামো ওটা, পাবলিক পার্কের ঠিক উল্টোপাশে।

'এসে পড়েছি,' ঘোষণা করার সুরে বলল ভলকার। 'রাতটা এখানেই কাটাবেন আপনারা। কাল রওনা হবে জাহাজ। আমি বোধহয় থাকতে পারব না। কাজেই এখনই বিদায় নিতে চাই। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।'

লোকটাকে বিদায় জানিয়ে ভ্যান থেকে নামল রানা, পিছন থেকে নামাল নিজের লাগেজ। বোরেশিন তাতে সাহায্য করল। বাইরে তীব্র ঠাণ্ডা, নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল ও।

'আপনি দেখছি ঠাণ্ডা বেশ ভালই সহ্য করতে পারেন,'

বিশালদেহী সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলল রানা, লোকটা অনড় রয়েছে।

'ঠাণ্ডার দেশে জন্মেছি, ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পারলে চলবে কী করে?' হেসে বলল বোরেশিন। 'তবে আপনিও মন্দ যান না... অন্তত গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার মানুষ হিসেবে। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি আপনার প্রতিক্রিয়া। বোঝাই যাচ্ছে, মেরু অঞ্চলে আগেও গেছেন আপনি।'

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল রানা।

'ভাল, ভাল,' হাঁটতে হাঁটতে বলল বোরোশিন। 'যেখানে যাচ্ছি, সেখানে পূর্ব-অভিজ্ঞতার দরকার আছে। *পিটারাক* কী, জানেন তো? মাধ্যাকর্ষণজনিত বায়ুপ্রবাহ। অসম্ভব ঠাণ্ডা। দক্ষিণ থেকে প্রথমে হালকা একটা বাতাস আসে, তারপর সব চুপচাপ। দশ মিনিট সময় পাবেন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেয়ার জন্য। এরপরই উত্তরদিক থেকে শুরু হবে ভয়ঙ্কর বাতাস, ঘণ্টায় দুশো চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত গতি ওঠার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দশ বছর আগে এক লোক ওটার কবলে পড়েছিল। তার লাশটা পাওয়া যায় বিশ কিলোমিটার দূরে। এমন অবস্থা, যেন একটা ট্রাক দিয়ে টেনে ছেঁচড়ে নেয়া হয়েছে। কাপড়চোপড় তো ছিলই না, সারা শরীরের চামড়াও উঠে গিয়েছিল।'

'হুঁ। কিন্তু *পিটারাক* তো সাধারণত শীতকাল ছাড়া দেখা যায় না।'

'তা ঠিক। তবে গ্রীষ্মে হবারও রেকর্ড আছে। সাবধান থাকা ভাল।'

হোটেলের লবিতে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘড়িতে রাত দশটা বাজে, কিন্তু বাইরে এখনও আলোর ছটা, কারণ রেইক্ইয়াভিক আর্কটিক সার্কেল থেকে মাত্র দেড়শো মাইল দক্ষিণে। আলোর প্রতারণার কারণে জেগে থাকা ঠিক হবে না। জোর করে ঘুমিয়ে পড়তে হবে, তাতে টাইম জোনের পরিবর্তনের সঙ্গে শরীরে

অভ্যন্তরীণ ঘড়িটাও মিলিয়ে নেয়া যাবে। রিসেপশন থেকে চাবি নিল রানা, তারপর বোরেশিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের রুমে গেল। মুরল্যান্ড আর অন্যদের সঙ্গে সকালে দেখা করলেও চলবে।

রুমটা ছোট হলেও চমৎকারভাবে সাজানো। জানালা দিয়ে পার্কটা দেখা যায়। গ্রিনল্যান্ডে গিয়ে গরম পানি স্রেফ একটা বিলাসিতা হয়ে দাঁড়াবে, তাই সময় নিয়ে গোসল করল ও। শরীর থেকে লম্বা যাত্রার ক্লান্তি ধুয়ে ফেলল। এই ফাঁকে ভাবল সকালের করণীয় নিয়ে। ভ্যানে মিথ্যে বলেনি ও, সত্যিই কাল একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

ইন্টারনেটে ক্যাম্প ডিকেড নিয়ে রিসার্চ করতে করতে তিপ্পান্ন সালে ক্র্যাশ হওয়া সি-নাইন্টি সেভেন কার্গো বিমান আর সেটার খোঁজে করা তল্লাশি অভিযানের ওপর একটা পুরনো আর্টিকেল পেয়েছিল ও। সেখান থেকে জানতে পেরেছিল, এভারেস্ট পর্বতে প্রথম আরোহনকারীদের একজনের ছেলে—এলমার গুডজনসেন, তল্লাশিটাতে জড়িত ছিল। সেসময় এলমারের বয়স ছিল খুব কম, তাই মনে হলো, এখনও বেঁচে থাকতে পারে সে। আর তার কাছ থেকে যে এলাকায় রানা যাচ্ছে, সেখানকার বিষয়ে বিশদ জানা যাবে। সেজন্য রওনা হবার আগের দিন সকালে আইসল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে এলমারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। তাকে পাওয়া যায়নি, তবে তার মাকে পাওয়া গেছে। ভদ্রমহিলার নাম রোজালিন গুডজনসেন। তিনি জানিয়েছেন, এলমার বহুদিন আগেই মারা গেছে। রানা কোথায় যাচ্ছে জানার পর সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, আইসল্যান্ডে পৌঁছে ও যেন অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করে। জরুরি কিছু বলতে চান বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা, সামনাসামনি। প্রতিদিন সকালে *দ্য পন্ড* নামে একটা লেকে তিনি হাঁসদের খাবার খাওয়ান, সকাল সাড়ে ন'টার দিকে গেলে সেখানেই দেখা হতে পারে। বলাই বাহুল্য, রাজি হয়েছে

রানা।

শোয়ার আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম সেট করল ও—সাড়ে ছ'টায় উঠবে। জার্নির ধকলে ঘুম গাঢ় হবে ভেবে দশ মিনিট তফাতে দ্বিতীয় আরেকটা অ্যালার্ম রাখল। তারপর পিঠ লাগাল বিছানায়। কিন্তু চোখে ঘুম এল না, বার বার এপাশ-ওপাশ করতে থাকল। রোজালিন গুডজনসেনের কণ্ঠটা শুধু ভাসছে কানে। তাতে পুত্রশোক নয়, অজানা কোনও আতঙ্ক লুকিয়ে ছিল। কিন্তু সেটা কীসের?

একসময় চোখ মুদল রানা। কিন্তু আবোল-তাবোল দুঃস্বপ্ন ঘুমটাকে শান্তিময় হতে দিল না।

অ্যালার্ম বাজার আধঘণ্টা আগেই শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ল ও। মুখহাত ধুয়ে আর প্রাতঃকৃত্য সেরে পোশাক পরল, তারপর বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে, প্রাতঃভ্রমণের জন্য। পোতাশ্রয়টা হোটেল থেকে মাত্র চার ব্লক দূরে, *পোস্টহাসট্রিটি*—মানে পোস্ট অফিস স্টীট ধরে সোজা গেলেই সামনে; ওখানেই যাবে বলে ঠিক করল। দিগন্তের অনেক ওপরে রয়েছে সূর্য... উঠেছে অনেক আগে, নয়তো কাল রাতে ডোবেইনি। হাঁটতে হাঁটতে ট্যুরিস্ট শপগুলোর ভিউয়িং উইন্ডোতে নজর বোলাল ও, চমৎকার সব সোয়েটার আর শীতের কাপড় দেখতে পাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করে রাখল, অভিযানশেষে ফেরার সময় এখান থেকে দুয়েকটা সোহানার জন্য কিনে নিয়ে যাবে।

রাস্তার শেষমাথায় চওড়া ডক, ওখানেই দেখতে পেল জাহাজটাকে। নাম *নিজোর্ড*, জিয়ো-রিসার্চের জাহাজ, সুরক্ষিত ইনার হারবারের প্ল্যাটফর্মের পাশে মোটা ম্যানিলা রোপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাতাস আর স্রোতের কারণে মৃদু দুলছে লাল রঙের শরীর, পুরো দুশো ফুট লম্বা। বিশাল সুপারস্ট্রাকচারটা সামনের দিকে ঠেলে আফট্ ডেকে কার্গো স্পেস করা হয়েছে। এই মুহূর্তে রিসার্চ টিমের ইকুইপমেন্টে ওটা সম্পূর্ণ ভরা।

গানওয়েল ছাড়িয়ে কয়েকটা স্নো-ক্যাটের মাথা চোখে পড়ে এই মহাযজ্ঞের ভিতরও। সুপারস্ট্রাকচারের ঠিক পিছনে পাশাপাশি দুটো ফানেল দেখা গেল, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এ ছাড়া আফট্ ডেকের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে একটা ওভারহেড ক্রেন রয়েছে, সেটা দিয়ে প্রয়োজনমত কার্গো লোডিং এবং আনলোডিং করা যায়। মালামালের পাশাপাশি জাহাজের পিছনে দুটো পাওয়ারবোট আছে, আর আছে একটা হেলিপ্যাড। অ্যাকোমোডেশন আর রিসার্চ ল্যাবরেটরির জন্য তৈরি করা বিশাল সুপারস্ট্রাকচারটা না থাকলে জাহাজটাকে অয়েল ফিল্ডের রি-সাপ্লাই শিপ বলেই ভ্রম হতো।

অবশ্য যতই দেখল, ততই সন্তুষ্ট বোধ করল রানা। আইসল্যান্ড আর গ্রিনল্যান্ডকে বিচ্ছিন্ন করা ডেনমার্ক প্রণালীর দুর্নাম আছে চোখের পলকে রূপ পাল্টায় বলেন। তবে নিজোর্ডকে দেখে মনে হচ্ছে, যত দুর্যোগই হোক, সব ভালভাবেই মোকাবেলা করতে পারবে এটা।

সত্যিই পারবে তো? সময়ই তা বলে দেবে।

আট

রানা যখন হোটেলে ফিরল, তখন ডাইনিং রুম সরগরম। রিসার্চ টিমের সবাই নাশতা করতে বসেছে। তাদের গল্পগুজবের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা কামরায়। ও লক্ষ করল, এখানে সবারই কমবেশি দাড়িগোঁফ আছে; হঠাৎ দেখায় মনে হয় আদিম একদল

মানবসন্তানের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটায় অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। আর্কটিক অঞ্চলে সবাই কাজ করতে পারে না। যারা করে, তারা সভ্যজগৎ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই চেহারাসুরতেও পরিবর্তন আসে।

দূর থেকে ওকে দেখে হাত নাড়ল মুরল্যান্ড। কাছাকাছি হতেই বলল, 'আবারও ডুব দেয়ার তাল করছ নাকি? রাতে তো যোগাযোগ করোইনি, সকালেও দেখি রুমে নেই। গিয়েছিলে কোথায়?'

'ডকে, জাহাজটা দেখতে।'

'হুঁ। দারুণ জিনিস। এই এলাকার সাগরের জন্য একেবারে আদর্শ। আইসব্রেকারও বলতে পারো, বো-টা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, ধাক্কা দিয়ে এক মিটার বরফ ভাঙতে পারবে।'

'সেটাই দেখলাম,' রানা বলল। 'তা আমাদের টিম লিডার কোথায়?'

'এই তো,' নিজের টেবিলে বসা অপরজনকে দেখাল মুরল্যান্ড। 'স্যামুয়েল র‍্যামসে, মিট মিস্টার মাসুদ রানা।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল স্যাম। 'নাইস টু ফাইনালি মিট ইউ, মি. রানা। মি. ডেমেঙ্কোর মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি।'

'ভদ্রলোক সবকিছু একটু বাড়িয়ে বলেন। আর প্লিজ... আমাকে শুধু রানা বলে ডাকবেন,' হাসল রানা। এই ফাঁকে দলনেতাকে ভাল করে দেখল। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে স্যামের, মাথার চুল ধূসর হতে শুরু করেছে, সম্ভবত ক্রমাগত কাজের চাপে থাকার কারণে। চেহারায় একটা খান্দানি ভাব আছে, নাকের নীচে সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফের কারণে সেটা আরও প্রকট। দেখে ধনী ব্যবসায়ী মনে হয়, অভিযাত্রী একেবারেই নয়। হাতের নরম তালু এটা জানান দিচ্ছে, শারীরিক পরিশ্রমের কাজ সে করে না। মনে মনে হাসি পেল রানার, বেচারাকে নিশ্চয়ই

বাপের চাপে এই অভিযানে আসতে হয়েছে।

'আমাকেও স্যাম বললে খুশি হবো।'

'তোমরা দুজন আলাদা বসেছ কেন?' মুরল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'অন্যদের সঙ্গে মিশলেই পারতে।'

'আর বোলো না!' মুরল্যান্ডের কণ্ঠে বিরক্তি। 'এখানে শ্রেণী বিভাজন চলছে। সবাই নিজ নিজ টিমের সঙ্গে খেতে বসেছে। আমরা জায়গাই পেলাম না।'

'তা হলে আমিও এখানেই বসি, কী আর করা!' চেয়ার টেনে বসল রানা। ওয়েইটারকে ডেকে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল। তারপর বলল, 'আমাদের একজন আসেনি, তাই না?'

'গর্ডন হোয়াইট,' জানাল স্যাম। 'ন্যাশনাল গার্ডে আছে। ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বাবাকে বলেছিলাম অভিযানটা আপাতত মুলতবি করতে; রাজি হলেন না।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'অবশ্য শরীরের যা অবস্থা, খুব একটা দোষ দিতে পারছি না।'

'শুনেছি হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না তিনি।'

'এখন আরও খারাপ অবস্থা,' বিষণ্ন গলায় বলল স্যাম। 'বিছানায় পড়ে গেছে। ক্যান্সার... ডাক্তাররা ছ'মাস সময় বেঁধে দিয়েছেন।'

'ক্যাম্প ডিকেড খোলাটা তাঁর জন্য অনেক বড় কিছু, তাই না?'

'আসলে সেই আমলের কথা আগে কখনও বলতেন না। কিছুদিন আগে কী যেন হলো, হঠাৎ উতলা হয়ে পড়লেন। আমাকে বললেন ওখানে গিয়ে ছবি তুলে আনতে। মায়া লাগল খুব, তাই মানা করতে পারিনি।'

'মানা করবেন কেন? তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে যাচ্ছেন, এটা তো বিশাল ব্যাপার,' বলল মুরল্যান্ড।

এভাবে বোধহয় ব্যাপারটা ভাবেনি আগে স্যাম, তার মুখে

হাসি ফুটল। বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা মন্দ বলেননি। বিশাল ব্যাপারই বটে! কী আর হবে? বলা যায় না, সত্যি সত্যি মজাও পেতে পারি কাজটাতে। অন্তত এই সুযোগে কয়েকদিনের জন্য তো অফিস ছেড়ে বেরোতে পেরেছি।'

'এই তো ঠিক পথে চিন্তা করছেন!' মুরল্যান্ডও হাসল।

'যাক গে, আপনার সম্পর্কে বলুন, রানা,' বলল স্যাম। 'আমি কিন্তু বিশেষ কিছুই জানি না।'

অপ্রস্তুত দেখাল রানাকে। বলল, 'বলার মত কিছু নেই আসলে। সরকারি চাকরি করি। একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিও চালাই। সময় সুযোগ পেলে এটা-ওটা আবিষ্কারের চেষ্টা করি... এই আর কী!'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি, ববির মত আপনিও নুমার সঙ্গে জড়িত?'

'ওটা একটা অবৈতনিক পদ, ওদের ভালবাসার টানে জড়িয়ে গেছি... আর কাজটাও খুব মজার,' হাসিমুখে বলল রানা, 'সময় পেলে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যাই, ব্যস, আর কিছু না।' তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য জিয়ো-রিসার্চ টিমের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওদের ব্যাপারে কিন্তু কিছুই জানা হলো না। আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে?'

'যা ভাব একেকজনের! আলাপের সুযোগ কোথায়?' মুরল্যান্ড মুখ বাঁকাল। 'তবে প্রথমদিন দায়সারাভাবে পরিচিত হতে এসেছিল। ওদের লিডার হলো জেন্স মুয়েলার নামে এক চিড়িয়া। নামের শেষে একগাদা বদখত ডিগ্রি আছে, নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে। সারাক্ষণ বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে—শুধু ড্যানিশ সরকারের চাপে আমাদের সঙ্গে চলেছে, নইলে লাথি মেরে সব ফেলে চলে যেত। আমাদের কারণে যে তাদের সাইট বদলাতে হয়েছে, সেটা তার একদমই পছন্দ না, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়েও দিচ্ছে।'

'চিড়িয়া আরও আছে,' স্যাম হাসল। 'মুয়েলারের ডান হাত... সেকেন্ড ইন চার্জ—থেলমা শোয়ার্জ। বরফকন্যা বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা-ই। মনের মধ্যে দয়া-মায়া কিছু আছে বলে মনে হয় না। ওই তো... বারের পাশের টেবিলটায় বসে আছে। দেখতে পাচ্ছেন?'

ঘাড় ফেরাল রানা। থেলমাকে এক দেখাতেই চিনতে পারল, ঝুঁকে কাকে যেন একটা ফোল্ডার এগিয়ে দিচ্ছে। অপরূপ সুন্দরী, তবে চেহারায় কাঠিন্য আছে। মাথার লম্বা সাদাটে সোনালি চুল ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠে নেমে গেছে। তার পাশেই বসে আছে মুয়েলার, উত্তেজিত ভঙ্গিতে টেবিলে বসা আরেকজনের সঙ্গে তর্ক করছে, মাঝে মাঝে চাপড় দিচ্ছে সামনের টেবিলে। লোকটার বয়স বেশি হবে না, টেনেটুনে চল্লিশ হতে পারে। চোখের মণি সাগরের মত নীল; মাথাভর্তি কালো চুল, দাড়ি-গোঁফও আছে। এর ফাঁক দিয়ে মুখের যেটুকু অংশ দৃশ্যমান হয়, সেখানে চামড়া জায়গায় জায়গায় কুঁচকে গেছে। তবে হ্যাঁ, লোকটার আচার আচরণে যে সহজাত কর্তৃত্বের ছাপ আছে, তা অনস্বীকার্য।

'ওকথা ভুলেও ভাববেন না,' রানার আগ্রহী দৃষ্টির ভুল ব্যাখ্যা করল স্যাম। 'আমি সেদিন আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিলাম, পাত্তাই দেয়নি মেয়েটা। একেবারে বরফের চেয়েও শীতল।'

ভুলটা ভাঙাল না রানা। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

ব্রেকফাস্টের পাশাপাশি দীর্ঘ আন্তরিক আলোচনা চলল। স্যাম র‍্যামসের সঙ্গে ওরা দুজন একাত্ম হয়ে যেতে চাইছে। যে কঠিন একটা জায়গায় কাজ করতে যাচ্ছে, সেখানে টিম মেম্বারদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা ভাল না থাকলে লক্ষ্য অর্জন করা খুব কঠিন। আরও ভাল হতো যদি জিয়ো-রিসার্চের দলের লোকজনের সঙ্গে সময় কাটানো যেত, কিন্তু তারা ওদের তিনজনকে এড়িয়ে চলছে বলে কিছু করা গেল না। মিশতে হলে গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে হবে—তাতে ওদের

ঘোর আপত্তি।

ন'টার দিকে শেষ হলো নাস্তা। অভিযাত্রীরা সবাই যার যার রুমে চলে যাচ্ছে। বারোটায় জাহাজে থাকতে হবে, তার জন্য গোছগাছ করবে এখন। রানা অবশ্য রাতের পোশাক ছাড়া কিছুই বের করেনি ব্যাগ থেকে, মর্নিং ওয়াকে বেরুনোর সময় তা-ও গুছিয়ে এসেছে। তাই তাড়া নেই। তবে রোজালিন গুডজনসেনের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে, তার কোনও ঠিক নেই। সেজন্য মুরল্যান্ডকে বলে রাখল, দেরি দেখলে যেন ওর লাগেজগুলো নিজোর্ডে নিয়ে যায়।

'যাচ্ছ কোথায়?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

খুলে বলল রানা।

'আমিও আসব?'

'দরকার নেই। এদিকের জোগাড়যন্ত্র করো। আমি চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি ফিরতে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। পকেট থেকে একটা গাইড ম্যাপ বের করে গন্তব্য খোঁজার চেষ্টা করছে, এমন সময় দরজা থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল।

'আপনি কি সার্ভেয়ার্স সোসাইটির টিমের?' উচ্চারণে জার্মান টান, গলাটা ভারিক্কি ধরনের। না তাকিয়েই কে কথা বলছে বুঝতে পারল ও—থেলমা শোয়ার্জ।

'জী, ঠিকই ধরেছেন,' বলল রানা। ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরে এগিয়ে গেল জিঁয়ো-রিসার্চের সেকেন্ড ইন চার্জের দিকে। মেয়েটা ওর সমান লম্বা, কাঁধও বেশ চওড়া। কোথায় যেন একটা পুরুষালি ভাব আছে। মাথার চুল এখন পিছনে টেনে ঝুঁটি করে রেখেছে সে, শীতল চোখজোড়ার ওপরে চওড়া কপাল তাতে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। বয়স কত হবে? পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, আন্দাজ করল রানা। ঠোঁটে গাঢ় করে লিপস্টিক মাখায় চেহারায় কামুক একটা ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু তারপরও আকর্ষণ বোধ

করল না ও। কারণ ওই চোখদুটো... সেখানে আবেগ বলে কিছু নেই। কোনও মেয়ের দৃষ্টি এত নির্দয় আর শীতল হতে পারে, কল্পনাতেও ছিল না ওর। 'আমি মাসুদ রানা।' বলে হাসল ও।

হাত মেলানোর কোনও আগ্রহ দেখা গেল না প্রতিপক্ষের মধ্যে। দায়সারাভাবে বলল, 'জেনে খুশি হলাম। আমি থেলমা শোয়ার্জ। আপনাকে এটাই বলতে এসেছি যে, নাশতার টেবিলে আপনি যেভাবে ড্যাব ড্যাব করে আমাকে দেখছিলেন—সেটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। আপনাদের টিমের কারও দেখছি ভদ্রতাজ্ঞান নেই।'

অপমানটা গালে চড় মারার মত। রানা মনে মনে রেগে গেল। মেয়েদের দিকে ও তাকায় বটে, কিন্তু কামনার দৃষ্টি দেয়—একথা কেউ বলতে পারবে না। ঠাণ্ডা গলায় ও বলল, 'আপনি ভুল বুঝেছেন, মিস শোয়ার্জ। আপনার সৌন্দর্যের আকর্ষণে নয়, আমি আসলে দেখতে চাইছিলাম, গ্রিনল্যান্ডে কারা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। শিয়োর হয়ে নেয়া দরকার ছিল—আবার কোনও নির্বোধের হাতে নিজের প্রাণটা সঁপে দিচ্ছি না তো!'

বোঝা গেল, এমন পাল্টা অপমান কল্পনাও করতে পারেনি। এবার থেলমার খ্যাপার পালা। তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। থমথমে গলায় বলল, 'তা, কী বুঝলেন আমাদের দেখে? নির্বোধ নিশ্চয়ই মনে হয়নি?'

'এক দেখায় মানুষকে বিচার করি না আমি,' পিত্তি জ্বালানো হাসি দিল রানা। প্রতিপক্ষ ফুঁসে উঠছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'তবে আপনাদের জাহাজটা দেখে স্বস্তি পেয়েছি। মনে হচ্ছে কাজ ভালই জানে জিয়ো-রিসার্চ।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল থেলমা। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত একদৃষ্টে জরিপ করল ওকে, চোখের আগুনে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঙালি যুবকের হাসি আরও চওড়া হচ্ছে দেখে ক্ষান্ত দিল। উল্টো ঘুরে গটমট করে হেঁটে ঢুকে পড়ল হোটেলে।

গাইড ম্যাপটায় আবার মনোযোগ দিল রানা, মাথায় চিন্তার ঝড়। এত দ্রুত একজন শত্রু বানানো ঠিক হলো কি না ভাবছে। অবশ্য করারও কিছু ছিল না। জার্মানরা একেকজন যেমন হামবড়া ভাব দেখাচ্ছে, আগে হোক বা পরে, একটা গোল বাধতই।

ম্যাপ দেখে *দ্য পন্ড* খুঁজে বের করল ও, স্থানীয়রা ওটাকে বলে *টিজর্ন*। হোটেল *বর্গ* থেকে মাত্র দু'ব্লক দূরে ওটা, দৃষ্টিসীমায় টাউন হলটা না থাকলে এখান থেকেই দেখা যেত। জলাশয়টার তিন দিক ঘিরে রেখেছে উঁচু বিল্ডিঙের সারি, মাঝখান দিয়ে একটা ফুটব্রিজ চলে গেছে। ওখানে পৌঁছুতেই অসংখ্য রাজহাঁস আর কবুতর চোখে পড়ল। পাখিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে যেন জায়গাটা। মানুষও আছে অনেক, পক্ষীপ্রেমীদের পাশাপাশি বেড়ানোর জন্য এসেছে।

ফুটব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ভিড়ে রোজালিন গুডজনসেনকে খুঁজল রানা, ওখানে সবাই রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে হাঁসদের খাবার খাওয়াচ্ছে। বৃদ্ধার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, একদিক থেকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করবে ভাবছিল, হঠাৎই ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারল। ছোটখাট গড়নের মানুষ তিনি, পরনে একটা ফ্যাকাসে রঙের ওভারকোট, মাথায় উলের টুপি। ব্রিজের একপ্রান্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে হ্যান্ডব্যাগ আর হাঁসের খাবারের প্যাকেট, কিন্তু খাওয়াচ্ছেন না।

'মিসেস গুডজনসেন?' কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

ধীর ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখলেন বৃদ্ধা। চেহারায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের বৈশিষ্ট্য প্রকট, মুখের চামড়ায় বলিরেখা, তারপরও দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণ। শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। আপনিই মি. রানা? আমাকে যিনি ফোন করেছিলেন?'

'মাসুদ রানা, ম্যা'ম। দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটল। 'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। আমিই তো দেখা করতে চেয়েছি। চলুন, কোথাও বসি।'

জলাশয়ের কিনার ঘেঁষে একপাশে একটা কাঠের বেঞ্চে বসল ওরা। প্যাকেট থেকে পাউরুটির টুকরা বের করে হাঁসদের দিকে ছুঁড়তে থাকলেন রোজালিন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল। তারপর হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কী সরকারের হয়ে কাজ করছেন, মি. রানা?'

'এ মুহূর্তে নয়,' রানা জবাব দিল। 'আমি গ্রিনল্যান্ডে যাচ্ছি একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানে।'

'তা হলে হঠাৎ আমার ছেলের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলেন কেন?'

'এলাকাটার ওপর রিসার্চ করছিলাম। জানতে পারলাম, তিনি ওখানে একটা ক্র্যাশ করা বিমানের সার্চ অপারেশনে যুক্ত ছিলেন। তাই ভেবেছি, ওঁর সঙ্গে কথা বললে জায়গাটার টপোগ্রাফি আর ওয়েদার কন্ডিশন সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু জানতে পারব।'

ভাসমান খাবারের ওপর হুটোপুটি করতে থাকা হাঁসগুলোর দিকে তাকিয়ে রোজালিন বললেন, 'গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব উপকূল বেশিরভাগ মানুষের কাছেই একটা বিরাট রহস্য। ওখানে নেটিভ ইনুইটদের বসতি নেই বললে চলে। যে ক'টা আছে, তাও ড্যানিশ সরকার বিভিন্ন রকম সাহায্য দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে টিকিয়ে রেখেছে। এলমার যেখানে গিয়েছিল, সে জায়গাটা ইনুইটরা কেন জানি এড়িয়ে চলে। আগে গেছে, এমন কারও কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে আপনি ভাল কাজ করেছেন।'

রানা কিছু বলল না, ভদ্রমহিলার কথা শেষ হয়নি।

'১৯৫৩ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময় তখন, তারিখটা ঠিক খেয়াল নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন রোজালিন, 'রাতের বেলা আমার স্বামীর কাছে একটা ফোন আসে। কেফলাভিক এয়ারবেস থেকে অ্যামেরিকান মিলিটারির এক লোক জানায়, তাদের একটা বিমান ক্র্যাশ করেছে গ্রিনল্যান্ডে। সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশনের জন্য তাদের দক্ষ গাইড দরকার। এলমার

তখন সবেমাত্র এভারেস্টে চড়ার আরেকটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা শেষে বাড়ি ফিরেছে। বাবার মত আর্কটিক বিশেষজ্ঞ ছিল সে-ও, রোমাঞ্চ ভালবাসত। বয়স খুব কম, মাত্র বিশ বছর। খবর শুনে লাফিয়ে উঠল, চলে গেল গ্রিনল্যান্ডে।

'দু'সপ্তাহ বরফে কাটায় ওরা, আপনি হয়তো পড়ে থাকবেন। পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজে... ডগস্লেডে, পায়ে হেঁটে, এমনকী বিমান দিয়েও।'

'ওরা কি ক্যাম্প ডিকেড নামে কোনও জায়গায় গিয়েছিল?'

বৃদ্ধার চোখে বিস্ময় ফুটল। 'আপনি জানেন ওখানকার কথা?'

'আমার অভিযানের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে বেসটা রি-ওপেন করা।' জানাল রানা।

'তা হলে ওখানে কী করা হতো, তা নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। বরফের নীচে বসবাসযোগ্য শহর বানানো যায় কি না, সে চেষ্টা করা হচ্ছিল।'

মাথা নাড়লেন রোজালিন, হাবভাবে অসন্তোষ। 'অমন উদ্ভট প্রজেক্টের কোনও অর্থ আছে, বলুন? বরফের নীচে মানুষ রেখে লাভটা কী?'

'আমার জানা নেই,' বলে রানা হাসল। 'আপনি ভাবছেন ওখানে অন্য কিছু চলছিল?'

'একটা জিনিস দেখাব, তারপর আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন,' বললেন রোজালিন, তবে কোনও কিছু দেখানোর প্রয়াস লক্ষ করা গেল না তাঁর মধ্যে। বরং আগের কথার খেই ধরলেন। 'যা হোক, ওখানে যায়নি ওরা। ক্যাম্প ডিকেড সার্চ পার্টির জন্য অফ-লিমিট ছিল। এমনকী ওটার লোকেশনও ওদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। অবশ্য অজান্তে ওটার ওপর দিয়ে একবার বিমান নিয়ে উড়ে গিয়েছিল এলমার, ওটা কী—পাইলটকে জিজ্ঞেস করায় লোকটা এমন ভাব করেছিল, যেন দেখতেই পায়নি। এলমার অবশ্য বুঝে ফেলেছিল, আমাকে পরে বলেছে।'

পাইলটের আচরণের কারণ বুঝতে পারছে রানা। বলল, 'ওটা স্নায়ুযুদ্ধের আমল ছিল। অ্যামেরিকানরা তখন মিলিটারি সংক্রান্ত সবকিছুই টপ সিক্রেট গণ্য করত। এখন অবশ্য অনেক কিছুই হাস্যকর মনে হয়।'

কথাটায় রোজালিন খুব একটা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। হাতের ব্যাগটা খুলে একটা চামড়ার ওয়ালেট বের করলেন, সেটা থেকে বেরুল দুটো সাদা-কালো ফটোগ্রাফ। রানার হাতে একটা তুলে দিলেন তিনি।

ছবিতে সুদর্শন এক তরুণকে দেখা যাচ্ছে, পরনে রোল-নেক উলের সোয়েটার, মাথায় কোঁকড়া সোনালি চুল। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে।

'এটা এলমারের ছবি,' জানালেন রোজালিন। 'গ্রিনল্যান্ডে যাবার মাসদুয়েক আগে তোলা।' রানার দেখা হলে ওটা আবার ফেরত নিলেন তিনি, ছবিটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। তারপর বাড়িয়ে ধরলেন দ্বিতীয়টা।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। কঙ্কালসার একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে, বিছানায় শোয়া। শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই, চামড়ার নীচে হাড্ডির অবয়ব পুরো বোঝা যাচ্ছে। শীর্ণ দেহের ওপরে মাথাটা অস্বাভাবিক রকম বড় লাগছে, তাতে কোনও চুল নেই, চোখদুটো বসে গেছে গর্তে, ঠোঁট ভেদ করে দাঁত আর মাড়ি যেন বেরিয়ে আসবে। ভয়াবহ একটা দৃশ্য। ছবিটা ফিরিয়ে দিল ও, নীরবে ব্যাখ্যা চাইছে।

'এটাও এলমার,' বিষণ্ন গলায় বললেন রোজালিন। 'গ্রিনল্যান্ড থেকে ফেরার ছ'মাস পরের ছবি, ওর নার্স তুলেছিল। এটা তোলার দুদিন পর ও মারা যায়।' বৃদ্ধার চোখে পানি জমল।

'কী হয়েছিল?'

'ডাক্তাররা বলেছিল, জটিল একটা ক্যান্সার... খুব অ্যাগ্রেসিভ ধরনের। অনেকদিন থেকেই সম্ভবত ভুগছিল, শেষ মুহূর্তের আগে

বোঝা যায়নি।' বলছেন বটে, কিন্তু রোজালিনের কণ্ঠে সন্দেহ।

'আপনি মনে হচ্ছে কথাটা বিশ্বাস করেননি,' বলল রানা।

'ক্যান্সার মানতে আপত্তি নেই আমার,' বললেন রোজালিন। 'কিন্তু এটা বিশ্বাস করি না, প্লেনটা খুঁজতে যাবার আগেই ওটা ওর শরীরে ছিল।'

বৃদ্ধার কণ্ঠে স্পষ্ট অভিযোগের সুর। ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারল না রানা। হয়তো ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে ভদ্রমহিলা ছেলের অকালমৃত্যুকে নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা না ভেবে সান্ত্বনা পেতে চাইছেন। সুস্থ সবল মানুষের ক্যান্সারে মারা যাবার অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে রোগটার কোনও উপসর্গই দেখা যায়নি। এ কারণেই ক্যান্সারকে এত ভয় পায় মানুষ।

রানার নীরবতার অর্থটা বুঝতে পারছেন রোজালিন। খাবারের প্যাকেটটা রেখে ওর দিকে ফিরলেন বৃদ্ধা, দুহাতে চেপে ধরলেন ওর হাত। করুণ গলায় বললেন, 'আমি জানি, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, মি. রানা। নিজেও অনেক আগেই মানুষকে বোঝানোর আশা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, গ্রিনল্যান্ডে এমন কিছু আছে, যেটা এলমারের মৃত্যুর কারণ। আমাদের সরকার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেনি, অ্যামেরিকান মিলিটারিও না। ভয় পেয়ে আমার স্বামীকেও ওখানে খোঁজ নিতে যেতে দিইনি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। ওখানে কিছু একটা আছে... বিষাক্ত কোনও টক্সিন বা রেডিয়েশন, যেটা আমার ছেলের শরীরে ভয়ঙ্কর ক্যান্সারটা তৈরি করেছিল। আমি এটাও বিশ্বাস করি, এর সঙ্গে ক্যাম্প ডিকেডের সম্পর্ক আছে।' রানা প্রশ্ন করার আগেই হাতটা জোরে চেপে ধরলেন তিনি। 'আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই। আর যদ্দূর জানি, ওখানে যারা কাজ করত, তাদেরও কারও এলমারের মত পরিণতি হয়নি। আমি শুধু আপনাকে ডেকেছি এক বুড়ি মহিলার সন্দেহের কথা জানাতে, যে

তার একমাত্র সন্তানকে ঠিক সেখানে হারিয়েছে, যেখানে এখন আপনি যাচ্ছেন। ওখানে কী ঘটতে পারে—সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়াটা আমার কর্তব্য ছিল বলে মনে করি। নইলে বিবেকের কাছে দোষী হয়ে থাকতাম।'

কথা শেষ হয়েছে বৃদ্ধার, হাত ছেড়ে দিলেন তিনি। আবার হাঁসদের দিকে পাউরুটি ছুঁড়তে শুরু করেছেন। রানা উঠে দাঁড়াল। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ম্যা'ম। আমাকে চিন্তার খোরাক দিয়েছেন। কথা দিচ্ছি, সতর্ক থাকব। আপনার সন্দেহ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে এর একটা বিহিতও করব।'

কথাটা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালেন রোজালিন, মুখে হাসি দেখা গেল। বললেন, 'আপনি আমাকে এলমারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, মি. রানা। চেহারা বা বয়সে মিল না থাকতে পারে; কিন্তু আপনিও ওর মতই প্রাণশক্তিতে ভরা, আত্মবিশ্বাসী। দুঃখের বিষয়, তাতে ওর কোনও লাভ হয়নি। আপনারও একই পরিণতি ঘটুক, তা আমি কখনও চাইব না।'

'প্লিজ, আমাকে শুধু রানা বলে ডাকবেন।'

'ঠিক আছে... রানা, আরেকটা কথা বলি। প্লেন ক্র্যাশ আর ব্যর্থ উদ্ধার অভিযানের তিন মাস পর ক্যাম্প ডিকেড বন্ধ করে দেয়া হয়। ডিজম্যান্টেল করে নিয়ে যাওয়া হয়নি, শুধু বন্ধ করে মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেসটাকে ফেলে যাওয়া হয়েছে বরফের তলায় চাপা পড়ে যাওয়ার জন্য। কারণটা কেউ জানে না। আমি মনে করি না, ওটা রি-ওপেন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

বৃদ্ধার উদ্বেগের কারণ রানা বুঝতে পারছে। ও বলল, 'আমি সবরকম সতর্কতা নেব। আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন, রহস্যটা যেন ভেদ করতে পারি।'

'ঠিক আছে, ইয়াং ম্যান। তোমার জন্য আমার শুভকামনা রইল।'

বিদায় নিয়ে ফিরে চলল রানা। মিসেস গুডজনসেনের কথাগুলো ওর মনে দাগ কেটেছে। প্রমাণ নেই কোনও, তারপরও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না। বৃদ্ধার কাহিনিতে কী যেন একটা আছে, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না ও। দীর্ঘদিন থেকে বিপজ্জনক পেশায় থাকার কারণে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ, আগেই বিপদের আভাস পায়। এবারও তেমনই একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে গ্রিনল্যান্ডে অশুভ কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। কী সেটা? জানতে হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। যত বিপদই হোক, পিছিয়ে যাবার মানুষ ও নয়।

ঘড়ি দেখল রানা। নিজোর্ড এক ঘণ্টা পর বন্দর ত্যাগ করবে। এই ফাঁকে চট করে একটা কাজ সেরে নিতে হবে। ঝুঁকি নেবে ও, কিন্তু তার প্রস্তুতি থাকা চাই।

নয়

ডেনমার্ক প্রণালী। রাত ন'টা।

নিজোর্ডের বো'তে টর্পেডোর মত এসে আঘাত করছে উঁচু উঁচু ঢেউ, বাড়ি খেয়ে সাদা ফেনা তুলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে ফরোয়ার্ড ডেকে। সুপারস্ট্রাকচারটা সামনের দিকে হওয়ায় সে পাশটা পানির ছিটেয় ভিজে যাচ্ছে। অবশ্য এই বিপুল জলরাশি তেমন অসুবিধে করতে পারছে না জাহাজটার, সামান্য সময়ের জন্য হয়তো জমা থাকছে ডেকে, তারপর আবার

গানওয়েলের ফাঁকা জায়গা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে সেই অথৈ সাগরে। পাহাড় সমান একেকটা ঢেউ অদম্য সৈনিকের মত অতিক্রম করছে নিজোর্ড, শক্তিশালী টুইন প্রপেলার সব বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

ওয়ার্ডরুমে বসে পুরু কাঁচের পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। পাশে ববি মুরল্যান্ড। কাঁচের ওপর আরেকটা ঢেউ এসে বাড়ি খেতেই রানা বলল, 'ওরেব্বাপরে! দেখেছ অবস্থা?'

'হুঁ,' বলল মুরল্যান্ড। 'প্রকৃতিও আমাদের সমুদ্রভ্রমণ পছন্দ করছে না বোধহয়।'

পোর্টহোলের পাশ থেকে সরে এল রানা। স্যাম র‍্যামসে মুখোমুখি একই টেবিলে বসে ম্যাক্সিম বোরোশিনের সঙ্গে গল্প করছে। তাদের সঙ্গে বোরোশিনের একজন টিমমেট আছে। ভদ্রলোক পোলিশ বংশোদ্ভুত জার্মান, নাম দেজান জুরকিচ, আবহাওয়া-বিজ্ঞানী। বয়স মাত্র চল্লিশের ঘরে, কিন্তু দেখায় অনেক বেশি। মাথার বেশিরভাগ চুল ঝরে গেছে, সেখানে চকচক করছে মস্ত টাক। খুব একটা লম্বা হবে না, শরীরেও মেদ জমেছে। উঁচু নাকের ওপর একটা গোল রিমের চশমা পরায় চেহারাতে ভারিক্কি ভাব এসেছে।

জিয়ো-রিসার্চের লোকজন আর শিপের অফ-ডিউটি ক্রুরা ওয়ার্ডরুমের বাকি টেবিলগুলো দখল করে আছে। জেন্স মুয়েলার আর থেলমা শোয়ার্জ হেড টেবিলে। এখনও সবাই ওদের এড়িয়ে চলছে। বোরোশিন আর তার টিমমেটরা ছাড়া কেউ রানাদের সঙ্গে কথা বলতে আসেনি। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। ঈর্ষাপরায়ণতার সঙ্গে পরিচয় আছে রানার, কিন্তু এরা যা করছে, তা রীতিমত অপমানজনক। এর মধ্যে আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছে ও। জাহাজের ক্যাপ্টেন সবার উদ্দেশে কিছু বলার থাকলে আগে এসে মুয়েলারকে জানায়। ব্যাপারটা কী? সে যে এই অভিযানের নেতা, এটাই কি প্রমাণের চেষ্টা করছে?

রানা কী চিন্তা করছে, সেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে বোরোশিন। বলল, 'যখন গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন এক দেশ ছিল, তখন আমি একটা জয়েন্ট এক্সপিডিশনে গিয়েছিলাম, ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে... এরকমই একটা জাহাজে। কী যে কড়াকড়ি ছিল, কল্পনাও করতে পারবেন না! কেজিবি ওয়াচার হাজির না থাকলে ওদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলা নিষেধ ছিল। ভুলক্রমে যদি কেউ কথা বলেও ফেলে, পরে এসে লিখিত রিপোর্ট দিতে হতো।' মুয়েলার আর থেলমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'বেচারা ফ্রেঞ্চদের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যত যা-ই হোক, অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের ভিতর এরকম বিভেদ থাকা উচিত নয়।'

রানা মাথা ঝাঁকাল। 'কথাটা ঠিকই বলেছেন। তবে আপনার জানা থাকা উচিত, বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সবচেয়েয়ে বেশি ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়।'

বোরোশিনের মুখে হাসি ফুটল। 'জী, সে শিক্ষাও হাতে-নাতে পেয়েছি। এক্সপিডিশনটার শেষে দেখলাম ফ্রেঞ্চরা আমাদের বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট আর ডেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

হেসে উঠল সবাই।

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি উল্কা খুঁজে বেড়ান। জাহাজে কী করছিলেন?' কফির কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল মুরল্যান্ড।

'তখন ওয়েদার রিসার্চার ছিলাম,' জানাল বোরোশিন। 'পরে প্ল্যানেটারি জিয়োলজিতে আগ্রহ বাড়ায় ফিল্ড বদলেছি।'

'প্ল্যানেটারি জিয়োলজি! কীসে আগ্রহ বাড়াল আপনার? উল্কাপাতে এই প্রাচীন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার ইতিহাস?'

'ইতিহাস না, সম্ভাবনা,' সকৌতুকে বলল বোরোশিন। 'এই ফিল্ডে থাকলে অন্তত আগেভাগে তো খবর পাবো—পৃথিবী ধ্বংস হতে যাচ্ছে কি না! সেক্ষেত্রে আমার গার্লফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেষবার দেখা করে নিতে পারব।'

আবারও হাসল সবাই। প্রসঙ্গ পাল্টে স্যাম বলল, 'হট রকস্ সম্পর্কে বলুন, রানা। কেমিক্যাল দিয়ে কীভাবে বরফ গলাব আমরা? আমি কিন্তু একদম আনাড়ি, কিছুটা জেনে রাখা দরকার।'

'পদ্ধতিটা তেমন কঠিন কিছু নয়,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'প্রথমে বরফ খুঁড়ে সামান্য গর্ত করতে হবে, আমাদের অ্যাকসেস টানেলের শেপে... ডিমার্কেশন লাইন ঠিক রাখার জন্যে। সাইডগুলো তারপর প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেব আমরা, যাতে বরফ খসে না পড়ে। এরপর গর্তের তলায় কেমিক্যাল মেশাতে শুরু করব, একটা একটা স্তর করে। বরফ গলতে থাকবে, আর আমরা পানিটা পাম্প করে বাইরে ফেলে দেব। তারপর আবার কেমিক্যালের নতুন লেয়ার দেব। এই আর কী!'

'শুনে তো সহজই মনে হচ্ছে। জটিলতাটা কোথায়?'

'জটিলতা হলো কেমিক্যালটা প্রয়োগের বেলায়। একেকটা লেয়ারে কতটুকু ঢালবেন, সেটার নিখুঁত হিসেব থাকতে হবে। কোনও জায়গায় বেশি, কোনও জায়গায় কম ঢাললে হবে না, টানেলের শেপ বদলে যাবে তা হলে; ধসেও পড়তে পারে। এজন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশন করে নতুন তৈরি হওয়া অংশটার দেয়াল সীল করে দিতে হবে। ঝামেলা আছে অনেক।'

'কেমিক্যালের বদলে গরম পানি ব্যবহার করা যেত না?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'অনেক বেশি পাম্প ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে। তা ছাড়া টানেলের শেপও ঠিক রাখা সম্ভব হবে না। গরম পানি বা বাষ্প দিয়ে তৈরি শাফট সাধারণত ফানেলের আকার ধারণ করে। অমন সুড়ঙ্গ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। গোড়ার জায়গাটা ধসে পড়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।' স্যামের ভ্রূকুটি দেখে আশ্বাসের সুরে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। মাত্র ত্রিশ ফুটের ব্যাপার তো, কেমিক্যালই সবচেয়ে ভাল কাজ দেবে। মাত্র একটা পাম্পেই কাজ চলবে আমাদের, ফুয়েল নিয়েও ভাবতে হবে না।'

'কেমিক্যাল যা আনা হয়েছে, তাতে কাজ চালাতে পারবেন? আবার টান পড়বে না তো?'

'ডেকে বিশ ব্যারেল দেখেছি। আমার তো মনে হয় প্রয়োজনের চেয়েও বেশি আছে।'

'আর লোক? তিনজনে পারব?'

'চারজন হলে ভাল হতো,' স্বীকার করল রানা। 'জিয়ো-রিসার্চ যদি ভালয় ভালয় বাড়তি লোকটা দেয়, তা হলে আর চিন্তা নেই। তিনজন হলে খাটুনি একটু বেড়ে যাবে।' জেন্স মুয়েলারকে ওদের টেবিলের দিকে এগোতে দেখে থেমে গেল ও।

'আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা,' এক গাল হাসি দিয়ে শুদ্ধ ইংরেজিতে বলল জিয়ো-রিসার্চ দলের নেতা। 'রুডি শুমাখার শুভেচ্ছা জানাতে বলেছে আমাকে। সেইসঙ্গে এ-ও মনে করিয়ে দিতে বলেছে, আগামীবার জার্মানি গেলে কিন্তু আপনার তাকে ডিনার করাবার কথা।'

হঠাৎ করে লোকটার এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দেখে হকচকিয়ে গেছে টেবিলের সবাই। পরিবেশটা স্বাভাবিক করার জন্য রানা তাড়াতাড়ি বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি ভুলিনি কথাটা, ওকে জানিয়ে দেবেন।' রুডি শুমাখার একজন জার্মান জিয়োলজিস্ট, কয়েক বছর আগে তাকে একটা ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছিল ও, সেই থেকে বন্ধুত্ব। 'আপনি তাকে কীভাবে চেনেন?'

'ইউনিভার্সিটি জীবনের বন্ধু আমরা,' ব্যাখ্যা করল মুয়েলার। তারপর শুধাল, 'বসতে পারি?'

'অবশ্যই। প্লিজ!'

একটা চেয়ার টেনে ওদের সঙ্গে যোগ দিল মুয়েলার। বলল, 'আপনাকে এই এক্সপিডিশনে পেয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুশি হয়েছি; বিশেষ করে রুডির কাছে যখন শুনলাম, আপনি একজন ন্যাচারাল এক্সপ্লোরার এবং গ্রিনল্যান্ডে আগেও কয়েকবার

গেছেন। আসলে অভিজ্ঞ মানুষজনের সঙ্গে কাজ করার মজাই আলাদা। নিশ্চিন্তে থাকা যায়।'

'আমাকে এক্সপার্ট ভাবলে ভুল করবেন,' রানা বলল। 'রুডি সবকিছু একটু বাড়িয়ে বলে। আপনার টিমের মত প্রফেশনাল নই আমি, স্রেফ একজন অভিযাত্রী।' মুয়েলারের ব্যাপারে ভুল ধারণা ভেঙে যাচ্ছে ওর। কৃতজ্ঞতাও বোধ করছে সবার মধ্যে ঐক্য আনার এই পদক্ষেপটা নেয়াতে। অবশ্যটা কাজটা স্যামের করা উচিত ছিল। হাজার হোক, ওদের কারণে জিয়ো-রিসার্চকে তাদের এক্সপিডিশন সাইট বদলাতে হয়েছে, মনঃক্ষুণ্ন তো হবেই। সার্ভেয়ার্স সোসাইটির টিম লিডার হিসেবে স্যামেরই উচিত ছিল ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোধহয় সে ধরতে পারেনি।

কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে মুয়েলারের, সেটা থেকে একটা সবুজ রঙের মদের বোতল বের করে টেবিলের ওপর রাখল। জিনিসটা *ব্রেনেভিন*—আইসল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী পানীয়। মুয়েলার বলল, 'বিশেষ কারণে আমাদের বেস ক্যাম্পে মদ নিষিদ্ধ করেছি আমি। তবে কাল দুপুরের আগে যেহেতু আমাসালিক পৌঁছুচ্ছি না, আজ রাতে পান করা যেতে পারে। এটা আমার তরফ থেকে আপনাদের জন্য উপহার।'

'আপনি তো চমৎকার লোক হে,' খুশি খুশি গলায় বলল স্যাম। বোতলের মুখ খুলে নিজের খালি কাপে ঢালল খানিকটা ড্রিঙ্ক, তারপর বাড়িয়ে দিল অন্যদের দিকে।

এই সুযোগে রানার দিকে ঝুঁকল মুয়েলার। নিচু গলায় বলল, 'আজ সকালের ঘটনা শুনেছি আমি। থেলমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে আপনার, তা-ই না?'

'না, না,' বলে উঠল রানা। 'কথা কাটাকাটি হবে কেন? সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, আর কিছু না।'

'ভদ্রতা করে এড়িয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। থেলমাকে আমি

ভাল করেই চিনি, মাঝে মাঝেই এমন কাণ্ড ঘটায়। আগে কিন্তু এমন ছিল না। বছরখানেক দেখিনি ওকে, এর মধ্যে কত যে বদলে গেছে... ভাবতে কষ্ট হয়, ওকেই আমি...,' কথা শেষ করল না মুয়েলার। তবে রানা বুঝতে পারল, এর মধ্যে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার-স্যাপার আছে।

'ওকে সঙ্গে আনার ইচ্ছে ছিল না আমার,' নিজেকে সামলে আবার কথার খেই ধরল লোকটা। 'আপত্তিও জানিয়েছিলাম, লাভ হয়নি। যাক গে, ও কোনও বাড়াবাড়ি করলে আমাকে জানাবেন।'

'আপনি না চাইলে মিস শোয়ার্জ টিমে জায়গা পেল কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'করার কিছু ছিল না। জিয়ো-রিসার্চের মালিক এখন আর আমি নই। প্যারেন্ট কোম্পানি ওকে দলে রাখতে বাধ্য করেছে। শুধু তা-ই নয়, আমার ডেপুটিও বানিয়ে দিয়েছে। অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের বসের সঙ্গে ডেটিং করছে ও। ব্যাপারটা কতটা কষ্টের, বোঝেনই তো!' এইটুকু বলেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল মুয়েলার, যেন অজান্তেই বেশি বলে ফেলেছে। সবার উদ্দেশে একটা হাসি দিল সে। 'ব্রেনেভিনটা উপভোগ করুন, জেন্টেলমেন!' বলে পাশের টেবিলে চলে গেল।

মদের বোতলটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোরোশিনও উঠে দাঁড়াল। 'আমি যাই, শুয়ে পড়িগে।' কথাটা শুনে জুরকিচ ছাড়া সবাই বিস্মিত চোখে তাকাল তার দিকে। কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বিশালদেহী রাশিয়ান বলল, 'কিছু মনে করবেন না। অ্যালকোহল আমি একটু বেশিই পছন্দ করি, সেজন্যই নিজেকে সামাল দেয়া দরকার। এক গ্লাস খেলে সেটা দশ গ্লাসে গড়াবে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না। গিয়ে শুয়ে পড়াটাই সবচেয়ে ভাল হবে। গুড নাইট, জেন্টেলমেন। দেজানের দিকে খেয়াল রাখবেন। একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন তো গেল...' তুড়ি বাজাল সে। 'পুরো বোতল খালি হয়ে যাবে।'

লজ্জার হাসি হাসল জুরকিচ। 'ইয়ে... আমিও একটু বেশিই ড্রিঙ্ক করি।' বোরোশিন ওয়ার্ডরুম থেকে বেরিয়ে যেতেই বলল, 'ওকে অভদ্র ভাববেন না। আসলে বছরখানেক হলো মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কি না! আগে ভীষণ আসক্ত ছিল।'

'মনে হচ্ছে অনেকদিন থেকে চেনেন ওঁকে?' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

'আঠারো বছর,' বলল জুরকিচ। 'মস্কো ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়তাম আমরা, যখন পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগী ছিল। উননব্বুইয়ে বার্লিন ওয়ালের পতনের আগ পর্যন্ত সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সেও একসঙ্গে কাজ করেছি। তারপরও যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি, কয়েকটা অভিযানে পাশাপাশি কাজ করেছি আমরা।'

'এবারের অভিযানে আপনাদের মিশন কী?' জানতে চাইল রানা।

'একটা সৌরচক্রের শেষ প্রান্ত চলছে এখন,' জবাব দিল জুরকিচ। 'শীঘ্রি সোলার ম্যাক্স বলে একটা ব্যাপার ঘটবে। সূর্যের মধ্যে ইনটেন্স সানস্পট অ্যাক্টিভিটি দেখা দেবে, আর তার ফলে অবিশ্বাস্য পরিমাণ চার্জড পার্টিকেলের বিচ্ছুরণ হবে। ওটা পুরো পৃথিবীর যে-কোনও কমিউনিকেশন সিস্টেম বা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। আমরা ওটা পরীক্ষা করে দেখব। গ্রিনল্যান্ডে যাচ্ছি, কারণ পৃথিবীর উত্তরেই এটার ইফেক্ট সবচেয়ে বেশি হবার কথা।'

'সোলার ম্যাক্স?' বলল মুরল্যান্ড। 'অরোরা বোরিয়ালিসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে না এর? মেরু অঞ্চলের আকাশে যে স্বর্গীয় আলো দেখা যায়? ওটার কারণেও তো রেডিও কমিউনিকেশন বাধাগ্রস্ত হয়।'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'পেপারে দেখলাম, ওই আলোয় এদিকে একটা ধর্মীয়

সম্মেলন হবে।'

'ইউনিভার্সাল কনভোকেশন বলা হচ্ছে ওটাকে,' জুরকিচ জানাল। 'নতুন পোপ আয়োজন করেছেন। একটা জাহাজে করে ধর্মীয় নেতারা ভ্রমণে বেরুবেন, সম্মেলনও চলবে একসাথে। স্বর্গীয় আলো চাইছেন তো তাঁরা? সোলার ম্যাক্সের কারণে দেখার মত একটা দৃশ্য পাবেন।'

এসব আলোচনায় মন নেই রানার, ও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। মুয়েলার যা বলে গেল, তা নিয়ে চিন্তা করছে। এটা বোঝা যাচ্ছে, জিয়ো-রিসার্চের ভিতরে একটা টানাপড়েন চলছে। থেলমার হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে, মুয়েলারকে থোড়াই পরোয়া করে সে। লোকটার জন্য সহানুভূতি হলো ওর। বেচারা প্রাক্তন প্রেমিকা আর তার নতুন বসের গ্যাঁড়াকলে ভালই ফেঁসেছে। এখানে ওর নিজের অবশ্য করণীয় কিছু নেই, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ওদের অভ্যন্তরীণ। এই দ্বন্দ্ব আরও কতদূর গড়াবে কে জানে!

আনমনে মুরল্যান্ডের ঢেলে দেয়া ব্রেনেভিনে চুমুক দিয়ে কেশে উঠল রানা। 'কী জঘন্য জিনিস!' বলে উঠল ও। 'নাহ্, এটায় পোষাবে না আমার। যাই, আমিও শুয়ে পড়ি।'

'যাও, যাও,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমরা আছি আরও কিছুক্ষণ।'

'বেশি দেরি কোরো না। কাল কিন্তু ডাঙায় নামার আগে সব ইকুইপমেন্ট চেক করতে হবে।'

'ডোন্ট ওয়ারি, মাই ফ্রেন্ড। সময়মতই পাবে আমাকে।'

বিদায় নিয়ে কেবিনের দিকে রওনা দিল রানা।

শীত যখন খুব বেশি পড়ে, তখন গ্রিনল্যান্ড থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত পুরো সাগর প্যাক আইসে ভরে যায়। এ বরফ উত্তর আটলান্টিকের বিখ্যাত আইসবার্গ নয়, সেগুলো গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের গ্লেসিয়ার থেকে সৃষ্টি হয়। ডেনমার্ক প্রণালীর প্যাক আইস আসলে সাগরের জমে যাওয়া উপরিভাগ, এর পুরুত্ব

বড়জোর কয়েক গজ। গ্রীষ্মে এগুলো ভেঙে আর গলে যায় বলে জাহাজ চালাতে তেমন অসুবিধে হয় না। প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয় দ্বীপটাকে মালার মত বেষ্টন করে থাকা গভীর খাঁড়িগুলো। জুলাই মাস পর্যন্ত বরফে টইটম্বুর হয়ে থাকে সেগুলো, সেপ্টেম্বরে আবার নতুন করে জমতে থাকে। মাত্র তিন মাসের একটা সংক্ষিপ্ত সময় গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে জাহাজ নিয়ে পৌঁছানো সম্ভব।

এখন সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রথম দিক। নিজোর্ড যখন খুব সকালে আমাসালিক ইনলেটে ঢুকল, বরফের স্তর তখনও রয়ে গেছে সাগরে, মাঝখানে মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে বেশ কিছু আইসবার্গ, শুভ্র এক দ্বীপের মত অনড় রেখেছে বরফের এই বিশাল বিস্তারকে। ধীর গতিতে বরফ ভেঙে ভেঙে এগোতে হলো জাহাজটাকে। ডেকে তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকী ব্রিজেও আইসব্রেকিং অপারেশনের সময় থাকতে দেয়া হলো না অভিযাত্রী দলের কাউকে। কেউ যদি দেখতে চায়ই, তা হলে একমাত্র উপায় ওয়ার্ডরুমের ফরোয়ার্ড পোর্টহোলগুলো। অবশ্য ঘুম বাদ দিয়ে কেউই এতে উৎসাহী হলো না।

রানার ঘুম ভাঙল বেশ ভোরে। মুখহাত ধুয়ে ওয়ার্ডরুমে গিয়ে দেখল, তখনও আসেনি কেউ; শুধুমাত্র ডিউটি কুক গ্যালিতে নাশতা তৈরি করছে। কফিমেশিন থেকে একটা কাপ ভরে টেবিলে বসল ও, ব্রেকফাস্ট সার্ভ হবার অপেক্ষা করছে। এই ফাঁকে তাকাল বাইরে, বুঝল—বরফ তেমন শক্ত নয়, নিজোর্ড নির্বিঘ্নে এগোতে পারছে। ঝাঁকি-টাঁকি নেই বললেই চলে, বো'র কাছে ডেক লেভেলের ওপর ভাঙা বরফ ছিটকে না উঠলে বোঝাই যেত না—আইস ব্রেক করে এগোতে হচ্ছে জাহাজটাকে।

'গুড মর্নিঙ,' ম্যাক্সিম বোরোশিনকে ঢুকতে দেখা গেল ভিতরে। রানার মত সে-ও এক কাপ কফি নিল, তারপর এসে বসল মুখোমুখি। 'আইসব্রেকিং কেমন দেখছেন?'

'টিভিতে আরও ভাল দেখায়,' হাসল রানা।

'খুব সহজ দেখাচ্ছে, তা-ই না? এক মাস আগে এলে বুঝতেন, প্যাক আইস কী জিনিস! আমাসালিকের ধারেকাছেও ভিড়তে পারতাম না আমরা।'

'ওখানে লোকবসতি কেমন?'

'পঞ্চাশ হাজারের মত,' কফিতে চুমুক দিল বোরোশিন। 'বেশিরভাগই স্থানীয় ইনুইট। তারা ডেনমার্ক সরকারের দেয়া সাপ্লাইয়ের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল। তবে আমার ধারণা এমনিও তেমন অসুবিধে হতো না ওদের, সরকার খামোকা কষ্ট করছে। হাজার হোক, এখানকার আদিবাসী ওরা, সরকারি সাহায্য পাবার আগেও হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে ছিল।'

'আমি একটা বইয়ে পড়েছি, গ্রিনল্যান্ডের ইনুইটরা আলাস্কার আদিবাসীদের ভাষা বুঝতে পারে,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, তা-ই না? কোনও এক কালে হয়তো একই জাতি ছিল এরা। তারপরেও এত বছরে ভাষাটার তেমন কোনও বিবর্তন হয়নি।'

'অবাক ব্যাপার তো বটেই। ভাষা যা-দ্রুত বদলে যায় আজকাল! আজকালকার টিনএজারদের সঙ্গে কখনও কথা বলে দেখেছেন? আমরা বুড়োরা ওদের অর্ধেক শব্দই বুঝতে পারি না।'

কথাটা শুনে রানা হাসল।

ওয়ার্ডরুম ভরে যেতে শুরু করেছে। ব্রেকফাস্টের জন্য একে একে আসতে শুরু করেছে সবাই। মুরল্যান্ড এল খানিক পরেই, তার পিছু পিছু স্যাম র‍্যামসে—এই সাতসকালেও সে গায়ে পারফিউম মেখেছে। রহস্যটা পরিষ্কার হলো একটু পরেই। জিয়ো-রিসার্চ টিমের অ্যাসিসটেন্ট টেকনিশিয়ান এক নীলনয়না সুন্দরী, তার সঙ্গে চোখাচোখি করে বেড়াচ্ছে সে। দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগল রানা আর মুরল্যান্ড। বোরোশিনও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে টিপ্পনী কাটল।

ব্রেকফাস্ট শেষে রুমে গিয়ে গায়ে পারকা জড়াল সার্ভেয়ার্স

সোসাইটির সদস্যরা, তারপর ইকুইপমেন্ট চেকিঙের জন্য আফট ডেকে গেল। হালকা বাতাস বইছে, তাতে সাগরের নোনা গন্ধ। তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলেও সূর্যের আলো কড়া। নিজেদের গিয়ার চেক করতে করতে গরম লেগে উঠল ওদের, ভারি কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে হলো। খানিক পরেই জেন্স মুয়েলার এসে হাজির হলো। বরফের ওপর যেন ঘাম না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা কতটা জরুরি, তার ওপর ছোটখাট একটা লেকচার দিয়ে ফেলল সে, তারপর বোরোশিনের টিমকে নসিহত করার জন্য চলে গেল।

বেশিরভাগ লুজ ইকুইপমেন্ট চারটে স্নো-ক্যাট আর সেগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত ট্রেলারগুলোয় তুলে ফেলা হয়েছে। স্নো-ক্যাটগুলো খুবই শক্তিশালী, আকারে একেকটা মুভিং ভ্যানের মত, ট্র্যাকগুলোও চওড়া—দেখলে বুলডোজারের মত মনে হয়। চারটে ট্রেলারের মধ্যে দুটো হচ্ছে বাক্স আকারের—দশ ফুট উঁচু, পঁচিশ ফুট লম্বা। অন্যদুটো খোলা, ট্রাকের মত, যাতে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিঙের বিভিন্ন অংশ লোড করে রাখা হয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণ মালবাহী। সব ট্রেলারের তলাতেই স্প্রিঙ-কুশনড় স্কি লাগানো আছে, বরফের ওপর দিয়ে অনায়াসে চলতে পারবে।

'এতসব মালামাল বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার দরকারটা কী?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'রোটরস্ট্যাট যখন আছেই, তখন ভেহিকেল থেকে শুরু করে সব মালামাল এয়ার লিফট করে নিয়ে গেলেই তো হয়।'

'খরচ আর ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপার আছে,' জানাল স্যাম। 'এয়ারশিপটা এক্সপেরিমেন্টাল। এত মালামাল বইতে পারবে কি না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। তা ছাড়া এক ট্রিপে একটার বেশি স্নো-ক্যাটও নিতে পারবে না বলে শুনেছি। জিয়ো-রিসার্চ বাড়তি ট্রিপের জন্য টাকা খরচ করতে চাচ্ছে না। স্নো-ক্যাট আর ট্রেলারগুলো ড্রাইভ করে নিয়ে গেলে ওদের প্রায় পঞ্চাশ হাজার

ডলার খরচ বাঁচে।'

'আর আমরা যেহেতু সিন্দাবাদের ভূতের মত ওদের ঘাড়ে চেপে বসেছি, তাই ভেহিকেলগুলো চালিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দিয়ে একটা শিক্ষা দিচ্ছে, তা-ই না?'

রানা জানতে চাইল, 'কেন, ওদের কেউ আমাদের সঙ্গে যাবে না?'

'তা যাবে। ভেহিকেল এক্সপার্ট তো দেবেই, তা ছাড়া ইমার্জেন্সি সামলাতেও লোক থাকবে সঙ্গে।'

'দ্যাখো, দ্যাখো!' হঠাৎ বলে উঠল মুরল্যান্ড, চোখের সামনে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা ধরে রেখেছে।

'কী হয়েছে?'

'সামনে জমিন আছে। ওই তো!' আঙুল তুলল মুরল্যান্ড।

এবার রানা আর স্যামও দেখতে পেল। কুয়াশার চাদরের মাঝখান ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে একটা বরফে ছাওয়া নিঃসঙ্গ পাহাড়ের চূড়া।

'ওটা কুলুসুক আইল্যান্ড,' জানাল কাছে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজের এক ক্রু। 'ওখানে আগে একটা আর্লি-ওয়ার্নিং রেইডার ফ্যাসিলিটি ছিল, এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে এয়ারস্ট্রিপ আছে একটা, রেইক্‌ইয়াভিক থেকে প্লেনে মাত্র দেড় ঘণ্টা লাগে।'

'আমাসালিক আর কতদূর?' প্রশ্ন করল স্যাম।

'খুব কাছে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত লাগবে।'

সময় অবশ্য আরেকটু বেশি লাগল, এক ঘণ্টা পর তাসিলাক বে'তে ঢুকল নিজোর্ড, তিনদিকে সাগর অদৃশ্য হয়ে পাথুরে তটরেখা উদয় হলো। এখানে পাহাড়গুলো কাঁচের মত চকচকে, আকাশের গায়ে ভৌতিক মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। জমাট বরফের মাঝ দিয়ে একটা চ্যানেল চোখে পড়ল, আগেও জাহাজ গেছে। যতই ভিতরে গেল, ডানে-বায়ে আইসবার্গের দেখা মিলল—কিছু একেবারে নতুন, পুরনোগুলো গ্যাসীয় প্রভাবে

কালচে নীল বর্ণ ধারণ করেছে।

খানিক পরেই পোর্ট সাইডে আমাসালিক শহর উদয় হলো। ওখানে প্রথমেই চোখে পড়ল জঞ্জাল—একটা স্লোপ ধরে এসে সাগরে পড়ছে। পিছনে এক জায়গায় কিছু পোড়ানোও হচ্ছে, কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

'প্রথম দর্শনটা ভাল হচ্ছে না,' মন্তব্য করল দেজান জুরকিচ। শিপের প্রায় সবাই বেরিয়ে এসেছে ডেকে।

বোরোশিন বলল, 'স্থানীয়রা তাদের আবর্জনা কুঁড়ের বাইরে ফেলতে অভ্যস্ত ছিল। আধুনিক প্যাকেজিঙের সঙ্গে পরিচয় হবার পরও অভ্যাসটা শুরুতে ছাড়তে পারেনি। এটা জানত না, মেটালের টিন আর প্লাস্টিকের র‍্যাপার এক শীতে পচে মাটিতে মিশে যায় না। শহরটা আবর্জনার খনিতে পরিণত হয়েছিল। এখন যেভাবে নিষ্কাশন করা হচ্ছে, তাতে অন্তত কোথাও কিছু জমে থাকছে না।'

তীরে স্থাপন করা দুটো প্রকাণ্ড ফুয়েল ট্যাঙ্ককে পাশে রেখে সরু একটা ইনলেট ধরে কংক্রিটের পিয়ারে এসে পৌঁছাল নিজোর্ড, পিছনেই একটা বড় ওয়্যারহাউস আছে। ইনলেটে প্রচুর মাছ ধরার নৌকা দেখা গেল। শেষ মাথায় একটা ব্রিজ আছে, শহরের ভিতর দিয়ে বরফগলা পানি স্রোতের মত এসে ওটার তলা দিয়ে মিশছে সাগরে। ওপাশ থেকেই শুরু হয়েছে শহর, ঢালু জমিতে ধাপে ধাপে বিভিন্ন রকম ভবন... হাল্কা তুষারের চাদরে মুড়ি দিয়ে আছে। বেশিরভাগ বাড়িই কাঠের, রঙচঙা—সম্ভবত বরফের একঘেঁয়ে সাদা রঙের হাত থেকে চোখকে বিশ্রাম দিতেই এ ব্যবস্থা। সব বাড়ির পাশেই আছে ড্রাইং র‍্যাক, তাতে শুকনো মাছ আর সীলের মাংস রাখা। এই বিচ্ছিন্ন জনপদ ষোলশো ইনুইট আর হাতে গোনা জনাকয়েক ড্যানিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের আবাস।

ডকে পৌঁছে লম্বা করে এয়ারহর্ন বাজাল নিজোর্ড, প্রত্যুত্তরে

কাছেই কোথাও ডেকে উঠল একপাল স্লেডডগ্।

'ওয়েলকাম টু গ্রিনল্যান্ড, মাই ফ্রেন্ডস্,' ডেকের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল জেন্স মুয়েলার, পাশে রয়েছে থেলমা শোঁয়ার্জ, বাতাসে তার সোনালি চুল উড়ছে। 'আমাদের যাত্রার প্রথম অংশ শেষ হয়েছে। এবার দ্বিতীয় অংশের পালা। ক্যাপ্টেন আমাকে জানিয়েছেন, রোটরস্ট্যাট ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। আপনারা সবাই তৈরি তো?'

'সার্ভেয়ার্স সোসাইটি রেডি,' রিপোর্ট দিল স্যাম। 'সমস্ত ইকুইপমেন্ট চেক করে সিকিউর করা হয়েছে।'

বোরোশিনের দিকে তাকাল মুয়েলার। 'আপনাদের খবর কী?'

'আমরাও তৈরি,' জানাল বিশালদেহী রাশিয়ান।

'একসেলেন্ট। প্রথমে ভেহিকেলগুলো আনলোড করব আমরা। ওই সময়টায় ডেকে কেউ না থাকলে ভাল হয়। ভিতরে ঢুকে পড়বেন, চাইলে শিপ থেকে নেমে ঘুরেও আসতে পারেন। তবে এর পরে সবাইকে ওয়ার্ডরুমে চাই আমি। ওখানে একটা ম্যানিফেস্ট রাখা হয়েছে, যাতে জানতে পারেন—কারা স্নো-ক্যাটে যাচ্ছে আর কারা আকাশভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছে। কারও মনে যেন কোনও দ্বিধা না থাকে।'

'রোটরস্ট্যাটে যাচ্ছে কেউ?' জানতে চাইল জুরকিচ।

'না, ওটা এক্সপেরিমেন্টাল এয়ারক্র্যাফট। যাত্রী নেয়ার নিয়ম নেই। এয়ার লিফটের প্যাসেঞ্জাররা হেলিকপ্টারে যাবে। আর কোনও প্রশ্ন আছে কারও?'

দেখা গেল, নেই। জটলা ভেঙে গেল। বুক পকেট থেকে একটা পোলারাইজড সানগ্লাস বের করে চোখে দিল রানা। মুরল্যান্ড জানতে চাইল, 'যাবে নাকি শহরে ঘুরে আসতে?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'রোটরস্ট্যাটটা দেখার লোভ সামলাতে পারছি না।'

'আমিও তা-ই চাইছিলাম।'

স্যাম, বোরোশিন আর জুরকিচেরও একই ইচ্ছে। অপেক্ষা করতে থাকল সবাই।

সময়মত চলে এল এয়ারশিপটা। দৃষ্টিসীমায় উদয় হবার দশ মিনিট আগে থেকেই শোনা গেল রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে গুমগুম আওয়াজে ভরিয়ে তুলল গোটা বন্দর। একটু পরেই দেখা গেল ওটাকে, বিশাল শরীর—পুরো চারশো ফুট লম্বা, সাধারণ যে কোনও এয়ারশিপের দ্বিগুণ। চেহারাটা পুরনো আমলের জেপেলিনের মত, তবে ভাল করে তাকালে পার্থক্যটা চোখে পড়ে। বাতাস ভরা অংশটা টর্পেডো আকারের হলেও ওটার ওপর-নীচ সমতল, ডগাটা হাঙরের মুখের মত, লেজের সরু অংশটা বেশ দীর্ঘ, তাতে ক্রুশের মত করে চারটা ফিন লাগানো। ইন্টারনাল স্কেলিটন মজবুত করে দুপাশে বসানো হয়েছে চারটে ইঞ্জিন, নীচের গন্ডোলার মত মালবাহী অংশটার সঙ্গে ওগুলোর কোনও কাঠামোগত সম্পর্ক নেই। সাদা রঙের কার্বন-ফাইবার স্কিনের কারণে হঠাৎ দেখায় মেঘ বলে ভ্রম হয়। আশ্চর্য এক দৃশ্য এই আকাশযানটা, হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে হয়।

একজস্ট দিয়ে কালো ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে আসছে অতিকায় রোটরস্ট্যাট, সেটার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে গোটা ডক। হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, এমন জিনিস দেখেও আনন্দ।

'জিসাস!' সবিস্ময়ে বলে উঠল বোরোশিন। 'এই দৃশ্য রোজ রোজ দেখা যায় না?'

'রোজ দেখলে আর মজাটা থাকত কোথায়?' বলল রানা।

একজন ক্রু এসে ডেক থেকে সরে যেতে অনুরোধ করল ওদের। শিপ থেকে নেমে নিরাপদ দূরত্বে পিয়ারে গিয়ে দাঁড়াল রানারা, পাশাপাশি আরও ক'জন অভিযাত্রী। কৌতূহলী স্থানীয় লোকজনেরও একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেছে ততক্ষণে। আগ্রহী চোখে সবাই দেখতে থাকল এয়ারশিপের কাণ্ডকারখানা।

হোভার করে নিজোর্ডের ওপর এসে থামল রোটরস্ট্যাট, ইঞ্জিন পডগুলো ঘুরে গিয়ে সমান্তরাল থেকে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টারের মত বাতাস এসে বাড়ি খেতে শুরু করল জাহাজের ডেকে। সেফটি গিয়ার পরে ছুটে এল কয়েকজন ক্রু, এয়ারশিপ থেকে ঝুলতে থাকা মুরিং রোপ আঁকড়ে ধরল তারা, টেনে নিয়ে গিয়ে একটা স্নো-ক্যাট আর ট্রেলারের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আটকে দিল। ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ রাখছে পাইলট, ক্লিয়ারেন্স পেতেই উইঞ্চ মোটর চালু করল, মুরিং রোপ টান টান হতেই থামাল সেটা। এরপর উপরে উঠতে শুরু করল রোটরস্ট্যাট, দর্শকদের বিস্মিত চোখের সামনে আলতো টানে শূন্যে ভাসিয়ে ফেলল স্নো-ক্যাট আর ট্রেলার, ওটার বিশ ফুট নীচে ঝুলছে ওগুলো। ভেহিকেলদুটো আকারে বড় হওয়ায় আকাশযানটার হোল্ডে ঢোকানো সম্ভব হচ্ছে না, এভাবেই ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নিজোর্ড থেকে অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে থামল অতিকায় রোটরস্ট্যাট, স্থির অবস্থায় নাক ঘোরাল মূল ভূখণ্ডের দিকে, একই সঙ্গে পডগুলোর আগের মত সমান্তরাল অবস্থানে চলে গেল। ইঞ্জিনের একটা থ্রাস্টের সঙ্গে ফরোয়ার্ড মোমেন্টাম অর্জন করল এয়ারশিপটা, ধীরে ধীরে বাড়ল সামনের দিকে। পশ্চিমে যাচ্ছে ওটা, সেখানে তিন হাজার ফুট উঁচু একসারি পাহাড় আমাসালিককে গ্রিনল্যান্ডের মূল অংশ থেকে আলাদা করে রেখেছে। পর্বতমালা নিরাপদে পেরুনোর জন্য যেতে যেতে উচ্চতা আরও বাড়াল রোটরস্ট্যাট, দশ মিনিট পরেই হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল স্থানীয় দর্শকরা, এবার হাততালি দিয়ে উঠল।

রানারা ফিরে এল জাহাজে। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে মুয়েলার। ওদের দেখে বলল, 'এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ট্রিপের জন্য ফিরে আসবে রোটরস্ট্যাট। হান গ্লেসিয়ারের ওপর সমস্ত ভেহিকেল

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—ওটাই আমাদের স্টেজিং এরিয়া। এখান থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে।'

'এক ট্রিপে এক ঘণ্টা?' ভ্রূ কোঁচকাল মুরল্যান্ড। মনে মনে হিসেব করে নিল দ্রুত। 'তা হলে লোডিং-আনলোডিং ঠিকঠাকমত হলেও তো সন্ধে সাতটা বেজে যাবে। রওনা হবার জন্য দেরি হয়ে যায় না?'

'ব্যাপারটা আমি আগেই ভেবেছি। আজ রাতটা নিজোর্ডেই কাটাবে সবাই, কাল খুব ভোরে রওনা দেবে। অ্যাডভান্স টিমও আগামীকাল যাচ্ছে। আমরা সকালে রওনা হলেও অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগে ক্যাম্প সাইটে পৌঁছুবে ওরা। একটা বিল্ডিং দাঁড় করানোর জন্য সময়টা দরকার।'

'মাত্র একটা বিল্ডিঙে এত লোক ধরবে কীভাবে?'

'সবাই যাচ্ছে না কাল,' জানাল মুয়েলার। 'আগে পুরো বেসটা তৈরি হয়ে নিক, তারপর যাবে মূল টিমটা। ততদিন ওরা জাহাজেই থাকবে।'

'বেস খাড়া হতে কতদিন লাগবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'খুব বেশি হলে দুদিন।' হাসল মুয়েলার। 'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কিন্তু হাত লাগাতে হবে... সবার স্বার্থে। তার মানে দুদিনের আগে ক্যাম্প ডিকেডের খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতে পারবেন না। মি. বোরোশিন, আপনার রিসার্চও বন্ধ থাকবে।'

আপত্তি করল না স্যাম বা বোরোশিন। রানা আর মুরল্যান্ডও রাজি।

দিনের বাকি সময়টা কেটে গেল অলস ভাবে। সন্ধ্যার মধ্যে ভেহিকেল সরিয়ে শেষ করল রোটর-স্ট্যাট। রাত সাড়ে দশটায় ক্যাম্প ডিকেডের পাশে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের প্রথম লটটাও পৌঁছে দিয়ে ফিরেও এল। জায়গাটা আমাসালিক থেকে দুশো মাইল উত্তরে। রাতভর কাজ করবে এয়ারশিপটা, তারপর ফিরে যাবে ইয়োরোপে। সেপ্টেম্বরে জিয়ো-রিসার্চের মিশন শেষ হলে

আবার আসবে সমস্ত মালামাল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

আপার ডেকে দাঁড়িয়ে অসময়ের সূর্যাস্ত দেখছিল রানা। সাদাটে একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতশ্রেণীর গায়ে—ওটা আসলে বরফের ওপর অস্তগামী সূর্যের প্রতিফলন। বাতাস আশ্চর্য রকম পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা। জোরে শ্বাস নিলে খচ করে বুকের ভিতর বেঁধে।

আনমনে পরিস্থিতিটা বিচার করছে ও। সারাজীবন যত অভিযানে গেছে, প্রায় সবখানেই নেতৃত্ব দিতে হয়েছে ওকে। সম্ভবত এই প্রথম অন্যের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে। এ নিয়ে মনে কোনও খেদ নেই ওর, তারপরও স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ এড়িয়ে যেতে পারছে না। স্যাম র‍্যামসে'র অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ইমার্জেন্সি সামলানোর মত মানসিক দৃঢ়তা তার নেই। আর বরফের ওপর কত ধরনের বিপদ ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই বেচারার। মুয়েলার যোগ্য লোক, কিন্তু পুরো দলের ওপর তার নিয়ন্ত্রণে কোথায় যেন একটা খুঁত রয়েছে। আড়াল থেকে থেলমা আবার কলকাঠি নাড়ছে না তো? বোঝা মুশকিল, পুরো অভিযানটার ব্যাপারেই কেন জানি মন খুঁতখুঁত করছে ওর। কিন্তু কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল রানা। কিছু যদি ঘটে, তা হলে সেটা সামাল দিতে হবে শক্ত হাতে। দিগন্তের দিকে আবার তাকাল ও। অস্তায়মান সূর্যের আলো নীল হতে হতে মিলিয়ে গেল একসময়।

দশ

হান গ্লেসিয়ার, গ্রিনল্যান্ড।

একটা স্নো-ক্যাটের ওপর দাঁড়িয়ে বিনোকিউলার চোখে তুলল রানা, দৃষ্টিসীমাটা বাড়িয়ে নেয়ার ইচ্ছে। চারপাশের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়, একমাত্র সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও এমন দিগন্তের বিস্তার চোখে পড়ে না। সেটা আবার সূক্ষ্ম রেখার মত, হালকা নীল আকাশ ধবধবে বরফের সঙ্গে এমনভাবে মিশেছে যে ভাল করে না তাকালে বোঝাই যায় না। পুবদিকে বিশ মাইল দূরে, যেখানে এই সুবিশাল গ্লেসিয়ারের তিন হাজার ফুট ঢাল, সেখানে দিগন্তরেখাটা মিলিয়ে গেছে। আর পশ্চিমে পড়ে আছে সাড়ে আট লক্ষ বর্গমাইলের হিমশীতল শূন্যতা।

একটা আলফা এয়ার জেটরেঞ্জার হেলিকপ্টার দুই ট্রিপে গ্লেসিয়ারে নামিয়ে দিয়ে গেছে অভিযাত্রীদের। পরিবেশটা ভীষণ নীরব, কেউ সামান্য কথা বললেও সেটা অস্বাভাবিকভাবে বাজছে কানে। একটানা বাতাস বইলেও সেটা এমন তীব্র কিছু নয়, পায়ের কাছ থেকে উড়ছে না কোনও তুষারকণা। অবশ্য তাপমাত্রা ফ্রিজিং পয়েন্টের দশ ডিগ্রি নীচে।

রানার হাতে উলের পুরু গ্লাভস্। নায়লনের একটা শেল জ্যাকেট পরেছে ও, মাথার ওপর তুলে রেখেছে হুডটা। তলায় একটা লেদার জ্যাকেট আছে, আরও আছে সোয়েটশার্ট ও টিশার্ট। পায়ে গলিয়েছে থারমাল আন্ডারঅয়্যার আর জিন্সের

প্যান্ট, তার ওপর দিয়ে নায়লনের ওভারপ্যান্ট আছে। পায়ে ইনসুালেটেড হাইকিং বুট। আর্কটিক গিয়ার এরচেয়ে ভারি হয়, তবে আগামী বিশ ঘণ্টা যখন ড্রাইভিং করে কাটবে, তখন এর বেশি কিছু না পরলেও চলে।

স্নো-ক্যাটের পিছনে দাঁড়িয়ে মুরল্যান্ড গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেইডারটাকে ভাল করে বাঁধছে, উঁচুনিচু পথের কারণে যাতে আছাড়-টাছাড় না খায়। রানা নেমে আসতেই বলল, 'খালি প্রকৃতি দেখে বেড়ালেই চলবে? হাত লাগাও আমার সঙ্গে।'

'এই দৃশ্য বারবার দেখলেও পুরনো হয় না।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ,' মুরল্যান্ড একমত হলো। 'আমি শুনেছি, গ্রিনল্যান্ডের সমস্ত বরফ যদি গলে যায়, তা হলে সারা পৃথিবীর সী-লেভেল পঁচিশ ফুট বেড়ে যাবে।'

'ঠিক। তবে তুমি ভুলে যাচ্ছ, এই বরফের চাপে দ্বীপের মাঝখানটা এক হাজার ফুটের মত দেবে গেছে। বরফ যদি গলেই, তা হলে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফ্রেশওয়াটার বেসিন হবে।'

'হয়েছে!' মুরল্যান্ড হেসে উঠল। 'তোমার সঙ্গে আমি ট্রিভিয়া-যুদ্ধে পারব না।'

রানাও হাসছে। 'পারবে, পারবে। সাবজেক্ট পাল্টাতে হবে আর কী! যেমন ধরো, সাবমেরিন।' মুরল্যান্ড যে জলযানটার অন্ধভক্ত, তা সবাই জানে। একসময় সাবমেরিনার ছিল সে, নুমায় যোগ দেয়ার বেশ কয়েক বছর আগে, তখন মার্কিন নৌবাহিনীতে চাকরি করত। পরেও এ বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছে, নুমার সাব-সারফেস উইঙে কাজ করেছে বছর তিনেক। এখন তাকে রীতিমত বিশেষজ্ঞ বলা চলে।

জেন্স মুয়েলার দাঁড়িয়ে আছে কাছেই, হাতে ধরা একটা জিপিএস-এ ফিক্স নিচ্ছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড নোটবুকে টুকে নিল সে, তারপর

সবকিছু ঢুকিয়ে ফেলল পারকার পকেটে। বলল, 'সবাই তৈরি?'

ইতিবাচক জবাব দিল স্যাম আর বোরোশিন।

'তা হলে চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

পুরো কনভয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ম্যানুভার করতে পারে টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজারটা। ওটাই সবার সামনে থাকবে বলে ঠিক করা হয়েছে। নুয়েনডর্ফ নামে এক প্রাক্তন র‍্যালি চ্যাম্পিয়ান ড্রাইভার ওটা চালাবে, সঙ্গে থাকবে মুয়েলার, থেলমা আর বোরোশিন—এদিককার জিয়োগ্রাফি সম্পর্কে ওরাই সবচেয়ে ভাল জানে, নুয়েনডর্ফকে গাইড করবে।

সার্ভেয়ার্স সোসাইটিকে দেয়া হয়েছে প্রথম স্নো-ক্যাটটা। পালা করে ড্রাইভিং করবে ওরা। যানটার কন্ট্রোল যে-কোনও ট্রাকের মতই, শুধু স্টিয়ারিং হুইল নেই। আছে দুটো লিভার, একেকটা ট্র্যাককে ব্রেক কষে স্নো-ক্যাটকে দিক পাল্টাতে সাহায্য করে।

দলনেতা হিসেবে সবার প্রথম ড্রাইভিঙের দায়িত্ব নিল স্যাম, মুরল্যান্ড তার পাশে রইল, দ্বিতীয় পালাটা নেবে। ওদের পিছনে চওড়া সীটে আরাম করে বসল রানা। এখান দিয়ে পিছনের অংশে যাওয়া যায়, তবে সেটা ওদের গিয়ার আর রেইডার স্লেডের কারণে ভর্তি হয়ে আছে।

'তাড়াতাড়ি হিটার ছাড়ুন,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমি এখনই জমে যাচ্ছি।'

চাবি ঘোরাতেই জ্বলে উঠল টার্বো-ডিজেল, গর্জে উঠল শক্তিশালী ইঞ্জিন। সামনে টয়োটার একজস্টে সাদা ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। বাইরে গুরুগম্ভীর আওয়াজ জানান দিল, বাকি তিনটে স্নো-ক্যাটও জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।

চলতে শুরু করল ল্যান্ড ক্রুজার, স্পাইক লাগানো টায়ার মাটি কামড়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে সামনে। ওটার টায়ার ট্র্যাক বাঁয়ে রেখে ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে স্যামও স্নো-ক্যাটকে আগে বাড়াল।

লিভারদুটো পরখ করে বলল, 'মনে হচ্ছে যেন ট্যাঙ্ক চালাচ্ছি।'

ভারি লোড টানার কারণে ঘণ্টায় মাত্র পনেরো মাইলে সীমাবদ্ধ রইল স্নো-ক্যাটগুলোর গতি। কেবিনের ভিতর আরামেই আছে যাত্রীরা, তবে যাত্রাটা এক ঘণ্টা পর একঘেঁয়ে হয়ে উঠল। চারপাশের দৃশ্যে কোনও বৈচিত্র্য নেই—এ যেন এক মরুভূমি, শুধু বালির বদলে বরফের রাজত্ব। চারপাশে বিছিয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল জুড়ে, একইভাবে। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে বিশাল প্রান্তর, চোখে গাঢ় সানগ্লাস না থাকলে প্রতিফলনটা দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দেয়।

টয়োটার রেখে যাওয়া ট্রেইল ধরে সার্কাসের খেলা দেখানো হাতির মত একসারিতে এগিয়ে চলল স্নো-ক্যাটগুলো। আবহাওয়া যতক্ষণ ভাল থাকল, ততক্ষণ ওটাকে অনুসরণ করতে তেমন অসুবিধে হলো না। তবে বেলা চড়তেই বাতাস বেড়ে গেল, মাটি থেকে উড়িয়ে আনছে তুষারকণা। এই দেখা যায় সবকিছু ঠিকঠাক, স্বাভাবিক; ঠিক পরের মুহূর্তেই হারিয়ে যাচ্ছে চারপাশ, ভিজিবিলিটি নেমে আসছে শূন্যতে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাইরে প্রবল হয়ে উঠল তুষারঝড়, বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন কানে তালা লাগিয়ে দিল।

'জিসাস! এটা কি স্বাভাবিক?' চেঁচিয়ে বলল স্যাম।

'এ কিছুই না,' হাসল রানা। 'আরও খারাপ ঝড় হয় এখানে।'

ড্যাশবোর্ডের রেডিও খড়খড় করে উঠল। 'আপনারা ঠিক আছেন তো?' মুয়েলারের গলা, সবার খোঁজখবর নিচ্ছে। 'মি. বোরোশিন বলছেন, দু'এক মিনিটের মধ্যে থেমে যাবে ঝড়। আবার দু'তিনদিন থেকে যাওয়াও বিচিত্র নয়।'

মাউথপিসটা তুলে মুরল্যান্ড বলল, 'আমরা প্রার্থনা করছি যাতে প্রথমটা ঘটে।'

রেডিওতে নতুন কণ্ঠ শোনা গেল। 'দেজান জুরকিচ বলছি। আমি সবার পিছনের স্নো-ক্যাটে আছি। থামতে বাধ্য হয়েছি

আমরা। তবে বাতাস কমে এসেছে এদিকে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হতে পারব বলে আশা রাখি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যি সত্যি বিনা নোটিশে থেমে গেল ঝড়। দেখে বোঝারই উপায় নেই খানিক আগে কী তাণ্ডব চলছিল এখানে। আবার চলতে শুরু করল কনভয়।

দুপুরে লাঞ্চের জন্য সামান্য বিরতি নেয়া হলো। শুকনো খাবার দিয়ে পেট ভরাল সবাই। তারপর আবার যাত্রা। মুরল্যান্ড ড্রাইভ করছে। এবার রাস্তা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। মাটিতে হাজারো ফাটল, জমিন একেবারে রুক্ষ, বন্ধুর; একেকটা ঝাঁকিতে দম বন্ধ হয়ে এল সবার। ঘণ্টায় দশ মাইলের বেশি এগোনো যাচ্ছে না।

দু'ঘণ্টা পর আবার রেডিওতে শোনা গেল মুয়েলারের গলা। 'সুসংবাদ, প্রিয় বন্ধুরা! নিজোর্ডের সঙ্গে এইমাত্র কথা হলো আমার। উপকূলের যে অংশ ক্যাম্প ডিকেড থেকে সবচেয়ে কাছে, সেখানে পৌঁছে গেছে ওরা। হেলিকপ্টারে করে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল নিয়ে অ্যাডভান্স টিমও রওনা হয়ে গেছে। আজ রাতের মধ্যে যদি সাইটে পৌঁছুতে পারি, তা হলে গরম বিছানা আর তাজা খাবার পাবো।'

'স্পীড বাড়ান, স্পীড বাড়ান!' মাউসপিসে মুখ ঠেকিয়ে তাড়া লাগাল মুরল্যান্ড। 'এই ঠাণ্ডায় স্নো-ক্যাটের ভিতর রাত কাটাতে একদমই রাজি নই আমি।'

ছ'টায় ভোটাভুটি হলো ডিনারের ব্যাপারে। দেখা গেল কেউই থামতে রাজি নয়, তাতে ক্যাম্প সাইটে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে। অগত্যা চলন্ত গাড়িতে শুকনো খাবার দিয়ে সারতে হলো ডিনার।

ড্রাইভিং সীটে এখন রানা। আলাপ করার সুবিধার্থে পাশেই গাদাগাদি করে বসেছে মুরল্যান্ড আর স্যাম। দিগন্তে ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় বরফ লালচে বর্ণ ধারণ করেছে। এখানে-সেখানে ধীরে ধীরে করাল থাবা বসাচ্ছে আঁধার। এক সময় ডুবে গেল

সূর্য, তারপরও পশ্চিমাকাশে আলো রইল অনেকক্ষণ। একসময় চাঁদ দেখা দিল, স্বচ্ছ বরফে তার প্রতিফলন নতুন আলো ছড়াতে থাকল। আধ মাইল সামনে থাকা ল্যান্ড ক্রুজারটা আর দেখা যাচ্ছে না এখন। শুধু ফানেলের আকারে ওটার হেডলাইট থেকে ছড়িয়ে পড়া আলোই অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। এই মহানৈঃশব্দ্যের দেশে কনভয়ের চলার আওয়াজ আপার্থিব গুঞ্জন তুলছে। ড্যাশবোর্ডে লাগানো থার্মোমিটারে দেখা গেল, তাপমাত্রা এখন মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

'জিপিএস অনুসারে আমরা ক্যাম্প থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে আছি,' ঘণ্টাখানেক পরে জানাল মুয়েলার। 'সময় অবশ্য একটু বেশি লাগতে পারে, সামনে সারফেসের অবস্থা বেশি সুবিধের নয়। সবাই সাবধানে থাকুন।'

আইসশীটের নীচে ঢাকা পড়া পাহাড়ি এলাকা এটা, যদ্দূর দৃষ্টি যায়, পুরোটাই উঁচু-নিচু। কনভয় এগোতে লাগল খুব ধীরে, সতর্ক হয়ে ড্রাইভ করছে সবাই। এই ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে তো খানিক পরেই আবার সজোরে নামতে হচ্ছে। এখানে-সেখানে মুখ ব্যাদান করে আছে বিরাট সব ফাটল। মাঝে মাঝেই থেমে পড়তে হচ্ছে স্নো-ক্যাটগুলোকে, সময়টা ব্যয় হচ্ছে ভাল রাস্তা খোঁজায়। বাকিদের দাঁড় করিয়ে ল্যান্ড ক্রুজার নিয়ে বরফ চষে বেড়াচ্ছে নুয়েনডর্ফ। প্রতিবারই বেশি সময় ব্যয় হচ্ছে যেন। বেসের এত কাছে এসে এই ফ্যাঁকড়া দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল যাত্রীরা, তবে খানিক পর পরই রেডিওতে কথা বলে সবাইকে চাঙা রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মুয়েলার।

এক সময়ে মাইক্রোফোন তুলে রাতের মত থামার প্রস্তাব করতে যাচ্ছিল রানা, ঠিক তখুনি শোনা গেল বোরোশিনের গলা। 'শেষ আইস ওয়ালটার ওপাশেই বেস ক্যাম্প! আমরা এইমাত্র দেখতে পেয়েছি! বন্ধুরা, তৈরি হোন। আমরা আসছি আপনাদের নিতে! আর পনেরো মিনিটের ভিতব গরম খাবার আর বিছানা

পাবেন সবাই।'

বরফ ছিটাতে ছিটাতে জিপটাকে ফিরতে দেখা গেল, হেডলাইটের আলোয় বরফ চমকাচ্ছে। নিজের আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে সঙ্কেত দিল রানা। উইন্ডশিল্ডের ওপাশে নুয়েনডর্ফের ক্লান্ত চেহারা দেখতে পেল ও, কাছে এসে ইউ-টার্ন নিল সে। এবার ল্যান্ড ক্রুজারকে অনুসরণ করল সবাই।

যাত্রার শেষাংশ অনেকটা ঘোরের মধ্যে কাটল, বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। রানাও শ্রান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। হুইলটা স্যামের হাতে তুলে দেয়া উচিত ছিল, কিন্তু অল্প সময়ের জন্য আর পালা বদলাতে ইচ্ছে করল না। মাথা ধরেছে ভীষণ, ক্লান্তিতে চোখও বুজে আসছে; তারপরও যুদ্ধ করে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে ও।

অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছুল কনভয়। বরফের মাঝে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র বিল্ডিংটা দেখতে পেল ওরা, অ্যাডভান্স টিম তৈরি করেছে। দেয়ালগুলো ইনসুলেটেড প্লাস্টিকের, মেইনফ্রেমটা প্রি-ফর্মড... বাচ্চার খেলনার মত জোড়া দিয়ে খাড়া করা। আজ রাতে এটাকেই বাঙ্কহাউস হিসেবে ব্যবহার করবে সবাই, তবে কাল থেকে মেস হল হবে এটা। আশপাশে অন্যান্য বিল্ডিঙের সরঞ্জামগুলোও জড়ো করে রেখেছে অ্যাডভান্স টিম। সব মিলিয়ে নয়টা বিল্ডিং। মেস হল ছাড়াও এর মধ্যে চারটে হবে ডরমিটরি—একেকটায় দশজন করে থাকবে, দুটো হবে রুম-টেম্পারেচার ল্যাব, আর দুটো স্টোর।

'মুয়েলারের ঘুম যেন খুব গাঢ় হয়,' বলল রানা।

বিস্মিত কণ্ঠে স্যাম জানতে চাইল, 'কেন?'

'কারণ ভিতরে ঢুকেই আমার ড্রিঙ্ক লাগবে। লোকটা যেন বাধা দিতে না পারে।'

'আমি তোমার দলে,' বলল মুরল্যান্ড। 'বুরবন নিয়ে এসেছি, স্যামের কাছেও এক বোতল স্কচ আছে।'

'চমৎকার!' হেসে বলল রানা।

•

সূর্য উঠল। সকালটা ঝরঝরে, পরিষ্কার। ব্রেকফাস্ট শেষে সবার হাতে কাজের তালিকা ধরিয়ে দিল মুয়েলার, সেইমত ব্যস্ত হয়ে পড়ল গোটা দল, ক্যাম্পটাকে দাঁড় করাতে শুরু করল। জিয়ো-রিসার্চের সবাই কালো স্নো-সুট পরেছে, পিঠে বড় করে প্রতিষ্ঠানের নাম আর সামনে বুকের ওপর নিজের নাম সোনালি হরফে লেখা। বোরোশিনের দল আর রানাদের পরনে অবশ্য সাধাসিধে আর্কটিক গিয়ার—আর্মি সারপ্লাস বিক্রেতার দোকান থেকে কেনা। অবশ্য একটা পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সবার মিল আছে—তা হলো ভারি মুনবুট, সবার পায়ে শোভা পাচ্ছে সেটা।

স্নো-ক্যাটগুলোকে চালিয়ে বড় একটা এলাকার বরফ সমান করা হলো, তারপর বৃত্তাকার একটা কাঠামো ধরে ভাগ ভাগ হয়ে বিল্ডিংগুলো ওরা দাঁড় করাতে শুরু করল, কেন্দ্রে রইল মেস হলটা। দেয়ালগুলো জায়গামত টেনে নিয়ে যাওয়া হলো, তারপর প্রথমে ইনসুলেটেড ফ্লোর বিছিয়ে সব জোড়া দিতে লাগল ওরা। দেয়াল দাঁড়িয়ে গেলে ওপরে বসানো হলো ছাদ, একটা স্নো-ক্যাটের ওপর লাগানো ক্রেন দিয়ে সারা হলো কাজটা। একেকটা বিল্ডিং তৈরি করতে তিন ঘণ্টার মত লাগছে।

শুরুতে মহা উদ্যমে কাজ করলেও ঠাণ্ডার অত্যাচারে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সবাই। তারপরও হাল ছাড়ল না কেউ। কাজ চালিয়ে গেল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কাজ শেষ হলো। এরপর সবাই ঢুকে পড়ল মেস হলে। রাতের খাওয়া শেষ করে ডরমিটরিতে চলে গেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে।

পরদিন ব্যয় হলো সমস্ত প্রভিশন স্টোর করা আর ল্যাবগুলোকে সেটআপ করতে। আগের দিনের চেয়ে কষ্ট কম হলো সবার, তা ছাড়া তাপমাত্রাও ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে একটু বেড়েছে। ঝিরঝির করে তুষার পড়ল অবশ্য সারাদিন, বাইরে

বেরুলে অল্প সময়েই গা ভিজে যায় একেবারে। একটা স্নো-ক্যাট দিয়ে হাঁটা চলার পথটা পরিষ্কার রাখল ওরা।

ডিনারে বসে সবাইকে ধন্যবাদ জানাল মুয়েলার, কাজ শেষ করার জন্য। একজন একজন করে নাম ধরে প্রশংসা করতেও ভুলল না। জানাল, হালকা কিছু কাজ বাকি আছে এখনও, আগামীদিন সকালে সেগুলো হয়ে গেলে সবাই যে যার রিসার্চে নেমে যেতে পারবে। নিজোর্ডে থাকা বিজ্ঞানীরাও পরদিন একটা স্কি লাগানো বিমানে করে এসে পৌঁছুবেন, কারও যদি বাড়তি কোনও জিনিসপত্র লাগে, তা যেন রাতের মধ্যেই জানিয়ে দেয়া হয়; বিমানে নিয়ে আসা হবে।

'ভাল কথা, ম্যাক্সিম, ডা. নোভাকের কাছ থেকে একটা মেসেজ এসেছে তোমার জন্য।' বিশালদেহী রাশিয়ানের হাতে একটা চিরকুট তুলে দিল মুয়েলার।

কাগজটা পড়ে হতাশার একটা ভঙ্গি করল বোরোশিন।

'খারাপ খবর নাকি?' সিঙ্কের পাশ থেকে জানতে চাইল রানা। অ্যাসিসটেন্ট কুক সিলভিয়াকে প্লেট ধুতে সাহায্য করছে ও।

'হুঁ। আমাদের ডাক্তার ভদ্রমহিলা আগামীকালের ফ্লাইটে আসছেন না। দুদিন পর রি-সাপ্লাইয়ের জন্য যে হেলিকপ্টারটা আসবে, সেটা ধরবেন।'

'হয়েছে কী ওঁর?'

'ঠিক জানি না। আমাকে শুধু অ্যাকসিডেন্টের কথা বলা হয়েছে।'

'কনস্ট্রাকশনের কাজ ফাঁকি দেয়ায় আমি তাকে দোষ দিতে পারছি না,' হাসল মুরল্যান্ড। 'পারলে আমিও দিতাম।'

'ডা. নোভাক কাজকে ভয় পান বলে মনে হয় না,' বোরোশিন গম্ভীর গলায় বলল। 'যদিও সামনাসামনি দেখিনি, তারপরও ওঁর রেফারেন্স ছিল তাক লাগিয়ে দেয়ার মত। চারটে মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে উঠেছেন ভদ্রমহিলা... এর মধ্যে ভিনসন

ম্যাসিফ, অ্যান্টার্কটিকার হায়েস্ট পয়েন্টও আছে। এভারেস্টও আরেকটু হলে জয় করে ফেলেছিলেন প্রায়। এখন মিউনিখের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে কাজ করেন তিনি, সার্ভাইভার্স স্ট্রেসের ওপর কয়েকটা প্রবন্ধও লিখেছেন। আমি যত জায়গায় খোঁজ নিয়েছি, সবাই তাঁর শুধু প্রশংসাই করেছে।'

'শুনে তো ইম্প্রেসিভই মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

'ইম্প্রেসিভ? হাহ্!' হাসল বোরোশিন। 'অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে কয়েকটা ছবি পাঠিয়েছিলেন। কী আর বলব? শুধু আসতে দিন, মুণ্ডু যদি না ঘুরে গেছে তো আমার নাম পাল্টে ফেলব।'

'এতই সুন্দরী?'

'*দ্রশকা পেত্রভকা নাভারুচি*।'

'মানে কী এর?' বোকা বোকা কণ্ঠে জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'এমন কিছু, যেটা সোজা ভাষায় বলাটা ঠিক হবে না,' মুখে দুষ্টামির হাসি ফুটল বোরোশিনের।

এগারো

স্লেডটার ওজন দু'শো পাউন্ডের কাছাকাছি, ডিজাইন করা হয়েছে গাড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার জন্য। তৃতীয় দিন সকালে রানারা যখন সার্চ শুরু করল, প্রথমে ল্যান্ড ক্রুজার দিয়েই ওটাকে টানার চেষ্টা করল ওরা। তবে এবড়ো-থেবড়ো সারফেসের কারণে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে হলো। অসম্ভব ভারি গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেইডার ইউনিট টানার

কাজটা এখন মানুষের ঘাড়ে। সার্চ গ্রিড ঢালু একটা জমিতে হওয়ায় কাজটা কয়েকগুণ কঠিন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ওপরদিকে ঠেলে তোলার সময় জান বেরিয়ে যাচ্ছে সবার। এই মুহূর্তে একটা কথা ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ওরা—ভাগ্যিস সার্চ এরিয়াটা আরও বড় নয়!

জিয়ো-রিসার্চের বেস মাত্র সিকি মাইল দূরে। ওই পাহাড়টার তলাতেই আছে ক্যাম্প ডিকেড। ঢালে সরলরেখা ধরে রেইডার চালাচ্ছে ওরা, চতুর্থ রেখাতে এসেই পেয়ে গেছে ক্যাম্পটার একটা কোণা। তবে খুশি হবার কিছু নেই এতে। সবচেয়ে কঠিন কাজটাই বাকি এখনও। রেইডার ইমেজ দেখে ভূ-গর্ভস্থ বিল্ডিঙটার ম্যাপিং করতে হচ্ছে ওদের, শুধু তা হলেই এন্ট্র্যান্সের খোঁজ পাওয়া যাবে। এরপর বরফ খোঁড়া তো রয়েছেই।

কমপ্লেক্সটা ইংরেজি "এইচ" শেপের আকারে লুকিয়ে আছে পাহাড়ের ভিতর। একটা বাহুতে রয়েছে স্টোরেজ এরিয়া আর বিশাল একটা গ্যারাজ—যাতে ঢোকার জন্য সারফেস থেকে একটা র‍্যাম্প থাকার কথা। অন্য বাহুটায় রয়েছে অ্যাকোমোডেশন আর ল্যাবরেটরি। এ দুটোকে যুক্ত করা মাঝখানের অংশটা ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইং। গ্যারাজ থেকে একটা টানেলের মাধ্যমে আরও গভীরে যাওয়া যায়, সেখানে কমপ্লেক্সের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য একটা আনবিক রিঅ্যাক্টর ছিল। সেটা অবশ্য ক্যাম্প বন্ধ করার সময় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ইউএস এয়ারফোর্স এই গ্যারান্টিও দিয়েছে, ওখানে কখনও রেডিয়েশন লিকেজের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তারপরেও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। রোজালিন গুডজনসেনের সঙ্গে কথা হবার পর ও চলে গিয়েছিল রেইক্‌ইয়াভিকের জিয়োলজিক্যাল মিউজিয়ামে, সেখানে এক পুরনো বন্ধু কাজ করে। তার কাছ থেকে ধার করে একটা গাইগার কাউন্টার নিয়ে এসেছে, রেডিয়েশন মাপার জন্য।

এই মুহূর্তে রেইডারের সঙ্গে বাঁধা আছে ওটা, অন করা অবস্থায়। মনিটরে পঁয়ত্রিশ ফুট নীচের কালো ছায়া দেখার পাশাপাশি কাউন্টারেও নজর রাখছে ও, তবে উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু দেখতে পাচ্ছে না—সবই স্বাভাবিক। এক জায়গায় এসে অবশ্য কাঁটা সামান্য লাফিয়ে উঠল, তবে রানার ধারণা ওই বরাবর নীচে রিঅ্যাক্টরটা বসানো ছিল বলেই কাঁটার এই চঞ্চলতা।

মুরল্যান্ডকে সব খুলে বলেছে ও, তবে স্যাম এখনও অন্ধকারে। এলমার গুডজনসেনের কথা বলে তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায়নি রানা। এই কারণে গাইগার কাউন্টারটা দেখে তেমন অবাক হয়নি স্যাম, ভেবেছে এটা রুটিন সর্তকতা। এখন পর্যন্ত রেডিয়েশনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যাবে বলে মনেও হচ্ছে না।

দুপুর বেলা রেইডার থেকে সমস্ত ডেটা একটা ল্যাপটপ কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নিল রানা। সেখান থেকে ক্যাম্প ডিকেডের একটা ডিজিটাল স্ট্রাকচার তৈরি করল। রেজোল্যুশন তেমন ভাল না আসলেও প্রচুর ডিটেইল পাওয়া গেল ওখান থেকে। ওটা দেখে দুশ্চিন্তামুক্ত হলো ওরা, কারণ ভিতরটা ফাঁকা, কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে বরফ ঢুকে ভাসিয়ে ফেলেনি। পার্টিশন আর বেশিরভাগ ফার্নিচারও অক্ষত আছে দেখা গেল।

'আপাতত ফেরা যাক,' বলল স্যাম। 'বেসে গিয়ে এটার সঙ্গে কমপ্লেক্সের অরিজিন্যাল ড্রয়িং মিলিয়ে দেখি। তা হলে বোঝা যাবে, কোথায় কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'

একমত হলো সবাই, লাঞ্চেরও সময় হয়ে এসেছে। বেসে ফিরে মেস হলে গিয়ে দেখল, সেটা কানায় কানায় ভরা। এখনও পুরো টিম আসেনি, তাতেই এ অবস্থা; সবাই এলে কী হবে, আল্লাহই জানে। জায়গা খালি না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ওরা, তারপর খাওয়াদাওয়া সারল। টেবিল সম্পূর্ণ খালি হবার পর কম্পিউটারটা অন করল। ক্যাম্প ডিকেডের মূল নকশা স্ক্যান করে

আনা হয়েছে অ্যামেরিকা থেকেই, এবার রেইডার ইমেজের সঙ্গে ওটা মেলাতে শুরু করল। দেখা গেল, ওরা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ম্যাপিং করতে পেরেছে, অনেকটা এলাকা বাকি আছে এখনও। অবশ্য কাঠামোগত তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি দেখা যাচ্ছে না। ওদের ফাইন্ডিংসের সঙ্গে মিলিয়ে ক্যাম্পের জিপিএস কো-অর্ডিনেট বের করে ফেলল মুরল্যান্ড।

রেডার ইমেজের এক জায়গায় আঙুল রেখে রানা বলল, 'এখানেই আমাদের মেইন এন্ট্র্যান্স।'

'আপনি শিয়োর?' স্যামের গলায় সন্দেহ।

'অবশ্যই। আপনার কি ধারণা, আমি দুবার বরফ খোঁড়ার ঝুঁকি নেব?'

'তা তো নয়ই,' স্যাম হাসল। 'তা হলে কী করতে চান?'

'যদি রাজি থাকেন তো খোঁড়াখুঁড়িটা শুরু করে দিতে পারি।'

'গুড। আমার কোনও আপত্তি নেই,' স্যাম রাজি। 'এক কাজ করুন, গিয়ে এন্ট্রান্সের জায়গাটা মার্ক করে ফেলুন। ববি, আপনি একটা স্নো-ক্যাটে করে সমস্ত ডিগিং ইকুইপমেন্ট আর কেমিক্যাল নিয়ে যান ওখানে। আমি মুয়েলারকে বলছি একজন লোক দিতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা আর মুরল্যান্ড।

এই সময় মেস হলে ঢুকল বোরোশিন আর জুরকিচ। দুজনেই বরফ মেখে কিম্ভুতকিমাকার হয়ে গেছে। 'আপনাদের কাজ কেমন চলছে?' জানতে চাইল রাশিয়ান।

'ওরেব্বাপ! ইয়েতি...ইয়েতি!' কপট আতঙ্ক মুরল্যান্ডের চেহারায়।

হেসে উঠল সবাই। বোরোশিন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'খেয়ে ফেলব একেবারে!' সে-ও কৌতুক করছে।

হাসি থামিয়ে রানা বলল, 'আমরা এন্ট্র্যান্সটা লোকেট করে ফেলেছি, ম্যাক্সিম। এখুনি খোঁড়ার কাজ শুরু করব।'

'এত তাড়াতাড়ি!' জুরকিচের গলায় বিস্ময়। 'আপনারা দেখছি ভারি করিৎকর্মা লোক।'

'কেন, আপনাদের কী হয়েছে?' রানা ভুরু নাচাল। 'এখনও উল্কাপিণ্ড পাননি?'

'কী যে বলেন!' বোরোশিন ঠোঁট উল্টাল। 'পুরো অভিযানে যদি দুয়েকটাও পাই, সেটাই বিরাট সাফল্য ধরতে হবে।'

'আর জিয়ো-রিসার্চের কী খবর? ওদের কাজ কদ্দূর?'

'সারা সকাল তো দেখলাম একটা ড্রিল টাওয়ার বসানোর চেষ্টা করছে। যন্ত্রপাতিই ঠিক হয়নি, কাজ করবে কী?'

'তারমানে ওরা কিছু শুরুই করেনি?'

'নাহ্। জার্মানরা খুব কাজের হয় শুনেছিলাম, এদের দেখে ধারণা পাল্টে যাচ্ছে।'

'আপনার কাজ কদ্দূর, দেজান?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'আবহাওয়ার কোনও পূর্বাভাস দিতে পারেন?'

'বলা খুব কঠিন,' ওভারকোট খুলতে খুলতে জানাল জুরকিচ। 'তবে এটুকু বলতে পারি, আগামী কয়েকদিন স্যাটেলাইট ফোন আর রেডিওর রেঞ্জ খুব কমে যাবে।'

'সোলার ম্যাক্সের জন্য?'

জুরকিচ মাথা ঝাঁকাল। 'পর্বটা সবে শুরু হচ্ছে। চার-পাঁচদিন পর নিজোর্ডের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাসালিক, থিড়ুলি বা অন্য কোথাও তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'দেজানের ধারণা, এদিকের অরবিটে যেসব স্যাটেলাইট আছে, সেগুলোর কোনওটাই কাজ করবে না।' বলল বোরোশিন।

স্যাম উঠে দাঁড়াল। 'তা হলে এখুনি বাবার সঙ্গে কথা বলে ফেলি। আমরা যে এখানে পৌঁছেছি, সেটাই জানানো হয়নি এখনও।'

রানা আর মুরল্যান্ডও উঠল। যার যার গিয়ার পরে নিল ওরা, বেরিয়ে এল বাইরে। বাতাসের ধাক্কায় মাটি থেকে তুষারকণা

উড়ে কুয়াশার মত সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য দৃষ্টিসীমা এখনও শূন্যে নামেনি, নামলেও অসুবিধে নেই। পুরো বেস জুড়ে কোমর সমান উচ্চতায় বাঁধা আছে দড়ি, ধরে ধরে এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিঙে যাওয়া যায়। মুরল্যান্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাম্প ডিকেডের দিকে রওনা হলো রানা।

জায়গামত পৌঁছে শাফট খোঁড়ার জন্য স্পট ঠিক করল ও। বরফ পরখ করে বুঝল, স্নো-ক্যাটের প্লাউ দিয়ে প্রাথমিক ট্রেঞ্চটা খুঁড়তে কষ্ট হবে না। বাকিদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল ও।

একটু পরেই স্নো-ক্যাট নিয়ে হাজির হয়ে গেল স্যাম আর মুরল্যান্ড। সঙ্গে জিয়ো-রিসার্চের এক অল্পবয়েসী ওয়ার্কারকে নিয়ে এসেছে, তার নাম ক্লাউস জিগলার। পরিকল্পনাটা সবাইকে বুঝিয়ে দিল রানা। তারপর স্নো-ক্যাট ব্যবহার করে ধীরে ধীরে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে শুরু করল, একেক খোঁচায় ছ'ইঞ্চি বরফ তুলে আনছে।

মোটামুটি সাত ফুট যাবার পর শক্ত বরফ দেখে কাজ থামাল রানা। একটা বেলচা নিয়ে ট্রেঞ্চের দেয়াল পরীক্ষা করল। নাহ্, হঠাৎ ধসে পড়ার ভয় নেই। প্লাস্টিক শীট বিছিয়ে দেয়ালগুলো ঢেকে দিল ওরা, বাড়তি সতর্কতা হিসেব কিছু সাপোর্ট বিমও লাগাল। এরপর শুরু হলো কেমিক্যালের কাজ। পাম্পটা ট্রেঞ্চের বাইরে বসানো হলো প্রথমে, তারপর স্নো-ক্যাটের ক্রেন দিয়ে নামিয়ে দেয়া হলো কেমিক্যালের প্রথম ড্রামটা। রানা আর মুরল্যান্ড ট্রেঞ্চের তলায় সেগুলো আস্তে আস্তে ঢালতে থাকল। বরফ গলে ধীরে ধীরে পানি হয়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকে পাম্প চালিয়ে সেটা সেঁচে ফেলতে থাকল স্যাম আর জিগলার।

বিকেলের একটা সময় বিমানের আওয়াজ পেল ওরা। চোখ তুলতেই পুরনো একটা ডগলাস ডিসি-থ্রি কার্গো এয়ারক্র্যাফট দেখতে পেল, তলায় চাকার বদলে স্কি লাগানো, বেস ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। মুয়েলারের লোকজন ইতোমধ্যেই ক্যাম্পের পাশে একটা জায়গায় অবশিষ্ট তিনটে স্নো-ক্যাট দিয়ে বরফ সমান করে

এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছে, খানিক পরে সেখানে ল্যান্ড করল বিমানটা। পিছনের কার্গো ডোর খুলে গেল, টপাটপ নামল যাত্রীরা, সবাই জিয়ো-রিসার্চের কালো স্নো-সুট পরে আছে। লোকগুলোর চলাফেরায় সুশৃঙ্খল ভাব দেখে একটু বিস্মিত হলো রানা, যেন বিজ্ঞানী না হয়ে এরা সবাই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষিত সৈনিক হলেই বেশি মানাত।

বিমান থেকে কার্গোও নামছে। নানা আকারের কাঠের বাক্স আর ক্রেট। স্নো-ক্যাটগুলো তৈরিই ছিল, ঝটপট প্লেনের পিছনে চলে গেল সেগুলো, তারচেয়েও দ্রুত ট্রেলারে সমস্ত মালামাল তুলে ফেলা হলো। স্নো-ক্যাটগুলো সরে যেতেই আবার উড়াল দিল বিমানটা। সব মিলিয়ে দশ মিনিটের বেশি লাগেনি আনলোডিঙে।

'দেখলে ব্যাপারটা?' বলল মুরল্যান্ড। 'একটা ড্রিল রিগ বসাতে পারে না, অথচ বিমানটা কত তাড়াতাড়ি খালি করে ফেলল! বন্দরের শ্রমিক হলেই শাইন করত, এখানে গবেষণা করতে এসেছে কোন দুঃখে?'

হাসল রানা। 'ওটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? তারচেয়ে বরং খুশি হও এই ভেবে যে, তাড়াতাড়ি আনলোড করে ওরা কত ভাল কাজই না করেছে! আজ ডিনারে নির্ঘাত তাজা সবজি পাওয়া যাবে!'

মুখে এ কথা বলছে বটে, কিন্তু মনে মনে চিন্তিত ও। এইমাত্র যা দেখল, তাতে কোথায় যেন গড়বড় আছে। তবে সেটা ঠিক কোথায়, ধরতে পারছে না। ব্যাপারটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না ও, হঠাৎ নতুন একটা গুরুগম্ভীর শব্দ শুনে সচকিত হলো। উৎসের দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল সবাই। দূরে একটা পাহাড়ের গা থেকে বরফধস নামছে।

দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য। লাখ লাখ টন বরফ ধোঁয়ার মেঘ তুলে নেমে আসছে ঢাল ধরে. প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে বিস্তার। পথে

কোনও বাধা মানছে না, পাহাড়ের উঁচুনিচু শরীরকে ঢেকে দিচ্ছে প্রবল আক্রোশে, গতি বাড়ছে ক্রমশ।

'ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক?' কোনওমতে জিজ্ঞেস করল স্যাম।

রানা তাকাল তার দিকে। 'স্বাভাবিক, তবে নিজের চোখে দেখতে পাব ভাবিনি। কাল রাতে দেজান বলছিলেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের কারণে আর্কটিক এলাকার বরফ দিন দিন কমছে। আগের মত ঘন ঘন বরফধস নামে না। এমনকী আইসবার্গের আকারও নাকি আজকাল ছোট হয়ে গেছে।'

ব্যাগ থেকে ভিডিও ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে শুরু করল স্যাম, ওটায় টেলিফটো লেন্স লাগানো আছে। শেষ পর্যন্ত রেকর্ড করল সে—বরফধসটা সমতলে পৌঁছানো পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সেটা, তুষারের একটা মেঘ কেবল ভেসে রয়েছে বাতাসে।

আবার কাজ শুরু করল ওরা। একটানা সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত চালিয়ে গেল। পনেরো ফুটের মত খোঁড়া হয়ে গেছে ততক্ষণে। যত নীচে যাচ্ছে ততই শক্ত হচ্ছে বরফ। ওপর থেকে ক্রমাগত চাপের কারণে প্রায় পাথরের মত কঠিন এখন। যথেষ্ট হয়েছে, কাজ থামানোর নির্দেশ দিল স্যাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সবাই ফিরে চলল বেসে।

পরদিন শেষ বিকেলে ক্যাম্প ডিকেডের এন্ট্র্যান্সে পৌঁছুল টানেল। কেমিক্যালগুলো দারুণ কার্যকর, পাম্পটাও চমৎকার কাজ দেখিয়েছে, পাঁচ ফুট ডায়ামিটারের গর্তটা থেকে পানি শুষে নিয়েছে অনবরত। তবে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে শাফটের দেয়াল প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ায় আর সাপোর্ট বিম স্থাপনে, যাতে ওটা ধসে না পড়ে। পালা করে রানা, মুরল্যান্ড আর জিগলার প্রায় পুরো দিনটাই কাটিয়েছে গর্তের তলায়। জমে থাকা পানির হাত থেকে বাঁচার জন্য রাবার বুট পরেছে ওরা। এতে পা

শুকনো থাকলেও ঠাণ্ডার অত্যাচার বেড়েছে, কিছুক্ষণ পর পরই ওপরে এসে পা গরম করে নিতে হয়েছে ওদের। স্যাম অবশ্য আরামেই ছিল, তার কাজ ছিল পাম্প চালানো।

শাফটটা এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে ক্যাম্পের এন্ট্র্যান্সের ঠিক এক ফুট সামনে থাকে একটা পাশ। একেবারে গায়ে লাগিয়ে করতে গেলে গলে যাওয়া পানি দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকে যেতে পারত বলে এই ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা। পাশে তাকিয়ে শাফটের দেয়ালের ওপাশে ক্যাম্প ডিকেডের মেইন ডোরের অবয়ব দেখতে পাচ্ছে রানা আর জিগলার, এ মুহূর্তে ওরা দুজন কাজ করছে তলায়।

'জেন্টেলমেন, পৌঁছে গেছি আমরা!' ঘোষণা করার সুরে বলল রানা।

'নামা যাবে এখন?' জানতে চাইল স্যাম।

'কেমিক্যালের আরেকটা প্রলেপ দিয়ে গর্তটা ক্যাম্পের ফ্লোর লেভেলের নীচে নিয়ে যেতে হবে, পানি যাতে ভিতরে না ঢোকে। তারপর ঢোকা যাবে ওখানে।'

'তা হলে আর দেরি কেন?' ওপর থেকে বলল মুরল্যান্ড। 'ক্রেনে একটা ড্রাম ঝুলিয়ে রেখেছি। ওটা নামিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কাছে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো।'

ওপরদিকে তাকিয়ে পঁয়ত্রিশ ফুট গভীর গর্তটার মুখের কাছে হটরক্সের ড্রামটা দেখতে পেল রানা, ধীরে ধীরে নেমে আসছে। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, একটা কুয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য অ্যাকসেস শাফটটা কুয়ার মতই—খাড়া এবং লম্বা। তা ছাড়া সারাক্ষণই প্লাস্টিক শীটের জোড়াগুলো ভেদ করে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে পানি, জায়গাটাকে কুয়া মনে না হওয়াই অস্বাভাবিক।

একদম মাথার কাছে এসে পড়েছে ড্রামটা, গ্লাভ পরা হাত দিয়ে তলাটা আঁকড়ে ধরল রানা আর জিগলার। চেঁচিয়ে বলল, 'ধরেছি! এবার লাইনে ঢিল দিতে পারো।'

কাজটা গতকাল থেকে এতবার করেছে যে এখন আর সচেতনভাবে মাথা খাটাতে হলো না, যন্ত্রের মত হাত চালাল রানা আর জিগলার—একজন পাম্পের পাইপ বসালো, অন্যজন ড্রামের মুখ খুলে নীল রঙের কেমিক্যালটা ঢালতে থাকল। জিনিসটা খুবই কাজের, ঢালতে না ঢালতেই পানি ফোটার মত শব্দ করে বরফ খেয়ে ফেলে। দেখতে দেখতে গর্তের গোড়ায় পানি জমে গেল, গভীরতা বাড়ছে দ্রুত। ওপরে পাম্পটা সরোষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নীল দ্রবণ। মিনিট পনেরো পর থামল বরফ গলা, পানিও পুরোটা টেনে ফেলেছে পাম্প।

গলায় ঝোলানো থার্মোস ফ্লাস্কটা খুলে গরম কফি খেয়ে নিল দুই খননকারী। মেরু অঞ্চল যতই ঠাণ্ডা হোক, এখানকার বাতাসে আর্দ্রতা নেই বললেই চলে। এ কারণে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দেয় খুব সহজে। পরিশ্রমের কাজ করতে গেলে খানিক পর পরই কিছু না কিছু লিকুইড খেতে হয়।

সঙ্গে ওয়াকিটকি নেই, মুখ মুছে রানা চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা রেডি! চেইন স'টা নামিয়ে দিন, দরজাটা খুলব এবার।'

'ক্যাম্পটা আমি খুললে কোনও আপত্তি আছে?' জানতে চাইল স্যাম।

জিভে কামড় দিল রানা, কাজটা ভুলই হতে যাচ্ছিল। স্যাম এ অভিযানের নেতা, তা ছাড়া এই বেসটা তার বাবার স্মৃতি বিজড়িত; এর ভিতর প্রথম পা দেয়ার অধিকারটা তারই। তাড়াতাড়ি বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমরা উঠে আসছি, তারপর আপনি নামুন।'

'একজন থাকুন নীচে। ভিডিও করতে হবে।'

'আপনি যান,' রানাকে বলল জিগলার। 'আমি থাকছি।'

আপত্তি করল না রানা, ক্লান্তি লাগছে খুব, বিশ্রাম পেলে মন্দ হয় না। খালি একটা ড্রাম কেটে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে এলিভেটর বানিয়েছে ওরা, সেটাতে চড়ে বসল। ক্রেন দিয়ে ওকে ওপরে

তুলে আনল মুরল্যান্ড, তারপর স্যামকে নামিয়ে দিল।

হালকা বাতাস বইছে, অসম্ভব ঠাণ্ডা, হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে একেবারে। কাঁপতে কাঁপতে স্নো-ক্যাটের গায়ে হেলান দিতেই রানার হাতে একটা প্লাস্টিকের ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। পিঠ চাপড়ে বলল, 'গুড জব!'

'থ্যাঙ্কস্,' মুখ খুলে স্কচে চুমুক দিল রানা, তরল আগুন গলা বেয়ে নেমে গেল নীচে।

বরফ কাটতে শুরু করে দিয়েছে স্যাম, চেইন স-এর গর্জন শাফটের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে কয়েকগুণ বেশি তীব্রতা নিয়ে কাঁপাচ্ছে চারপাশ। কানে হাত দিয়ে মুরল্যান্ড বলল, 'কী বিশ্রী আওয়াজ! কতক্ষণ চলবে এই যন্ত্রণা?'

রানা বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যেই খোলা যাবে দরজা।'

সময় অবশ্য আরও বেশি লাগল—সতেরো মিনিট। স-এর শব্দ থেমে যেতেই নীচে উঁকি দিয়ে মুরল্যান্ড জানতে চাইল, 'কী... খোলা যাবে দরজাটা?'

স্যাম জবাব দিল, 'হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করুন। আমরা দরজার ওপরের লেখাটার ভিডিও করছি।'

'কী লেখা ওখানে?'

'*ক্যাম্প ডিকেড, ইউনাইটেড স্টেটস্ এয়ার ফোর্স*। তলায় দুষ্টামি করে কেউ লিখেছে—*এখানে ঢুকতে চাইলে সভ্যজগতে ফেরার কথা ভুলে যাও*।'

'হুঁ, ব্যাটা ভালই রসিক ছিল!' মুরল্যান্ড হাসল।

'আউটার ডোরটা খুলে ডাকব আপনাদের। ততক্ষণ বিশ্রাম নিন।'

'ঠিক আছে।'

নীচে মৃদু কথোপকথন শোনা গেল, সম্ভবত স্যাম ভিডিও শুরু করবার আগে বক্তৃতা দিচ্ছে। খানিক পরেই ধাতব আওয়াজ... অভ্যাস নেই, অর্ধশতাব্দীর বেশি পেরিয়ে যাওয়ায় নড়তে নারাজ

দরজার পাল্লা, সশব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে যেন। কিন্তু স্যাম আর জিগলারও হার মানার পাত্র নয়, ঠেলেই চলেছে।

'ঢুকেছি আমরা!' হঠাৎ স্যামের উৎফুল্ল কণ্ঠ ভেসে এল।

'কী দেখছেন?' উত্তেজনায় গর্তের কিনারায় ঝুঁকে পড়েছে রানা, পাশাপাশি মুরল্যান্ডও।

'চওড়া একটা করিডর,' জানাল স্যাম। 'অনেকটা চেম্বারের মত, দশ ফুট সামনে আরেকটা দরজা আছে। দেয়াল মজবুতই আছে মনে হয়, দু-এক জায়গায় তুবড়ে গেছে অবশ্য, তবে সেটা সিরিয়াস কিছু নয়।'

'মেঝে?'

'সামান্য উঁচুনিচু, বরফও জমেছে কয়েক জায়গায়। তবে কাঠ পচেনি।'

মুরল্যান্ডের আর তর সইছে না। 'আমরা আসব নীচে?'

'হ্যাঁ, আসুন। জিগলার ওপরে যাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইট আনতে ভুলবেন না।'

তরুণ জার্মান ওয়ার্কার সারফেসে পৌঁছুতেই তড়িঘড়ি করে নীচে নামল রানা আর মুরল্যান্ড। অ্যাকসেস চেম্বারটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, শক্তিশালী মেগালাইট নিয়ে এসেছে ওরা, জ্বালল সেগুলো। এবার পরিষ্কার দেখা গেল ভিতরটা।

কোট ঝোলানোর জন্য সারি বেঁধে কাঠের হুক লাগানো আছে দুপাশের দেয়ালে, মেঝেতে আছে লোহার পাপোশ—বাইরে থেকে ফেরার পর বুট থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলার জন্য। চেম্বারটা সম্ভবত গ্লেসিয়ারে যাওয়া এবং আসার জন্য স্টেজিং এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হতো। একপাশের দেয়ালে সতর্কবাণীও আছে: বাইরে বেরুনোর আগে দেখে নিন, মোজা শুকনো আছে কি না।

বোঝা যাচ্ছে, চেম্বারের অপর প্রান্তের দরজাটা দিয়ে মূল কমপ্লেক্সে ঢোকা যাবে। মুরল্যান্ড বলল, 'কী স্যাম, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? খুলুন দরজাটা!'

'এক মিনিট,' বলে নিজের দলের দিকে ফিরল স্যাম, মিনিক্যামটা অফ করে দিয়েছে। 'অদ্ভুত ব্যাপার, বুঝেছেন? এখানে আসার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আমার। বাবা জোরাজুরি করায় খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু এখন... বেসে ঢোকার মুহূর্তে মনে হচ্ছে, কাজটা ভুল করিনি। না এলেই বরং ভুল হতো।' আবেগে গলা ভারি হয়ে এসেছে তার। 'রানা, ববি, আপনাদের আমি ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে পারব না। তবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। কারণ আপনারা না থাকলে এখনও বেলচা দিয়ে ওপরে বরফ খুঁড়তাম আমি।'

'থাক, থাক,' অপ্রস্তুত হয়ে বলল রানা। 'নিজেকে এত ছোট করে দেখবেন না। আপনি রাজি না থাকলে আমাদেরই কি আসা হতো এখানে?'

'খুলুন, খুলুন,' তাড়া দিল মুরল্যান্ড। 'দেরি করবেন না।'

দ্বিতীয় দরজাটা খুলতে কোনও বেগই পেতে হলো না, যেন গতকালই কবজায় তেল দেয়া হয়েছে। ভিতরে পা রাখল ওরা, এখানে অন্ধকার আরও গভীর। শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলেও শেষ অবধি দেখা যাচ্ছে না। যতটা আলোকিত করছে, তার বাইরেটা থাবা দিয়ে রেখেছে নিকষ কালো আঁধার। স্যামের ক্যামকর্ডারের ওপরে একটা লাইট আছে বটে, তবে সেটা কতখানি ছবি তুলতে পারছে সন্দেহ। শুধু অন্ধকারটাই সব নয়, এখানে রাজত্ব করছে আশ্চর্য এক কবরের নিস্তব্ধতা। মেঝেতে বরফের হালকা আস্তর আছে, তাতে পা ফেলার মচমচ শব্দ বড্ড বেশি কানে বাজছে।

ঘোরের মধ্যে রয়েছে সবাই। শরীরের কাঁপুনিটা শুধু ঠাণ্ডার জন্যই নয়, উত্তেজনাও আরেকটা কারণ। গাঢ় অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্যের জন্য পরিবেশটাই ভৌতিক লাগছে। সবকিছু কেমন অবাস্তব, যেন টাইম মেশিনে করে অতীতে চলে এসেছে ওরা। সময়ের তেমন কোনও প্রভাব দেখা যাচ্ছে না ক্যাম্পের

অভ্যন্তরে। মনে হচ্ছে যে কোনও মুহূর্তে আঁধার থেকে উদয় হবে কোনও মূর্তি, ধমক দিয়ে জানতে চাইবে ওরা কী করছে এখানে। জায়গাটা সত্যিই ভুতুড়ে।

সদর দরজাটা পড়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইঙের মাঝামাঝি, মানে "এইচ"-এর মাঝখানের বাহুটাতে। করিডরটার দু'দিকে ইংরেজি "টি" আকারের জাংশান দেখা গেল। ম্যাপ অনুযায়ী বাঁয়ে গেলে গ্যারাজ আর স্টোরেজ পাওয়া যাবে, ওখান দিয়ে রিঅ্যাক্টর রুমেও যাবার পথ আছে। আর ডানদিকে হলো ডরমিটরি আর ল্যাব।

ভোটাভুটির প্রয়োজন হলো না, নিজ থেকেই ডানে ঘুরল তিনজন। হাঁটতে হাঁটতে আলো ফেলে চারপাশটা দেখল ওরা। দেয়ালগুলো প্লাইউডের, পিছনে ইনসুলেশন আর করোগেটেড মেটাল লাগানো। কয়েক জায়গায় ফেটে গেছে দেয়াল, ফাটল দিয়ে তুষার এসে জমা হয়েছে মেঝেতে। ছাদেও কয়েক জায়গায় চিড় ধরেছে, সেখানেও একই অবস্থা। পুরো হলওয়ে জুড়েই এখানে-সেখানে জমাট বেঁধে বরফের পিণ্ড হয়ে আছে এসব তুষার, রাস্তা প্রায় আটকেই দিয়েছে। ছোটগুলো নিয়ে তেমন সমস্যা হলো না, তবে এক জায়গায় গিয়ে দেখা গেল বিশাল এক বরফের চাঁই প্রায় পুরো হলওয়েই ঢেকে ফেলেছে। ওপরে ছাদের কাছাকাছি সামান্য একটু ফাঁকা আছে শুধু, সেখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পার হলো ওরা, এরপর নিরাপদেই পৌঁছে গেল বেসের একটা বাহুতে।

প্রথমদিকে সবই অফিস, আসার পথে দরজা খুলে খুলে ভিতরে দেখে এসেছে ওরা। প্রচুর জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে—পুরনো আমলের ম্যানুয়াল টাইপরাইটার, মেকানিক্যাল মিমিয়োগ্রাফ মেশিন... ফার্নিচার তো একটাও সরানো হয়েনি।

'কী ভয়ানক অপচয়!' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

স্যাম হাসল। 'এ হলো ফাইন্যানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট। এসব

জিনিস ফিরিয়ে নিতে যা ব্যয় হতো, তা দিয়ে নতুনই কেনা যেত বলে ফেলে রেখে গেছে। বাবার কাছে শুনেছি, ক্যাম্প খালি করার সময় শুধু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, রিঅ্যাক্টর আর গ্যারাজে রাখা পাঁচটা স্নো-ক্যাট সরানো হয়েছিল।'

ডরমিটরির দিকে এগিয়ে চলল ওরা। প্যাসেজের দুপাশে আটটা রুম, একেকটা ত্রিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট, সারি ধরে ডবল বাঙ্ক বিছানো। সৈনিকরা থাকত এখানে। তারাও প্রচুর জিনিসপত্র ফেলে গেছে, ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে সে আমলের কয়েকটা পিনআপ ম্যাগাজিন পেয়ে গেল মুরল্যান্ড, রানাকে দেখিয়ে হাসাহাসি করল। স্থূলকায় মহিলাদের ছবিতে ভর্তি ওগুলো, একপ্রস্থ সুইমসুট সবার পরনে। নামেই পিনআপ, আজকাল এসব মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশি শরীর দেখা যায় সাধারণ একটা ককটেল ড্রেসে।

ডরমিটরির পর একটা মেস হল পেরিয়ে এল ওরা, তারপর রিক্রিয়েশন রুম—ওখানে কয়েকটা পুল টেবিল রয়েছে, আরও আছে তাস খেলার বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা। প্যাসেজের শেষপ্রান্তে বিশাল একটা টালি বসানো কমন বাথরুম পাওয়া গেল, অনায়াসে শ'খানেক লোকের চাহিদা মেটাতে পারবে।

মুরল্যান্ড বলল, 'এদিকটা মনে হয় সম্পূর্ণই সৈনিকদের লিভিং এরিয়া। অফিসাররা অন্যদিকে থাকত।'

'ঠিকই বলেছেন,' স্যাম একমত হলো। 'এই উইঙে এসে বাঁয়ে ঘুরেছি আমরা। ডানে গেলে অফিসারদের লিভিং কোয়ার্টার পাব। বাবা ওদিকেই থাকতেন... বারো নম্বর কেবিনে।'

উল্টোপথ ধরে এগোল ওরা। অর্ধেকটা পেরিয়ে আসতেই সাইনবোর্ড দেখা গেল: *'অফিসার্স ওনলি।'*

'এদিকেই,' স্যামের গলায় উল্লাস। আগে আগে ছুটছে সে, পিতার পুরনো আবাস দেখার আগ্রহটা চেপে রাখতে পারছে না।

রানা অবশ্য সাবধানী মানুষ, এগোচ্ছে খুব সাবধানে। আলো

ফেলে বারবার দেখে নিচ্ছে দেয়াল আর ছাদের অবস্থা, হঠাৎ করে বরফচাপা পড়তে চায় না। যত দরজা দেখছে, সবগুলোই খুলে ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

বারো নম্বর কেবিনের সামনে পৌঁছে গেছে স্যাম, উত্তেজিত ভঙ্গিতে ভিডিও করছে চারপাশের। রানা তখন দশ নম্বরে, দরজা খুলে ভিতরে আলো ফেলতেই চমকে উঠল ও, রীতিমত একটা ধাক্কা খেলো, শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের শীতল একটা স্রোত বয়ে যাওয়ার অনুভূতি পেল।

'দারুণ!' বারো নম্বরের দরজার হাতলে হাত রেখে খুশি খুশি গলায় মুরল্যান্ডকে বলছে স্যাম। 'ঠিক যেমন বাবা বর্ণনা করেছিল।'

বেরসিকের মত রানা বলল, 'বর্ণনায় কি একটা লাশের কথাও ছিল?'

'কী!'

'দেখে যান এদিকে।'

দশ নম্বর কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে আলো ফেলল রানা। বিছানার ওপর পড়ে আছে লাশটা, পরনে লেদার জ্যাকেট। মাংস শুকিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মমি হয়ে গেছে। বীভৎস চেহারা।

'মাই গড!' শিউরে উঠল স্যাম।

'কে এটা?' মুরল্যান্ডও হতভম্ব।

কাছে গিয়ে মৃতদেহটা ভাল করে দেখল রানা, জ্যাকেটে লাগানো এমব্রয়ডারি করা ডানা আর নামটা লক্ষ করল। তারপর থমথমে গলায় বলল, 'এ হচ্ছে মেজর রস কনওয়ে—ক্যাম্প ডিকেড বন্ধ হবার তিন মাস আগে ক্র্যাশ করা সি-নাইন্টি সেভেনের পাইলট!'

বারো

হ্যামবার্গ, জার্মানি।

সারা শরীর ঘেমে নেয়ে গেছে ইয়োহান শ্নাইডারের। চোয়াল লক্ষ্য করে একটা ঘুসি আসছে দেখে লাফ দিয়ে সরে গেল পিছনে, এক ইঞ্চির জন্য বেঁচে গেল। দ্রুত শরীরের ব্যালেন্স ঠিক করে সামান্য ঘুরল সে, ডান পায়ে কাউন্টারকিক ছুঁড়ল। প্রতিপক্ষ তৈরি ছিল, বাঁ হাত তুলে লাথিটা ঠেকাল। শিনবোনের ব্যথাটা দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করল ইয়োহান, ডান পা'টা মাটিতে পড়তে না পড়তেই বাঁ পায়ে আবার লাথি ছুঁড়ল। এবার ঠেকাতে পারল না প্রতিপক্ষ, বুকে আঘাত খেয়ে উল্টে পড়ল সে।

তবে আশ্চর্য ক্ষিপ্র লোকটা। মেঝেতে তো নয়, যেন স্প্রিঙের ওপর পড়েছে, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে সে, ইয়োহানের ভয় হলো—বেশি জোরে মেরে ফেলেছে কি না। গার্ড পজিশনটাকে ঢিল দিয়ে ঢোলা পায়জামায় ঘর্মাক্ত হাত মুছল। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে চাইল প্রতিপক্ষ, প্রবল বেগে ছুটে এল ইয়োহানের দিকে, অনবরত হাত-পা ছুঁড়ছে। আক্রমণের তোড়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো স্যাকলিচ কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট, ভাবনাচিন্তা করার সময় নেই কোনও, স্রেফ প্রবৃত্তির বশে আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে।

পিছাতে পিছাতে দেয়ালের কাছাকাছি পৌঁছে গেল সে, এখন পাল্টা আক্রমণ না করলেই নয়, নতুবা কোণঠাসা হয়ে পড়বে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল সে, প্রতিপক্ষ একটা দুর্বল ঘুসি ছুঁড়তেই

সরে গিয়ে ফাঁকি দিল, একইসঙ্গে ধরে ফেলল কবজিটা। পাশ ফিরে শত্রুকে সামনের দিকে হ্যাঁচকা টান দিল সে, ডান পা ভাঁজ করে উপরদিকে সজোরে ওঠাল সঙ্গে সঙ্গে। সম্মুখে উবু হয়ে যাওয়া প্রতিপক্ষের বুকে খুব জোরে লাগল আঘাতটা, হুঁক করে সমস্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল তার, একটা পা মাটিছাড়া হলো। তারপরও ছাড়ল না ইয়োহান, হাতটাকে মোচড় দিয়ে ল্যাং মারল লোকটাকে, মেঝেতে পড়ে যাওয়ার পর চেপে বসল বুকের ওপর, আড়াআড়িভাবে বাঁ হাতে শ্বাসনালীর ওপর সামান্য চাপ দিয়ে রেখেছে; চাইলে ওজন বাড়িয়ে সেটা পুরো ভেঙে দিতে পারবে।

'হার মানছি,' অবস্থাটা বুঝতে পেরে বলে উঠল ফ্রেডারিখ কার্ন।

মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত ক্রোধ আর আক্রোশ অদৃশ্য হলো ইয়োহানের মুখ থেকে। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে অব্যাহতি দিল তার স্পেশাল প্রজেক্টস্ ডিরেক্টরকে, হাত ধরে টেনে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে বাগে পেয়ে গেছ,' বলল ইয়োহান।

'সত্যি পেয়েছিলাম,' জানাল কার্ন। বহু বছর আগে কণ্ঠনালীতে একটা আঘাত পেয়েছিল সে, সেই থেকে গলার স্বরটা ফ্যাসফেঁসে; শুনলে মনে হয় সাক্ষাৎ শয়তানের গলা, অশুভ কিছু লুকিয়ে আছে ওর ভিতর।

অবশ্য এমনিতেও লোকটার অবয়ব ভয় জাগানোর মত। মোটামুটি বিশালদেহী সে, ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, দেহ অত্যন্ত সুগঠিত। এককালে পেশাদার স্ট্রিট ফাইটার ছিল, সে আমলের চিহ্ন বহন করছে ভাঙা নাক আর অসমান চোয়াল। ঝাঁকড়াচুলো কুস্তিগীরের মত দেখতে মানুষটাকে হঠাৎ দেখে মাথামোটা মনে হলেও তার ভিতর এমন ধূর্ততা লুকিয়ে আছে, যা আঁচ করা কঠিন। রত্ন চিনতে ভুল করেনি ইয়োহান, শুধুমাত্র মাথাভর্তি

কূটবুদ্ধির কারণে কার্নকে রিক্রুট করেছে সে।

দুজনের পরিচয় আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, বার্লিনে একটা কর্পোরেট টেকওভারের সময়। দেনার দায়ে চাপা পড়া একটা কোম্পানি স্যাকলিচের হয়ে কিনতে গিয়েছিল ইয়োহান—ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হট ওয়াটার বয়লার তৈরি করে। সবকিছু ফাইনাল হয়ে যাবার পর গোল বাধাল শ্রমিক ইউনিয়ন, অবিশ্বাস্য অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চেয়ে পুরো ডিলটাকে ঝুলিয়ে ফেলল তারা। দিনের পর দিন কেটে গেল, কিন্তু পারস্পরিক আলোচনায় সমাধান আর আসে না। শেষে বিকল্প খুঁজতে বাধ্য হলো ইয়োহান, যার জন্য দক্ষ একজন লোক দরকার।

খোঁজখবর নিয়ে ফ্রেডারিখ কার্নের সন্ধান পেল সে। কার্ন তখন আন্ডারওয়ার্ল্ডের হয়ে খুনখারাপি থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজ করে। তাকে দেখে পছন্দ হয়ে গেল ইয়োহানের, নিষ্ঠুর ওই চোখজোড়ায় কী বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। শুধু খুনখারাপি নয়, চাতুর্যের সাহায্যে কার্ন পারে যে-কোনও তথ্য আদায় করতে, পারে জটিল সব পরিকল্পনা আঁটতে; এ ছাড়া তার আন্ডারওয়ার্ল্ডের কন্ট্যাক্টও অভীভূত করার মত। ওকে অফার দিল ইয়োহান—যদি বিনা রক্তপাতে শ্রমিক ইউনিয়নটায় ভাঙন ধরাতে পারে, তা হলে অভাব বলে কিছু থাকবে না, স্যাকলিচ কর্পোরেশনে বড়সড় চাকরি পাবে। সুযোগটা হাতছাড়া করেনি কার্ন, সভ্যজগতে ওঠার সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে আঁকড়ে ধরেছে দুহাতে। শ্রমিক সমস্যাটা খুব দ্রুত সমাধান করে ফেলে সে। ইউনিয়ন লিডারের ঘরে এক রাতে আগুন লাগিয়ে দেয়, অল্পের জন্য পুড়ে মরেনি পরিবারটা। ভয় যা পাবার পেয়ে গিয়েছিল শ্রমিক নেতা, ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় দুদিনের মধ্যে।

সেই থেকে ইয়োহান শ্নাইডারের ডান হাতে পরিণত হয়েছে ফ্রেডারিখ কার্ন। যত দিন গেছে, তার ওপর ততই নির্ভরশীল হয়ে

পড়েছে ইয়োহান। কঠিন বা অসম্ভব যা-ই হোক না কেন, কার্নের ওপর কাজটা সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। রাস্তার গুণ্ডামি ছেড়ে দিয়েছে লোকটা অনেক আগেই, দিন দিন আরও পরিশীলিত হচ্ছে তার কূটকৌশল। কীভাবে যে তথ্য আদায় করে বা মানুষকে ভয় দেখায়, সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোঝাই যায় না।

কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার প্র্যাকটিসে নামল দুজনে। আজ তিন বছর হলো বসকে জুডো শেখাতে শুরু করেছে কার্ন। ইয়োহান মনোযোগী ছাত্র, খুব দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলেছে সমস্ত টেকনিক। নিয়মিত অনুশীলন করে সে, ইদানীং গুরুকেও হারিয়ে দিচ্ছে।

প্রথম ঘুসিটা ছোঁড়ার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। কার্নকে অপেক্ষা করতে বলে রিসিভার তুলতে গেল ইয়োহান।

জিমনেশিয়ামটা ইয়োহানের বাড়ির বেজমেন্টে। বিশাল একটা ভিলা এটা, শত বৎসরের পুরনো। হ্যামবার্গের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা ব্ল্যাঙ্কেসিন ডিস্ট্রিক্টে ভিলাটা। দু'বছর হলো এটা কিনেছে ইয়োহান। মদে তেমন আগ্রহ নেই তার, ওয়াইন সেলারটাকেই সাজিয়ে নিয়ে জিমনেশিয়ামে রূপান্তরিত করেছে। এখন ওটার চারপাশের দেয়াল আয়নায় মোড়া, রয়েছে নানা ধরনের ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি। টেলিফোনটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবার সিঁড়ির পাশে একটা টেবিলের ওপর।

'শ্লাইডার বলছি।'

'হের শ্লাইডার, আমি কোল ভলকার।' ওপাশ থেকে রেইক্‌ইয়াভিকে জিয়ো-রিসার্চের সাপোর্ট অফিসের প্রধানের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল।

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?' দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকাল ইয়োহান, ছ'টা বাজেনি এখনও। তারমানে রেইক্‌ইয়াভিকে এখন ভোর পাঁচটা, গ্রিনল্যান্ডে আরও এক ঘণ্টা কম।

'স্যর, কমিউনিকেশনে খুব গণ্ডগোল চলছে। নইলে কাল

রাতেই চেষ্টা করেছিলাম আপনাকে খবরটা দিতে।'

পেটে শিরশিরে অনভূতি হচ্ছে ইয়োহানের, ভলকারের গলায় নেতিবাচক একটা সুর... তারমানে দুঃসংবাদ আছে কোনও। 'হয়েছেটা কী, তা-ই বলো!' ধমকে উঠল সে।

'সার্ভেয়ার্স সোসাইটি ক্যাম্প ডিকেড খুলে ফেলেছে, স্যর। ওখানে একটা লাশ পাওয়া গেছে। ঠাণ্ডায় জমা, বহুদিনের পুরনো।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল ইয়োহান। দুশ্চিন্তা ভর করছে তার মাথায়, সমস্ত প্ল্যান নয়-ছয় হয়ে যাচ্ছে না তো? 'কার লাশ?'

'দেখে মনে হচ্ছে ক্র্যাশ হওয়া অ্যামেরিকান এয়ারফোর্সের একটা কার্গো প্লেনের পাইলট লোকটা।'

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ইয়োহান। লাশটা অন্য কারও হলে স্যাকলিচের ধ্বংস ঠেকানো যেত না।

বসের চেহারা দেখে কিছু আঁচ করতে পেরেছে কার্ন, এগিয়ে এল সামনে। ইয়োহান হাত নেড়ে তাকে বোঝাল, সব ঠিক আছে। তারপর ভলকারকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন বিমান? যেটা তিপান্নতে হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা?'

'জী, স্যর। ওরা ধারণা করছে, ক্র্যাশের পর কার্গো থেকে খাবারদাবার আর গরম কাপড়ের সাহায্য নিয়ে বেঁচে ছিল লোকটা। বিমানে ওসব থিউলি এয়ার বেসের জন্য যাচ্ছিল।'

তারপরেও নিশ্চিত হতে চায় ইয়োহান। জানতে চাইল, 'ডেডবডিটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?'

'না, স্যর,' ভলকার জবাব দিল। 'লাশটা এখনও ক্যাম্প ডিকেডে পড়ে আছে। ওরা এয়ার ফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে করণীয় জানবার জন্যে।'

'না! সেটা হতে দেয়া যাবে না!' কঠিন গলায় বলল ইয়োহান। 'এমনিতেই ওখানে অনেক ফালতু লোক জমে গেছে। অ্যামেরিকানরা জানতে পারলে গোটা একটা ফরেনসিক টিম

পাঠাবে, সঙ্গে সশস্ত্র এসকর্টও। ঝামেলা বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।' দ্রুত চিন্তা করল সে। 'সার্ভেয়ার্স সোসাইটির ওরা যেন কোথাও যোগাযোগ করতে না পারে। কমিউনিকেশনে সমস্যার অজুহাত দেখাও ওদের।'

'সেটা অবশ্য খুব একটা মিথ্যে বলা হবে না,' জানাল ভলকার। 'সোলার ম্যাক্সের কারণে এমনিতেই ওখানকার স্যাটেলাইট ফোনগুলো কাজ করছে না। রেডিওতেও কদাচিৎ কথা বলা যায়।'

'তা হলে তো খুবই ভাল। ওদেরকে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখো। আমাদের লোকজন ছাড়া কেউ যেন রেডিও ব্যবহার করতে না পারে।'

'তা-ই হবে, স্যর।'

'তারপরও লাশটার অ্যানালিসিস চাই আমি।'

'কাজটা সহজ হবে না,' বলল ভলকার। 'ওটার ধারেকাছে ঘেঁষার কোনও অজুহাত নেই আমাদের কাছে।'

'তা হলে গোপনে করুক,' বিরক্ত গলায় বলল ইয়োহান, লোকটার মাথায় গোবর নাকি? সবকিছু ভেঙে বলে দিতে হবে? 'ময়নাতদন্ত দরকার নেই আমার, শুধু নিশ্চিত হতে বলো—যাকে ভাবা হচ্ছে, এ ঠিক সেই লোক কি না।'

অন্যপ্রান্তে ভলকার বেশ অবাক হলো নির্দেশটা শুনে। ওই মড়ার বেসে পাইলটের বেশ ধরে আর কে ঢুকবে? তেমন আছেটাই বা কে? বিস্ময়টা তার মনের ভিতর জমা হয়ে রইল, ইয়োহান পরিষ্কার করছে না নির্দেশের কারণটা। ভলকারের লেভেলের কারও সব খুঁটিনাটি জানার প্রয়োজন নেই।

'যা বলছি সেটা করো,' কঠিন গলায় আদেশ করল ইয়োহান।

'জী, স্যর,' অনুগত প্রজার মত জবাব দিল ভলকার। তারপর ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে... হের শ্নাইডার, আরেকটা ব্যাপার জানাতে চাইছিলাম।'

'আবার কী?'

'রেইক্ইয়াভিকে মাসুদ রানা যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করেছিল, তার পরিচয় জানা গেছে। তার নাম রোজালিন গুডজনসেন।'

'কে সে?'

'আশি বছরের এক বুড়ি। তার ছেলে তিপান্ন সালে ক্র্যাশ হওয়া সি-নাইন্টি সেভেনের তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল।'

'তার পিছনে লোক লাগিয়েছ?'

'জী। তবে যদ্দূর জানা গেছে, রানা দেখা করার পর থেকে মহিলার দৈনন্দিন রুটিনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে, সন্দেহজনক কারও সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করেনি। আমি কি তার ফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করব?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল ইয়োহান। গ্রিনল্যান্ডের ব্যাপারে এই বুড়ির সম্পৃক্ততা শুধু প্লেন ক্র্যাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা। আর কিছু জানার কথা নয় তার। তা হলে রানা দেখা করতে গিয়েছিল কেন? প্যান্ডোরা প্রজেক্ট আর প্লেন ক্র্যাশের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। লোকটা নিশ্চয়ই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে। 'বাদ দাও, ভলকার। মহিলার পিছনে যতই ঘুরুক রানা, কোনও লাভ নেই। কিচ্ছু জানতে পারবে না। শুধু শুধু ফোন ট্যাপ করার দরকার নেই। এক কাজ করো, দু'তিনদিন হালকা সার্ভেইলান্স রেখে দেখো বুড়ি কী করে না করে। সন্দেহজনক কিছু না পেলে তাকে যেমন আছে থাকতে দাও।'

'আপনি যা বলেন।'

'আর হ্যাঁ, টিমের শেষ সদস্য বোধহয় আজ রাতে পৌঁছুচ্ছে ওখানে, তা-ই না?'

'শিডিউলে সামান্য নড়চড় হয়েছে। ডা. লিয়া নোভাক কাল পৌঁছুবেন। আগামীকাল।'

'ঠিক আছে। আমি ফ্রেডারিখ কার্নকে একদিন পরে পাঠাচ্ছি গ্রিনল্যান্ডে। আমাদের সার্চ উইন্ডোটা কত বড় হবে, তা বোঝার যখন উপায় নেই, কাজটা দ্রুত শুরু করা ভাল। মুয়েলার এখন পর্যন্ত ভাল কাজ দেখিয়েছে, তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ো। তবে ফ্রেডারিখ গিয়ে পুরো অপারেশনের দায়িত্ব নিজে নেবে। তখন জিয়ো-রিসার্চ ছাড়া অন্য যারা আছে, তাদের তাড়ানোর একটা অজুহাত খুঁজে বের করতে হবে।'

'জী, হের শ্নাইডার।'

লাইন কেটে দিল ইয়োহান। কার্ন জানতে চাইল, 'তা হলে মাসুদ রানার কন্ট্যাক্টের খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'কন্ট্যাক্ট বলা ঠিক হবে কি না জানি না,' ইয়োহান ঠোঁট ওল্টাল। 'বুড়ি এক মহিলা, নাম রোজালিন গুডজনসেন। মাথা ঘামানোর মত কেউ নয়। তার ছেলে তিপান্ন সালে হারিয়ে যাওয়া সি-নাইন্টি সেভেনের তল্লাশিদলে ছিল।'

'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা তোমার এত হালকাভাবে নেয়া ঠিক হচ্ছে না,' কার্নের গলায় অসন্তোষ। 'মাসুদ রানা বলে কথা। সে আর ববি মুরল্যান্ড শুধু বরফ খুঁড়তে ওখানে গেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড তো তোমার জানা আছে।'

'জানি, কিন্তু এই গুডজনসেনের কাছ থেকে ওদের কোনও তথ্য পাবার সম্ভাবনা নেই। যত খুশি অন্ধকারে হাতড়ে ফিরুক ওরা, আমাদের কী?'

'সত্যিই তা-ই? হঠাৎ করে লেজুড় হিসেবে এ দুজনের নাম দেখে একটুও অবাক হওনি তুমি? চমৎকারভাবে সাজিয়েছিলাম আমরা অপারেশনটা, ওরা আসায় নতুন করে ছক কাটতে হচ্ছে।'

'ভয় পাচ্ছ?' ইয়োহানের গলায় বিদ্রূপ। 'আমি ভেবেছিলাম ওদের সামলানো তোমার জন্য কোনও ব্যাপারই নয়।'

'এখনও তা-ই, ইয়োহান,' দৃঢ় গলায় বলল কার্ন। 'তবে সেজন্য আমাকে আমার কায়দায় কাজ করতে দিতে হবে। ওই

বুড়িটার ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে চাই না। অনুমতি দাও তো সরিয়ে দিই পৃথিবী থেকে।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ইয়োহান। বিস্মিত গলায় বলল, 'জিসাস, ফ্রেডারিখ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ অপারেশনটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে কারও ক্ষতি না হয়। আর তুমি কি না নিরীহ একজন বৃদ্ধাকে মেরে ফেলতে চাইছ!'

তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না কার্নের মধ্যে। শান্ত গলায় বলল, 'নিজেকে প্রবোধ দিয়ে লাভ নেই, ইয়োহান। আজ পর্যন্ত যত কাজ করেছি, সেগুলোর সব সীমা ছাড়াতে যাচ্ছে এটা। বোর্ডকে কী বুঝিয়েছ জানি না, তবে যা করতে চাও তা চরম অবৈধ। শুধু কোটি কোটি টাকা বাঁচানোর যুক্তি দিয়ে এই সত্য পাল্টানো যাবে না। কোম্পানিকে যদি বাঁচাতেই চাও তো নির্দয় কিছু সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতেই হবে।'

'তাই বলে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের অনুমতি আমি দিতে পারি না,' থমথমে গলায় বলল ইয়োহান। 'আমার একটা বিবেক আছে।'

'ওই বুড়ি একটা ছেঁড়া সুতো। গুরুত্ব না থাকলে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে কেন মাসুদ রানা? আমি এখনও বলব, ওকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না।'

'এখনও কি কিছু শেখোনি তুমি, ফ্রেডারিখ? খুনখারাপি করে সমস্যার সমাধান হয় না। অপ্রয়োজনে রক্তপাত বরং বিপদ ডেকে আনে। আমাদের টার্গেট প্যান্ডোরা গুহা ধ্বংস করে দেয়া, তার জন্য ভায়োলেন্সের কোনও দরকার নেই। দরকার শুধু গোপনীয়তা, ব্যস!'

কার্ন এখনও কথাটা মানতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। তার আচরণটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আজ পর্যন্ত কখনও তার বিরোধিতা করেনি লোকটা, আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। আজ হঠাৎ কী ঘটল? পরের কথাটায় কিছুটা কারণ আন্দাজ করা গেল।

'আমি পরশু গ্রিনল্যান্ড যেতে পারব না,' বলল কার্ন। 'রোববার রাতে পার্টির এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং আছে। আমাকে সেখানে থাকতে হবে।'

বিরক্তিতে ইয়োহানের মুখ বেঁকে গেল। এটা ঠিক, নিজের গুণ্ডাপাণ্ডা ইমেজ ঝেড়ে ফেলায় অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়েছে কার্ন—আজকাল দামি সুট পরে, নামকরা রেস্টুরেন্টে খায়, কথা বলে শুদ্ধ করে, এমনকী সস্তাদরের পতিতাদের কাছেও যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস ছাড়তে পারেনি সে—নাৎসি পার্টির সদস্যপদ। দীর্ঘদিন থেকে নিয়ো-নাৎসিদের সঙ্গে জড়িত সে, সক্রিয়ভাবে তাদের হয়ে কাজ করছে। সম্প্রতি পার্টির এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে পদোন্নতি হয়েছে তার।

ফ্যাসিজমের প্রতি কার্নের অনুরাগ সেই ছোটবেলা থেকে। তার বাবা ছিল *এইসাৎজ্টাব রাইখস্লেটার রোজেনবার্গ* বা ই.আর.আর-এর একজন সার্জেন্ট। ওটা ছিল হিটলারের পেশাদার লুটতরাজ বাহিনী, সারা ইয়োরোপের ইহুদিদের ধনসম্পদ কেড়ে নেয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। যদ্দূর জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এরা শুধু হল্যান্ড থেকেই সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলারের ধনসম্পদ লুঠ করেছিল। এদের মাধ্যমেই সারা পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ ওয়েস্টার্ন আর্ট পাচার হয়ে গেছে।

নিজের ছেলেকে কার্নের বাবা সেই আদর্শে বড় করেছে। তাকে শিখিয়েছে—যুদ্ধের সময় নাৎসিরা যা করেছে, তা ঠিক ছিল। মগজ বলতে গেলে ধোলাই হয়ে গেছে কার্নের, কৈশোর থেকেই ফ্যাসিবাদকে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে নাম লিখিয়েছে সে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস বলতে হবে—প্যান্ডোরা গুহায় নেয়া আটাশ টন সোনা ই.আর.আর-এরই একটা অংশ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে লুঠ করেছিল। তাই এই অপারেশনটার প্রতি কার্নের আলাদা দুর্বলতা আছে, যে-কোনও

মূল্যে সফলতা চায় সে।

'গত সপ্তাহেই না একবার মিটিঙে গেলে?' বলল ইয়োহান। 'এত তাড়াতাড়ি আবার সভার ডাক পড়ল কেন?'

'ওটা ছিল অ্যাকশন-কাউন্সিল মিটিং,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল কার্ন।

'হুঁহ্! অ্যাকশন কাউন্সিল, এক্সিকিউটিভ কমিটি... শুনে মনে হয় পেটফোলা কোনও বামপন্থী দল। তোমাদের মত মিটিংবাজ আমি জীবনে দেখিনি, কাজের চেয়ে কথা বেশি বলো।'

অপমানটা ইয়োহানের মুখ থেকে আসছে বলে চুপ করে রইল কার্ন, অন্য কেউ বললে এতক্ষণে তুলকালাম ঘটে যেত। অবশ্য কথাটা একেবারে ভুল নয়, সত্যিই তাদের পার্টিতে বাগাড়ম্বর বেশি।

'শুধু তুর্কি অভিবাসীদের হুমকি-ধামকি দিতে আর পরিবেশবাদীদের সমাবেশে পটকা ফাটাতে জানো তোমরা,' ইয়োহানের বিদ্রূপ এখনও শেষ হয়নি। 'তাতে খবরের কাগজে দুয়েকটা হেডলাইন হওয়া যায়, আর কিছু না। এভাবে এগোলে আগামী এক হাজার বছরেও তোমাদের নতুন রাইখের স্বপ্ন সফল হবে না। ঈশ্বরের কিরে, ফ্রেডারিখ! এসব ছেড়ে দাও। ফ্যাসিবাদ আর কখনও ফিরবে না, মানুষ স্বাধীনতার মজা টের পেয়ে গেছে। তোমাদের ওই রঙচঙে পোশাক আর ফাঁপা বক্তৃতায় তাদের আর ভোলানো যাবে না। তা ছাড়া নাৎসিবাদ ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটা দর্শন, সত্যিকার কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন নয়।'

'ভুল!' কার্ন প্রতিবাদ করল। 'হিটলার আমাদের আদর্শকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বানিয়েছিল। তার দুর্বলতার জন্যই নাৎসিবাদের পতন ঘটে।'

'আদর্শের পতন ঘটেছিল অ্যামেরিকানরা বম্বিং করে আমাদের দেশকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ায়। পতন ঘটেছিল শহরে শহরে মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক ঢুকে পড়ায়। শুধু শুধু হিটলারকে দোষ দিয়ে

লাভ নেই। ভেবে কষ্ট হয়, আজও তোমাকে পুঁজিবাদের মহত্ত্ব বোঝাতে পারিনি। আজকের যুগে ওটা ছাড়া দেশ চালানোর চেষ্টা করা বোকামির শামিল। তুমি তা না মানো তো অসুবিধে নেই। কিন্তু যতদিন ফ্যাসিবাদের স্বপ্ন সফল না হচ্ছে, তুমি আমার জগতে বাস করছ; এখানে আমার কথায় চলতে হবে তোমাকে। মিটিঙ-ফিটিং বুঝি না, গ্রিনল্যান্ডে যাবে তুমি। প্যান্ডোরা গুহার নাম-নিশানা না মোছার আগে যদি কেউ ওটার খোঁজ পেয়ে যায়, তা হলে তোমার ওই পেয়ারের পার্টির ষাট বছরের পুরনো কেচ্ছা-কাহিনি দুনিয়ার সব পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হবে। আন্দোলন তো দূরের কথা, তাস খেলার জন্যেও একটা মানুষ খুঁজে পাবে না তখন।'

কার্নের চেহারা লাল হয়ে গেছে, তাকে ওভাবেই রেখে জিমনেশিয়াম থেকে বেরিয়ে এল ইয়োহান। স্যুইটে গিয়ে জামাকাপড় খুলে গোসল করতে ঢুকল, মন চিন্তায় আচ্ছন্ন। এই বিশেষ প্রজেক্টটার দায়িত্ব কার্নকে দেয়া ঠিক হলো কি না ভাবছে। অপারেশনটার লক্ষ্য অর্জনে লোকটার দৃঢ় অঙ্গীকারের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। প্যান্ডোরা গুহা তাদের কর্পোরেশন আর নিয়ো-নাৎসি পার্টি—দুয়ের জন্যই বিপজ্জনক। কিন্তু কাজটা সারার পদ্ধতির বেলায় ফ্যানাটিকের মত আচরণ করছে কার্ন, রোজালিন গুডজনসেনকে খুন করার পরামর্শ সেটাই প্রমাণ করে। স্যাকলিচ এজি'র কূটবুদ্ধিসম্পন্ন সফিসটিকেটেড স্পেশাল প্রজেক্টস্ ডিরেক্টর কখনও একাজ করতে চাইত না।

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে ইয়োহান উপলব্ধি করল, কার্নের এই আচরণের শেষটা এখানেই ঘটবে না। গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছে আরও স্বাধীন আর বেপরোয়া হয়ে উঠবে সে, ভিতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে সত্যিকার নাৎসি সত্তা। তাকে একেবারে বাদ দেয়ারও উপায় নেই, এই প্রজেক্টের মত বিশাল কাজে তার মত বিশ্বস্ত আর দক্ষ লোকের দরকার, চাইলেও বিকল্প পাওয়া যাবে না। মানেটো

পরিষ্কার—যদি আসলেই রক্তপাত এড়াতে চায়, যদি আসলেই সবকিছু নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন করতে হয়, তা হলে স্যাকলিচ এজি'র প্রেসিডেন্টকে খুব শক্ত হাতে ফ্রেডারিখ কার্নের রাশ টেনে ধরতে হবে।

তেরো

জিয়ো-রিসার্চ স্টেশন, গ্রিনল্যান্ড।

বিছানায় বসে কম্পিউটারে ক্যাম্প ডিকেডের নকশা স্টাডি করছিল রানা, হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল ডরমিটরির দরজা। ছোট ছোট রুমে ভাগ করা হয়েছে ভিতরটা, রানা পেয়েছে একেবারে শেষ মাথার একটা কক্ষ। সদর দরজা থেকে বেশ খানিকটা দূরে থাকলেও খোলা দরজা দিয়ে ঢোকা হিম হিম ভাবটা অনুভব করল ও।

'রানা! রানা!' চেঁচিয়ে ডাকল স্যাম র‍্যামসে। 'আপনি আছেন এখানে?'

'এই যে!' জবাব দিল রানা। 'কী হয়েছে?'

হন্তদন্ত হয়ে ওর কেবিনের দরজায় উদয় হলো স্যাম। 'খবর পাননি এখনও? ম্যাক্সিম বোরোশিন মারা গেছে!'

বজ্রাহতের মত জমে গেল রানা, সংবাদটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মেরু অঞ্চলের অভিযানে মানুষের আহত হওয়া বা মৃত্যু কোনও নতুন ঘটনা নয়। তাই বলে বোরোশিন? পুরো ক্যাম্পে সে-ই সবচেয়ে অভিজ্ঞ লোক ছিল।

একটাই অর্থ হয় এর—এই অভিযানটার ব্যাপারে রানা যা

সন্দেহ করছে, তা ঠিক। ক্যাম্প ডিকেডে পাওয়া মেজর কনওয়েের মৃতদেহটাই একমাত্র অস্বাভাবিকতা নয়, আজ সকালে নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে ও। সেই সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে বোরোশিনের মৃত্যু। তলে তলে বড় কিছু একটা ঘটে চলেছে এখানে।

খারাপ লাগছে খুব, হাসিখুশি রাশিয়ান লোকটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মাতম করার সময় নয়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। স্বরূপে নামতে হবে ওকে, ছুটির মেজাজে থাকার সময় শেষ। স্যামের বিভ্রান্ত চাহনি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছে না সে, নেতৃত্ব দেয়া তো অনেক পরের কথা। যা করার রানাকেই করতে হবে।

'কীভাবে ঘটল ঘটনাটা?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা, তাতে স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা।

উত্তর দেয়ার আগে কোনও দ্বিধা করল না স্যাম। জানে, এই অভিযানে হুকুমজারির সুযোগ আর নেই তার। লাশটা দেখে নিজের অজান্তেই ছুটে এসেছে রানার কাছে, মনের গহীনে ভাল করেই জানে—সত্যিকার নেতা কে। কার ক্ষমতা আছে এই অবস্থা সামাল দেবার।

'বরফে চাপা পড়ে,' জানাল সে। 'সকালে ক্যাম্প ডিকেডে ঢুকেছিলাম আমি আর জিগলার। গিয়ে দেখি এক জায়গায় ছাদ ধসে পড়েছে। ওই যে, যেখানটায় হামাগুড়ি দিয়ে পার হলাম আমরা, তার ঠিক পাশেই। প্রায় দশ ফুট জায়গা বরফে ঢেকে গিয়ে প্যাসেজটা ব্লক করে ফেলেছে। বেলচা দিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে তলায় পেয়েছি বোরোশিনকে। ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে গেছে। বোধহয় ছাদটা ধসে পড়ার সময় ঠিক নীচে দাঁড়ানো ছিল।'

'দেখান আমাকে।'

ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে এল রানা আর স্যাম। ঘন মেঘে সূর্য

ঢাকা পড়ে আছে, কনকনে বাতাস হুল ফোটাচ্ছে পুরু কাপড় ভেদ করেও। হুডটা ভাল করে বাঁধল রানা, দস্তানাদুটোও টেনেটুনে সেট করল হাতে। উড়ন্ত তুষারে চারদিক ঝাপসা হয়ে আছে। তাতে বিশেষ অসুবিধে নেই, ইতোমধ্যে ক্যাম্প ডিকেড পর্যন্ত সেফটি লাইন বসানো হয়েছে। সেটা ধরে অ্যাকসেস শাফটের দিকে এগোতে শুরু করল ওরা।

রানার মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। বোরোশিন ওর পাশের কেবিনে থাকত। কাল গভীর রাতে লোকটাকে ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে ও। ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি, ভেবেছে খিদে লাগায় কিছু খেতে গেছে বিশালদেহী রাশিয়ান, গোপন অভিসারেও যেতে পারে। ঘুমিয়ে পড়ায় বুঝতে পারেনি লোকটা রাতে আর ফিরেছে কি না। সকালেও কেবিনে ছিল না সে, তখনও ভেবেছে সকাল সকাল উঠে কাজে চলে গেছে বোরোশিন। কিন্তু দুটো ধারণাই ভুল ছিল।

বোরোশিন মারা গেছে—এটা যত না অবাক বিষয়, তারচেয়ে বেশি অবাক হতে হচ্ছে ঘটনাস্থলটার কথা শুনে। ক্যাম্প ডিকেডে কী করছিল বোরোশিন? ওখানে যাবার কোনও কারণ ছিল না তার। তা হলে গেল কেন? মৃতদেহটা দেখলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে।

দ্রুত পা চালাচ্ছে রানা, ওর সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল স্যাম—আস্তে যেতে বলছে। কথাটা না শোনার ভান করে চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা, ওর সঙ্গী কচি বাচ্চা নয়, একাই আসতে পারবে। শাফটের কাছে ও যখন পৌঁছুল, স্যাম তখন বেশ খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে। ড্রাম দিয়ে তৈরি মেক-শিফট এলিভেটরটায় উঠে পড়ল ও, দ্রুত নীচে নেমে গেল, স্যাম পরে আসুক। তলায় পৌঁছে শাফটের মেঝেতে পা দিতেই ছপছপ শব্দ হলো, বরফ গলে ওখানে বেশ খানিকটা পানি জমে আছে।

ওপরে পৌঁছে গেছে স্যাম, গর্তের কিনারায় উঁকি দিয়ে চেঁচাল, 'আমার জন্য দাঁড়ান!'

'আগে পাম্পটা ছাড়ুন,' উঁচু গলায় বলল রানা। 'এখানে অনেক পানি জমে আছে। সকালেই উচিত ছিল আপনাদের এসব সেঁচে ফেলা।'

'আচ্ছা ছাড়ছি,' কিনারা থেকে সরে গেল স্যাম।

স্টেজিং এরিয়াটা পেরিয়ে কমপ্লেক্সের মূল অংশে পা রাখল রানা। কোথাও একটা জেনারেটর চলছে, গুমগুম শব্দে ভরে গেছে ভিতরটা। রাগে শরীরটা জ্বলে উঠল ওর, ঘড়ি দেখে হিসেব করল স্যাম আর জিগলার কতক্ষণ ধরে এখানে কাজ করছে। তাড়াতাড়ি সামনে এগোল ও।

ইন্টারসেকশন পেরিয়ে ক্যাম্পের অ্যাকোমোডেশন উইঙের দিকে এগোতেই দেখা মিলল শব্দের উৎসের। করিডোরের এক প্রান্তে বসানো হয়েছে ছোট্ট পোর্টেবল জেনারেটরটা, একজস্টের ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে গেছে। সিলিঙে বেশ কয়েকটা স্পটলাইট লাগানো হয়েছে, ওগুলোকেই শক্তি সরবরাহ করছে ওটা।

রানাকে এগিয়ে আসতে শুনতে পায়নি জিগলার, সে বেলচা দিয়ে বরফ সরাচ্ছে—করিডর থেকে তুলে খালি একটা অফিসঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলছে। মেঝে থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট তুলে আলো জ্বালল রানা, জেনারেটরের সুইচ অফ করে দিল। মাথার ওপরের বাতিগুলো ম্লান হয়ে নিভে গেল।

'কে ওখানে?' বলে উঠল জিগলার। 'জেনারেটর বন্ধ করল কে?'

রাগটা যথাসম্ভব চাপা রেখে তাকে হাত ধরে টানল রানা। বলল, 'কথা না বলে তুমি বেরোও এখান থেকে! পুরো জায়গাটা কার্বন মনোক্সাইডে ভরে গেছে।'

'চলে যাবো মানে? মি. র‍্যামসে বলেননি আপনাকে—ম্যাক্সিম বোরোশিন মারা গেছেন? তাঁর লাশটা এখানে।'

'এখানে থাকলে তুমিও মরবে!' ধমকে বলল রানা। 'বেরোও বলছি!' জিগলারকে জোরে টানল ও, দ্রুত ওখান থেকে সরিয়ে নিতে চায়।

হাঁটতে গিয়ে মাথা চক্কর দিয়ে উঠল তরুণ জার্মানের, কোনমতে দেয়াল ধরে তাল সামলাল সে, রানা ধরে ফেলল তাকে।

'ওরে বাবা! মাথা ঘুরছে দেখি।'

'তোমার ফুসফুস গ্যাসে ভরে গেছে,' বলল রানা। 'এতক্ষণ কাজ করছ, গন্ধ পাওনি?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছিলাম তো। তবে কোনও অসুবিধে হবে বলে ভাবিনি।'

ঠিকমত হাঁটতে পারছে না জিগলার, তাকে শক্ত করে ধরে শাফটের তলায় নিয়ে এল রানা। মুক্ত বাতাস পেয়ে কাশতে শুরু করল সে, বমিও করে দিল, চেহারা ছাইবর্ণ ধারণ করেছে।

'স্যাম!' চেঁচিয়ে জানতে চাইল রানা, 'ববি কোথায়?'

'ব্রেকফাস্টের পর থেলমা ওঁকে ডেকে নিয়ে গেছে,' জানাল স্যাম। 'একটা স্নো-ক্যাটের নাকি ইঞ্জিনে সমস্যা করছে, তাঁর সাহায্য দরকার।'

এই দুজনের চরম বোকামির কারণ বোঝা গেল এতক্ষণে। মুরল্যান্ড থাকলে কখনও ভিতরে জেনারেটর নিতে দিত না। বন্ধ জায়গায় মোটর বা ইঞ্জিন চালাতে হয় না, তাতে বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড বেড়ে যায়। এরা যেভাবে কাজ করছিল, তাতে খুব শীঘ্রি দম আটকে মরত। এক অর্থে ম্যাক্সিম বোরোশিন তাদের জীবন বাঁচিয়েছে। মৃতদেহটা পাওয়ায় রানাকে খবর দিতে গিয়েছিল স্যাম, নইলে কয়েক ঘণ্টা পর একসঙ্গে তিনটে লাশ উদ্ধার করা হতো।

'ওকে ডেকে আনুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'বলবেন তার নিয়ে আসতে। বাইরে থেকে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে কমপ্লেক্সে।

ফিরে এসে সাহায্য করুন আমাকে, জেনারেটরটা ওপরে তুলব।'

নির্দেশ পালনে স্যাম আপত্তি করল না; মনে মনে দোষী ভাবছে নিজেকে। ক্যাম্পের ভিতর জেনারেটর বসানোর আইডিয়াটা তার ছিল। জিগলারের অবস্থা দেখে ওটা কত বড় ভুল ছিল তা ভালই বুঝতে পারছে।

কমপ্লেক্সে ঢোকার জন্য ঘুরল রানা। জিগলারকে বলল, 'এখানেই থাকো তুমি। বড় বড় শ্বাস নাও, ফুসফুস পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্যাম ফিরলে সাহায্য করবে তোমাকে ডরমিটরিতে ফিরতে।'

মাথা ঝাঁকাল জার্মান তরুণ। তাকে রেখে ক্যাম্পে আবার ঢুকল রানা। জেনারেটর চলায় তাপমাত্রা বেড়েছে ভিতরে, বরফ গলে মেঝে এখন ভেজা ভেজা। শাফটের তলাটা সেঁচা হলে এখান থেকেও পানি বের করতে হবে। বরফ আবার জমে গেলে চলাফেরায় কষ্ট হবে খুব।

জেনারেটরটা পেরিয়ে থামল ও, যেখানটায় ছাদ ধসে পড়েছে, সেটা ভাল করে দেখল। ওপরের কাঠামো দুর্বল ছিল আগেই—ছাদের বিভিন্ন জায়গার ফাটল সেটা প্রমাণ করে। কিন্তু এটা একেবারে বোরোশিনের মাথার ওপর খসে পড়তে গেল কেন? এ ধরনের একটা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। লোকটা এখানে করছিলই বা কী?

ফ্ল্যাশলাইট ঘুরিয়ে লাশটার ওপর আলো ফেলল রানা। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিশালদেহী উল্কাবিদ, পরনে নীল রঙের পারকা, হুড নামানো। মৃতদেহের ঊর্ধ্বাংশের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে ফেলেছে স্যাম আর জিগলার, নীচটা অবশ্য এখনও ঢাকা। মাথার পিছনের আঘাতটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, রক্ত জমে কালচে হয়ে আছে জায়গাটা। হাঁটু গেড়ে পরীক্ষা করল ও, ভারি কিছুর আঘাত ওটা, হাড্ডি থেঁতলে দিয়েছে। কীসে ঘটাল? খসে পড়া বরফের চাঁই, নাকি অন্যকিছু?

রক্তপাতের পরিমাণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওই এক আঘাতেই মৃত্যু ঘটেছে বোরোশিনের। একদিক থেকে ভালই হয়েছে, অন্ধকারের ভিতর ঠাণ্ডায় জমে তিলে তিলে মরতে হয়নি তাকে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াল রানা, আলো ঘুরিয়ে দেখল—মুরল্যান্ড আসছে।

'কী ট্র্যাজেডি!' লাশটা দেখে বলল সে। 'মরার আর জায়গা পেল না লোকটা!'

'হুঁ। স্যাম আর জিগলারের কী অবস্থা?'

'স্যাম তো সুস্থ। তোমাকে ডাকতে গিয়েছিল নাকি, তাতে বেশ কিছুক্ষণ পরিষ্কার বাতাস পেয়েছে, বিষক্রিয়াটা চলে গেছে। তবে ওই জার্মান ছোকরার স্বাভাবিক হতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে। স্যাম তাকে ধরাধরি করে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে।'

'স্যামের আসলে বুদ্ধিসুদ্ধি নেই,' রানা বিরক্ত। 'কী ভেবে এখানে জেনারেটর আনতে গেল?'

'দোষটা আমারই,' মুরল্যান্ড লজ্জিত। 'ওঁর যে এসবে তেমন অভিজ্ঞতা নেই, তা তো জানতামই। একা একা আসতে দেয়াই উচিত হয়নি।'

'তোমার আর কী দোষ? স্নো-ক্যাট মেরামত করতে গিয়েছিলে শুনলাম?'

'ব্রেকফাস্ট সেরে বের হতেই থেলমার কবলে পড়লাম, ওটা নাকি নুয়েনডর্ফ একা ঠিক করতে পারছে না। কী পীড়াপীড়ি! তোমাকে বলে যাবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না, ধরে বেঁধে নিয়ে গেল সঙ্গে।'

'হুঁ।'

'এখানে ঘটেছে কী?'

'ছাদ ধসে পড়েছে,' আলো নেড়ে দেখাল রানা। 'বোরোশিন বোধহয় ঠিক তলাতেই দাঁড়ানো ছিল। মাথায় ভারি আঘাত দেখলাম, সম্ভবত বড় কোনও বরফের চাঁই পড়েছিল ওখানটায়।

বেচারা কোনও সুযোগই পায়নি।'

'পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে খসে পড়েনি ছাদটা, আজ হঠাৎ পড়ল কেন?'

'আমাদের কারণে,' বলল রানা। 'গতকাল আমরা ঢোকার আগ পর্যন্ত স্টেবল ছিল ভিতরের আবহাওয়া। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে সীল। আমরা হাঁটাচলা করেছি, কাজ করেছি—তাতে তাপমাত্রাও গেছে বেড়ে। ছাদ ধসার জন্য হয়তো ওটুকুই দরকার ছিল।'

'বলতে চাইছ লোকটার মৃত্যুতে কোনও রহস্য নেই? ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিল সে?'

'যতক্ষণ না অন্যকিছুর প্রমাণ পাচ্ছি।'

'আমার কাছে এত সোজা মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। মাঝরাতে এখানে কী করছিল সে?'

'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না,' রানা স্বীকার করল। 'রুম থেকে বেরোতে দেখেছি তাকে, কিন্তু এখানে আসবে কল্পনাও করিনি। কে জানে, হয়তো ভিতরটা দেখার শখ হয়েছিল।'

'তা হলে কাউকে না বলে চুপি চুপি এল কেন? দেখতে চাইলে আমাদের কারও সঙ্গে এলেই পারত।'

'কী জানি! ব্যাপারটা আসলেই ঘোলাটে।' লাশের ওপর আবার নজর দিল রানা। বোরোশিনের দুহাত মাথার ওপরে, শোয়া অবস্থায় সামনের দিকে প্রসারিত। মানে কী এর? সে কি ছাদ ধরে ধরে এগোচ্ছিল?

'রানা,' শান্ত গলায় নিজের সন্দেহ প্রকাশ করল মুরল্যান্ড। 'বোরোশিন ওই লাশটা দেখতে আসেনি তো?'

'অসম্ভব কিছু নয়,' রানা একমত হলো। 'কিন্তু একজন মরা পাইলটের ব্যাপারে তার এত আগ্রহ হবে কেন?'

'বেশি জটিল করে ভাবছি আমরা,' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'সহজ ব্যাখ্যাটাই ভাবছি না কেন? চুপি চুপি মদ

গিলতে এসেছিল সে, কাউকে জানতে দিতে চায়নি।'

'সেক্ষেত্রে মদের এক-আধটা বোতল পাওয়া যাওয়া উচিত। খুঁজে দেখবে নাকি?'

মুরল্যান্ড ভুরু কোঁচকাল। 'আসলে ঠিক কী ভাবছ বলো তো? হঠাৎ মদের বোতল খুঁজতে চাইছ কেন? ব্যাপারটা কী?'

মুখ খোলার আগে প্যাসেজটা দেখে নিল রানা, স্যাম আবার ফিরে আসে কি না। তথ্যটা তাকে জানানো ঠিক হবে না। নিশ্চিত হয়ে ও বলল, 'গাইগার কাউন্টারটা, ববি। ওটা দিয়ে গতকাল আমি পুরো ক্যাম্পের ম্যাপিঙের সময় রেডিয়েশনও চেক করেছি।'

'তা তো দেখতেই পেয়েছি।'

'এমনিতে সব স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এক জায়গায় দেখলাম কাঁটাটা সামান্য লাফিয়ে উঠেছে। তখন তেমন গুরুত্ব দিইনি, মনে হয়েছিল ওটা হয়তো এখানকার রিঅ্যাক্টর রুমের রেসিডিউয়াল রেডিয়েশন। আজ সকালে ম্যাপের সঙ্গে গাইগার রীডিং মেলাতে বসেছিলাম। কী পেয়েছি শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ওই অস্বাভাবিক রীডিংটা রিঅ্যাক্টর রুমের ধারেকাছেও না।'

'তা হলে?'

'ওটা এসেছে অ্যাকোমোডেশন এরিয়া থেকে,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে... আমাদের পাইলট বাবাজি যেখানে শুয়ে আছেন, সেই রুম থেকে।'

থমকে গেল মুরল্যান্ড। বিস্মিত গলায় বলল, 'লাশটা... লাশটা রেডিয়েটেড?'

'হ্যাঁ, তবে বিপজ্জনক মাত্রায় নয়, শুধু গাইগার কাউন্টারে ধরা পড়ার মত। তবে পঞ্চাশ বছর ধরে যদি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে ওটা, ধরে নিতে হবে—মরার সময় নিয়ন বাতির মত জ্বলছিল সে।'

'মাই গড!' মুরল্যান্ডের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'তারমানে রোজালিন গুডজনসেনের সন্দেহ সত্যি? আসলেই রেডিয়ো-অ্যাকটিভ কিছু ছিল বিমানটায়?'

রানা মাথা নাড়ল। 'আমার সন্দেহ আছে। অমন কিছু হারালে অ্যামেরিকানরা কিছুতেই সার্চ অপারেশন বন্ধ করত না। আটষট্টি সালে মেরু এলাকায় ক্র্যাশ হওয়া এমন একটা প্লেনের ঘটনা শুনেছি আমি—ইউ.এস. এয়ারফোর্স সবমিলিয়ে দশ লাখ কিউবিক ফুট বরফ খোঁড়াখুঁড়ি করে বিমানটার প্রত্যেকটি অংশ উদ্ধার করে এনেছিল। না হে ববি, আমাদের ওই সি-নাইন্টি সেভেনেও যদি রেডিয়ো-অ্যাকটিভ আইটেম থাকত, ওরা এত সহজে হার মানত না, পুরো গ্রিনল্যান্ড তছনছ করে ফেলত।'

'পরিসংখ্যান দিয়ে মেলালে হবে না,' মুরল্যান্ড বলল। 'এখন পর্যন্ত যা দেখছি, তাতে পুরো ব্যাপারটার এই একটাই ব্যাখ্যা। বিমানটাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিল, যেটা ক্র্যাশের সময় লিক করে। এজন্যই প্রথমে মেজর কনওয়ে মরেছে, আর পরে এলমার গুডজনসেন।'

'আপাতদৃষ্টিতে সেটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে অ্যামেরিকানরা হাল ছাড়ল কেন? নাহ্, মিলছে না কিছু।'

'এ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ো না। নতুন কিছু জানা গেলে তখন ভেবে দেখা যাবে। আপাতত কী করতে চাও, তা-ই বলো।'

'বোরোশিনকে আগে বরফের তলা থেকে বের করি। লাশটা জিয়ো-রিসার্চের একটা কোল্ড ল্যাবরেটরিতে রেখে এয়ারফোর্সকে খবর দেব। এতক্ষণে নিশ্চয়ই কমিউনিকেশন আবার চালু হয়েছে।'

'আর মেজর কনওয়ের ব্যাপারটা?'

'ওটার রেডিয়েশন যেহেতু কোনও বিপদ ডেকে আনছে না, আপাতত চুপচাপ থাকি। কাউকে কাছেও ঘেঁষতে দেব না। যেখানে আছে থাকুক, বেসটা সীল করে দেব। কীসের মধ্যে পড়েছি, সেটা আগে বুঝে নিই। এয়ারফোর্স লোক পাঠাবার আগ পর্যন্ত লাশটা আমাদের জিম্মায় থাকবে।'

'ঠিক আছে।'

পায়ের শব্দ হলো, স্যাম ফিরে এসেছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'জিগলার ঠিক আছে?'

'ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে,' জানাল স্যাম, মুখে বিব্রত ভাব। 'সরি, রানা। আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে জেনারেটরটা নীচে এনে খুব ভুল করেছি আমি। আরেকটু হলে মারা পড়তাম।'

'ভুলটা খুব বড় ধরনের,' বলল রানা। 'দলনেতা হিসেবে আরেকটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল আপনার। ভাগ্যগুণে প্রাণে বেঁচেছেন বটে, তবে আমাদের শিডিউলের দফারফা হয়ে গেছে। পুরো কমপ্লেক্সে ছড়িয়ে গেছে কার্বন মনোক্সাইড। আগামী চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে বাতাস পরিষ্কার হতে, ততক্ষণ এখানে কারও ঢোকা চলবে না।' কথাটা মিথ্যে, আসলে দুয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবার কথা। তবে সবাইকে বেস থেকে দূরে রাখার জন্য মিথ্যেটার আশ্রয় নিল ও।

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে,' মুরল্যান্ডও সমর্থন দিল। 'আমরা এর মধ্যে এয়ারফোর্সের সঙ্গেও যোগাযোগ করে ফেলব।'

'ঠিক আছে,' স্যাম যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। 'চলুন যাই। আমারও শরীরটা ভাল লাগছে না। শুয়ে পড়ব ভাবছি।'

'আপনি যান। আমরা বোরোশিনের লাশটা তুলে নিয়ে আসছি।'

'অসুস্থ হয়ে পড়বেন না তো?' স্যামের গলায় শঙ্কা।

'সাবধান থাকব, চিন্তা করবেন না,' রানা অভয় দিল। 'মাঝে মাঝে ওপরে গিয়ে বাতাসও খেয়ে আসব। আপনি যান।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল স্যাম।

ক্যাম্প ডিকেডে দু'ঘণ্টা কাটাল রানা আর মুরল্যান্ড, তারপর বোরোশিনের মৃতদেহ এনে ঢোকাল জিয়ো-রিসার্চ স্টেশনের কোল্ড ল্যাবে। এত সময় অবশ্য লাগেনি বরফ সরাতে, ওরা আসলে কালক্ষেপণ করেছে ভিতরের তল্লাশিতে। যত রুম

পেয়েছে, সবখানে ঢুঁ মেরেছে ওরা, কিন্তু মদ্যপ্রেমী রাশিয়ান লোকটার ফেলে যাওয়া কোনও মদের বোতলের সন্ধান পায়নি। যে ক'টা পেয়েছে, সেগুলো সব পঞ্চাশ বছরের পুরনো খালি বোতল, গ্যারাজে পড়ে আছে। অবশ্য তারপরও বোরোশিনের ওখানে যাবার এই কারণটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। লুকিয়ে মদ খেতে গিয়ে থাকলে বোতলও লুকিয়ে রেখেছে হয়তো। ওদের দুজনের পক্ষে এত বড় বেসের আর কতটুকুই বা খুঁজে দেখা সম্ভব!

কাজ শেষে মেস হলে গিয়ে দেজান জুরকিচের সঙ্গে দেখা করল রানা আর মুরল্যান্ড। বেচারা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে আছে। পরনের পারকা আর গ্লাভ খোলেনি, সামনে রাখা কাপে কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করল ওরা।

মেসের পিছন দিকে থেলমা তার কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছে। খানিক পরে ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল সে।

'ড. জুরকিচ?' বলল থেলমা। 'আমি শুনেছি আপনি আর ড. বোরোশিন কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না। আসলে প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বোঝে না।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকাল জুরকিচ। কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল, ঠোঁট থিরথির করে কাঁপছে। বহু কষ্টে আবেগটাকে চেপে রেখেছে জার্মান বিজ্ঞানী। থেলমা তার কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে বলল, 'নিজোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হলেই হেলিকপ্টারে লাশটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব আমি, মস্কোতে ফেরত পাঠাতে সবরকম সাহায্য করব।'

'সেইন্ট পিটার্সবার্গ,' নিচু গলায় শুধরে দিল জুরকিচ। 'ওর বাড়ি সেইন্ট পিটার্সবার্গে।'

'দুঃখিত, আমি জানতাম না,' বলল থেলমা। তারপর তাকাল রানাদের দিকে। 'ক্যাম্প ডিকেডে আর কাজ চালিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ?'

'হয়ে যাবে,' জানাল রানা। এই প্রথম মেয়েটার মধ্যে ওদের ব্যাপারে উদ্বেগ দেখে বিস্মিত হচ্ছে। 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টা বেসটা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আশা করি এর মধ্যে জমা হওয়া গ্যাস মিলিয়ে যাবে, যে জায়গায় ছাদ ধসেছে, সেখানেও বরফ সেট্‌ল হয়ে যাবে। কাল সকালে গিয়ে ভাঙাটা মেরামত করে নেব আমরা।'

'এমনভাবে বলছেন যেন কিছুই হয়নি,' পুরনো রুদ্রমূর্তি আবার ধারণ করেছে থেলমা। 'আমি আর জেন্স ইতোমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি, সার্ভেয়ার্স সোসাইটির সঙ্গে কথা বলে আপনাদের এক্সপিডিশনটা বাতিল করে দেব। ড. বোরোশিনের মৃত্যুর পর আর আপনাদের ঝুঁকির মধ্যে রাখতে রাজি নই আমরা।'

রানা শান্তগলায় বলল, 'এক্সপিডিশন থাকবে না বাতিল হবে, সেটা সোসাইটির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারা আমাদের ওপর হুকুম চালাতে পারেন না।'

'পারি কি না তা সময় হলেই দেখবেন,' রাগান্বিত গলায় হুমকি দিল থেলমা, তারপর গটমট করে চলে গেল অন্যদিকে।

'বিষকন্যা বোধহয় এদেরই বলে,' টিপ্পনী কাটল মুরল্যান্ড।

'চলে যাওয়াটাই বোধহয় উচিত হবে,' ভাঙা গলায় বলল জুরকিচ। 'আমার আর কিচ্ছু ভাল্লাগছে না।'

'মন শক্ত করুন,' রানা তাকে সাহস দিল। 'কোনও কাজ শেষ না করে ফেলে রাখা ঠিক না। বরং ব্যস্ত থাকলে দুঃখটাও ভুলতে পারবেন।'

'কিন্তু জিয়ো-রিসার্চ যদি জোর করে তাড়াতে চায়?'

'করুক না চেষ্টা! আমরা এত সহজে হাল ছাড়ছি নাকি? তলে তলে কী ঘটছে এখানে, বের করে ছাড়ব না?'

'ঠিক বলেছ,' মুরল্যান্ড একমত হলো।

বাকি সময়টা গাইগার কাউন্টার নিয়ে কাটাল রানা আর মুরল্যান্ড। সারফেস থেকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ক্যাম্প ডিকেডের লোকেশন চেক করল। যদিও প্রথমবার ওই একটা জায়গা ছাড়া আর কোথাও তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তারপরও ঝুঁকি নিতে চায় না ওরা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওই আগের ফলাফলটাই বহাল রইল, রেডিয়েশনের নতুন কোনও উৎস পাওয়া গেল না।

পালা করে এক-দু'ঘণ্টা পর পর মেস হলে ফিরল ওরা, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়েছে কি না জানতে। প্রতিবারই হতাশ হতে হলো। নিজোর্ড থেকে ভাঙা ভাঙা সামান্য রিসেপশন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ওদের ট্রান্সমিশন আদৌ বাইরে যাচ্ছে কি না, তা নিয়েই টেকনিশিয়ানরা সন্দিহান। সহসা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলেও মনে হচ্ছে না।

স্ট্যাটিক ডিস্টার্বেন্স থাকলেও ডিনারের পর প্রথম একটা অস্পষ্ট রিসেপশন পাওয়া গেল। মেস হলের খালি টেবিলে বসে রানা, মুরল্যান্ড আর স্যাম পোকার খেলে জুরকিচকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিল, এই সময় হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল রুমের এককোণে টেবিলের ওপর বসানো শর্ট ওয়েভ ট্রানসিভার।

'মে ডে... মে-ডে!' আতঙ্কিত একটা কণ্ঠ শোনা গেল স্পিকারে, ইন্টারফেয়ারেন্সের কারণে মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে ট্রান্সমিশন। 'জিয়ো-রিসার্চ বেস ক্যাম্প! জি... সার্চ বে... ম্প! দিস... চপার ইনবাউন্ড ফ্রম নিজোর্ড! আমরা প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েছি। টার্বাইন ফেল করেছে, ক্র্যাশ করতে যাচ্ছি। লোকেশন—ক্যাম্পের ষাট কিলোমিটার পুবদিকে। প্লিজ, জলদি সাহায্য পাঠান।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। এই ঝড়ের ভিতর হেলিকপ্টারটা বেরোতে গেল কেন? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল, আজ বোরোশিনের

টিমের ডাক্তারের আসার কথা, সঙ্গে রিসাপ্লাই।

'ইনবাউন্ড চপার,' মাউথপিস তুলে জবাব দিল রেডিও অপারেটর, 'দিস ইজ বেস ক্যাম্প। আপনার মেসেজ রিসিভ করেছি আমরা। ক্যাম্প থেকে ষাট কিলোমিটার পুবে আছেন এবং ইমার্জেন্সি ঘোষণা করছেন, কারেক্ট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। থ্যাঙ্ক গড যে শুনতে পেয়েছেন। আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব সামনে এগোতে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লোকেশন ট্রান্সমিট করে যাবো। ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি করুন।'

'হোল্ড অন, সাহায্য আসছে।'

ভেবেছিল হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে, কিন্তু মুয়েলার আর থেলমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? রেসকিউ টিম পাঠাচ্ছেন না কেন?'

'ইয়ে... আমাদের সব লোক ক্যাম্পের বাইরে,' বলল মুয়েলার, কণ্ঠে অস্বস্তি। 'তারা না ফেরা পর্যন্ত কোনও টিম অর্গানাইজ করা সম্ভব নয়।'

'এখানে যারা আছে?'

'হাতে গোণা অল্প ক'জন। তারা সবাই ক্যাম্পের ভাইটাল মেশিনারিজ কন্ট্রোল করছে, কোথাও পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্নো-ক্যাটও নেই, টিমগুলো নিয়ে গেছে।'

'ওরা সন্ধ্যা পর্যন্ত করছেটা কী বাইরে?'

'জরুরি কাজ।' সংক্ষেপে বলল মুয়েলার। 'দেরিটা এড়ানোর কোনও উপায় ছিল না, সরি।'

'তারমানে ওরা না ফেরা পর্যন্ত আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? ফিরবে কখন ওরা?'

'বিশ মিনিটের মধ্যে অন্তত একটা টিমকে আশা করছি আমি।'

'বি...ই...শ মিনিট! মি. মুয়েলার, এই আবহাওয়ায় ক্র্যাশ

ভিকটিম কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে বলে মনে হয় আপনার? বিশেষ করে একজন যখন মেয়ে? ওরা ষাট কিলোমিটার দূরে আছে... মানে তিন-চার ঘণ্টার পথ। তা ছাড়া ক্র্যাশ সাইটটা খুঁজে পাবারও একটা ব্যাপার আছে। আমাদের এখুনি রওনা হওয়া দরকার।'

দুঃখিত, মি. রানা। আমি নিরুপায়।'

রাগে সারা শরীর জ্বলছে রানার। লোকটা কী ভেবে সব স্নো-ক্যাট বাইরে পাঠিয়ে দিল? হঠাৎ জিপটার কথা মনে পড়ল ওর

'ল্যান্ড ক্রুজার! ওটা কোথায়?'

'আছে,' বলল থেলমা। 'কেন?'

'নুয়েনডর্ফ কোথায়? তাকে দিন। আমি যাবো।'

'ওকেও একটা টিমের সঙ্গে যেতে হয়েছে।'

'তা হলে চাবি দিন। আমি ড্রাইভ করতে পারব।'

এক মুহূর্ত রানার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল মুয়েলার. তারপর বলল, 'চাবি জিপের ভিতর আছে।'

দরজার পাশের র‍্যাক থেকে দ্রুত একটা লাইটওয়েট আউটার জ্যাকেট গায়ে চড়াল রানা, মুনবুট পরার সময় নেই। পায়ের স্নিকারটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। বের হবার আগে চেঁচিয়ে বলল. 'ববি, তুমি রেডিওতে থাকো। আমাকে গাইড করবে।'

'মি. রানা!' দরজার কাছে ছুটে এল থেলমা। 'আপনি এভাবে যেতে পারেন না! আমরা প্রপার সার্চ পার্টি পাঠাব।'

'শুনে খুশি হলাম,' রানা বলল। 'রেডি হলে ওরা আমাকে অনুসরণ করতে পারে। ববি, কী বললাম শোনোনি?'

'সরো হে!' ধাক্কা দিয়ে অপারেটরকে রেডিওর সামনে থেকে সরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'এটা আমাকে সামলাতে দাও।'

'আপনি যাবেন না বলছি!' হিসিয়ে উঠে হুকুম দিল থেলমা। রানার জ্যাকেটের হাতা টেনে ধরেছে।

তাকে কষে একটা চড় মারার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল রানা। মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি পড়ে গেছে, সেখানে এই মেয়ে কি না ওকে বাধা দিচ্ছে!

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও, দরজা খুলে পা রাখল বাইরে। তুমুল বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে, শরীরটা সামনের দিকে হেলিয়ে এগোতে থাকল রানা, যেন ভারি কোনও জিনিস ঠেলতে ঠেলতে যাচ্ছে। রাগান্বিত চোখে দৃশ্যটা খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল থেলমা, তারপর সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'এমন একগুঁয়ে মানুষ জীবনে দেখিনি তো!' মন্তব্য করল মুয়েলার।

'এখনও কিছুই দেখেননি,' বলল মুরল্যান্ড। 'আরেকটু বাধা দিতেন, তা হলে দেখতেন ওর চেহারা! ধরে দু'চারজনের হাত-পা ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে যেত। মানুষকে সাহায্য করার সময় কোনও রকম নিষেধ সহ্য করতে পারে না ও।'

'অদ্ভুত!'

'তাড়াতাড়ি আপনাদের সার্চ পার্টি রেডি করে ওর পিছনে পাঠান। নইলে কিন্তু খবর আছে!'

কয়েক মিনিট পর খড় খড় করে উঠল রেডিও। 'ববি, শুনতে পাচ্ছ?'

'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার, রানা। তোমার কী অবস্থা?'

'ঠাণ্ডায় নখ পর্যন্ত জমে যাচ্ছে। থার্মোমিটার বলছে টেম্পারেচার শূন্যের পনেরো ডিগ্রি নীচে।'

'ঈশ্বর সহায় হোন। কড়াইয়ে জ্বাল দিয়ে শেষে তোমাকে না গলাতে হয়!'

হেসে উঠল রানা। 'চপারের খবর কী? আর যোগাযোগ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এখনও আকাশে আছে ওটা, তবে অলটিচ্যুড কমছে

দ্রুত। পাইলটের জিপিএস অনুসারে এখনও একুশ মাইল দূরে ওরা। তোমার স্পীড কেমন?'

'বিশ ধরে রেখেছি, তবে কষ্ট হচ্ছে।'

'সাবধানে যাও। বিপদে পড়লে আমাদের জার্মান বন্ধুরা তোমাকে সাহায্য করতে খুব একটা আগ্রহী হবে বলে মনে হয় না।'

'হাহ্! এ আর নতুন কী? অবশ্য চাইলেও পারবে কি না সন্দেহ। ভিজিবিলিটি খুব খারাপ, পঞ্চাশ ফুটের বেশি দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা হলে হেলিকপ্টারটা খুঁজে পাবে কী করে?' মুরল্যান্ড শঙ্কিত।

'পাইলটকে বলো, মাটিতে পড়ার আগে যেন একটা ফ্লেয়ার ছোঁড়ে।' ক্র্যাশের পরে কেন জ্বালতে বলল না, সেটা আর ব্যাখ্যা করল না। দুর্ঘটনার পর আরোহীদের কারও পক্ষে কাজটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না—সেটা মুরল্যান্ডও জানে।

'গুড আইডিয়া। আমি এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি।'

চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে দেখে দুশ্চিন্তা ভর করল মুরল্যান্ডের মাথায়, রানার ট্রান্সমিশন দুর্বল হয়ে আসছে। ল্যান্ড ক্রুজারের রেডিওটা হেলিকপ্টারের চেয়ে অনেক বেশি নাজুক।

নির্দেশটা বুঝতে পেরেছে বলে দু'মিনিটের ভিতর জানাল পাইলট। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মুরল্যান্ড। ওরা যদি ফ্লেয়ার জ্বালেও, রানার সেটা দেখতে পাবার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। তিনশো ফুটে নেমে এসেছে হেলিকপ্টারটার উচ্চতা, অথচ ও এখনও পাঁচ থেকে দশ মাইল দূরে।

'রানা, পাইলট অ্যাক্‌নলেজ করেছে। সময়মত ফ্লেয়ার ছুঁড়বে সে। আশা করছে আরও পাঁচ মিনিট ভেসে থাকতে পারবে আকাশে। তুমি চোখ-কান খোলা রাখো। ঠিক আছে?'

জবাব নেই কোনও।

'রানা, তুমি শুনতে পেয়েছ?'

এখনও নীরব অপরপ্রান্ত।

মেস হলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুরল্যান্ড। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে নিঃসঙ্গভাবে জ্বলছে ওদের ক্যাম্পের কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট। সেই আলোয় বাতাসের তাণ্ডব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তুষার এমনভাবে উড়ছে যেন টর্নেডোর কবলে পড়েছে। ভয় জাগানো শোঁ শোঁ আওয়াজ তো আছেই। অন্তত চল্লিশ মাইল বেগে বইছে ঝড়। রানার জন্য দুশ্চিন্তা হলো ওর। সেই সঙ্গে এ-ও আশা করল, পাইলটকে যেন বাঁচিয়ে আনে। তা হলে ব্যাটার কানদুটো মলে দেবে খুব ভাল করে। এই আবহাওয়ায় কোন বুদ্ধিতে সে হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়েছে?

'পঞ্চাশ ফুট! ফ্লেয়ার ছুঁড়ছি এখন।' শোনা গেল পাইলটের গলা। কয়েক সেকেন্ড পর ভেসে এল তার আর্তচিৎকার, শুনে শিউরে উঠল মেসে বসা সবাই।

মাইক্রোফোন তুলে চেঁচাল মুরল্যান্ড, 'রানা! চপার ক্র্যাশ করেছে। আই রিপিট, চপার ক্র্যাশ করেছে। তুমি ফ্লেয়ারটা দেখতে পেয়েছ?'

এখনও চুপ রানা।

'রানা, তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

নিরুত্তর।

পরের আধঘণ্টা টানা চেষ্টা চালিয়ে গেল মুরল্যান্ড, কিন্তু কোনও লাভ হলো না। রানা হারিয়ে গেছে।

চোদ্দো

রটারডাম, হল্যান্ড।

মরচে পড়া ট্যাঙ্কার, বাল্ক ক্যারিয়ার আর কন্টেইনার শিপের মাঝখানে *সী এম্প্রেস* এমনভাবে ভাসছে যেন জাঙ্কইয়ার্ডের মাঝখানে একটা রোলস রয়েস পার্ক করে রাখা হয়েছে। জাহাজটার সারা শরীর ধবধবে সাদা রঙের, তাতে কালো আর সোনালিতে নকশা কাটা হয়েছে। ক্যাটামারান আকারে ডিজাইন করা হয়েছে শিপটা, দুটো বিশালাকার হাল জোড়া দেয়া হয়েছে প্রকাণ্ড কয়েকটা উইং দিয়ে। মাঝখানের গ্যাপটা ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন রকমের বোট, প্যাসেঞ্জার লাইনার আর জেট-স্কি নামানো-ওঠানোর জন্য। একেকটা হালের দৈর্ঘ্য এক হাজার ফুট, চওড়া নব্বুই ফুটের মত। আটতলা উঁচু সুপারস্ট্রাকচার ব্যস্ত বন্দরের স্কাইলাইন পাল্টে দিয়েছে। সেগুলোর ওপরে বিরাট বিরাট টুইন ফানেল আছে, ডগায় অ্যারো-ডাইনামিক উইং লাগানো, একেকটা প্রাইভেট জেটের ডানার তুলনায় কোনও অংশেই ছোট নয়।

চার হাজার যাত্রী ধরে সী এম্প্রেসে, ক্রু'র সংখ্যাও প্রায় কাছাকাছি—তিন হাজার। অনেকগুলো বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জাহাজটা: যেমন, রেস্টুরেন্টের সংখ্যা—ঊনচল্লিশটা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্যাসিনো রয়েছে ভিতরে, রয়েছে চার গর্তের একটা পুরোদস্তুর গলফ কোর্সও। জাহাজটা বানাতে প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে, এই রেকর্ড সহজে কেউ ভাঙতে

পারবে বলে মনে হয় না।

এবারের যাত্রায় যাঁরা জাহাজটায় ভ্রমণ করবেন, তাঁরা সবাই জাগতিক মোহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার শপথ নিলেও কংক্রিটের পিয়ারে বাঁধা এই বিশাল জাহাজটাকে দেখে বিস্ময় লুকোতে পারবেন না। সী এম্প্রেস শুধু একটা যন্ত্র নয়, মানুষের তৈরি শিল্পকর্মের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা।

ইউনিভার্সাল কনভোকেশনের কড়া নিরাপত্তার কারণে জেটিতে তেমন ভিড় নেই। পুরো শিপের দৈর্ঘ্য জুড়ে সেখানে সারি ধরে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীরা। স্টারবোর্ড সাইডের উন্মুক্ত পানিতে টহল দিচ্ছে হারবার প্যাট্রোল বোট, মাথার উপর কয়েকটা মিলিটারি হেলিকপ্টার ব্যস্ত মিডিয়া চপারগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে। যদিও এখন পর্যন্ত এই ধর্মীয় মহাসম্মেলনের ব্যাপারে কোনও হুমকি আসেনি, তারপরও নিরাপত্তায় সামান্য ছাড় দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। সারা পৃথিবীর নজর এখন ইউনিভার্সাল কনভোকেশনের দিকে, দুর্ঘটনা ঘটলে তা সামাল দেয়া সম্ভব হবে না। অভ্যাগত অতিথি ছাড়া এখন আর কারও জাহাজে চড়া সম্ভব নয়. হাজারটা ভেরিফিকেশন করে এক সপ্তাহ আগেই ক্রু'দের তুলে ফেলা হয়েছে। সেই থেকে প্রতিদিন বোমার খোঁজে ট্রেনিং পাওয়া কুকুর দিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে গোটা জাহাজ।

শিপটাকে এই মহাসম্মেলনের জন্য ঠিকঠাক করা আর এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল এক জটিল এবং কঠিন কাজ। তবে সূচারুভাবেই তা সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন সতর্কতার সঙ্গে চলছে বোর্ডিঙের আনুষ্ঠানিকতা। পোপ থেকে শুরু করে একেবারে ছোট স্তরের ব্যক্তিগত সহকারী পর্যন্ত সবাইকে এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা, আর্চ আকারের গোপন একটা মেটাল ডিটেক্টরের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁদের. ধর্মীয় লকেটের চেয়ে বড় কোনও ইস্পাতের জিনিস হলেও তারস্বরে অ্যালার্ম বাজাচ্ছে

সেটা। এ ছাড়া অত্যাধুনিক কেমিক্যাল-স্নিফিং ডিভাইসও আছে, সামান্যতম গানপাউডারের উপস্থিতিও ধরতে পারে সেটা। কেউ যদি সিরামিক পিস্তল নিয়ে মেটাল ডিটেক্টরকে ধোঁকাও দেয়, বুলেটের বারুদ তাকে ধরিয়ে দেবে।

আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, পোপের দেহরক্ষী বাহিনী সুইস গার্ড ছাড়া আর কেউ অস্ত্র বহন করতে পারবে না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল শিখদের একটা দলকে নিয়ে, তারা ঐতিহ্যগতভাবে সবসময় সঙ্গে একটা কারুকাজ করা ছোট ছুরি রাখে। অবশ্য ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াল না পোপের হস্তক্ষেপের কারণে, তিনি সবার ঐতিহ্যকে সম্মান করেন। ঘটনা জানতে পেরে স্মিত হেসে শিখদের ছুরি রাখার অনুমতি দিয়েছেন তিনি।

জেটিতে স্থাপন করা একটা চেক পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছে রাফায়েল রাসমুসেন। তার কাজ মাস্টার লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে স্বল্পপরিচিত অতিথিদের জাহাজে ওঠার ব্যবস্থা করে দেয়া। একটা কম্পিউটার রয়েছে তার কাছে, সেখানে অতিথিদের কমপক্ষে এক বছরের পুরনো ছ'টা করে ছবি রয়েছে—প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা উৎস থেকে সংগ্রহ করা। চেহারা মিলিয়ে পরিচয় নিশ্চিত হচ্ছে সে।

এই মুহূর্তে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, মধ্যবয়েসী এক লোক। পরনের ঝকমকে কোটটার দাম রাসমুসেনের তিন মাসের বেতনের চেয়ে বেশি হবে। মুখের চামড়া রোদে পোড়া, দাঁতগুলো অবিশ্বাস্য রকমের সাদা, হাতে হীরে বসানো একটা রোলেক্স ঘড়ি পরেছে, হাতের কড়ে আঙুলে শোভা পাওয়া আংটিটাও হীরের। কানের ওপরে পাতলা হয়ে আসা ধূসর চুল দেখে বোঝা যায়, মাথার তালু ইতোমধ্যে গড়ের মাঠ হয়ে গেছে, যদিও কুচকুচে কালো একটা উইগ পরে সেটাকে ঢেকে রেখেছে লোকটা। অবাক হলো রাসমুসেন—যে লোক সুট, ঘড়ি, আংটি আর দাঁত পালিশে এত টাকা খরচ করে, সে এমন হাস্যকর একটা পরচুলা পরেছে

কেন? পরমুহূর্তে কারণটা ধরতে পেরে মনে মনে হাসল সে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে লোকটা। তবে শুধু টাকা থাকলেই রুচি বদলায় না।

ভদ্রলোকের কনুই আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে তার স্ত্রী, সে এক দেখার মত দৃশ্য! কোনওকালে হয়তো সুন্দরী ছিল মহিলা, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে ফেলেছে বয়সের সঙ্গে অবিরাম লড়াই। স্বামীর চেয়ে খুব একটা কম হবে না তার বয়স, কিন্তু বার বার ফেস লিফটিঙের কারণে চামড়া ড্রামের মত টান টান হয়ে আছে—যেন মাংসবিহীন খুলির ওপর সেঁটে বসানো হয়েছে ওটা। কাঠামোটা কাঁচা হাতে তৈরি মোমের পুতুলের মত। নকল পাপড়ির পিছনে চোখদুটো ফোলা ফোলা, মুখে এমন বিচ্ছিরিভাবে মেকাপ মেখেছে যেন ওটা বর্ণান্ধ শিল্পীর আঁকা কোনও ছবি। চুলগুলো সোনালি, মাথার ওপর পাহাড়ের মত উঁচু করে বাঁধা হয়েছে। ছিপছিপে দেহ নিঃসন্দেহে অপারেশনের টেবিলে গড়া। অন্তত ভারি নিতম্ব আর সুডৌল বুক সেটাই বলছে, দেহের সঙ্গে একেবারেই বেমানান ওগুলো। ড্রেসটা খুব টাইট, পিছনটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সিলিকন দিয়ে ফোলানো স্তনদুটোও অবাধ্য হয়ে উঠেছে, ব্লাউজের বিশাল গলা দিয়ে লাফিয়ে উঁকি দিতে চায় যেন। যৌবন বহু আগে পেরিয়ে গেলেও নিজেকে তরুণী সাজানোর এ এক হাস্যকর প্রচেষ্টা।

এক হাতে একটা ছোট্ট পিকেনিজ কুকুর ধরে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা, তার স্বামী পাসপোর্টগুলো বাড়িয়ে ধরল। গ্যাব্রিয়েল আর জুলিয়া হিলার—ন্যাশভিল, টেনেসি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে। মুখ তুলে এই অদ্ভুত জুটিকে খানিক জরিপ করল রাসমুসেন।

'কী ভাবছ, বুঝতে পারছি, বাছা,' সাদা দাঁত বের করে অমায়িক একটা হাসি দিল হিলার, টিভিতে পারফর্ম করতে করতে তার মধ্যে একটা মেকি ভাব এসে গেছে। এমনভাবে কথা বলছে

যেন সামনে দশ হাজার শ্রোতা আছে। 'টেলিভিশনের পর্দায় আমার ধর্মপ্রচার দেখেছ তুমি। সামনাসামনি পেয়ে নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছ না, তা-ই না?'

'হানি, এখানে আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয় না,' পাশ থেকে ন্যাকা গলায় বলল জুলিয়া। 'ইয়োরোপে কেউ ইংরেজিতে কথা বলে না, এটা জানো না? অনুষ্ঠান দেখে বুঝবে কী করে?' নিজের জ্ঞানের দৌড় ফাঁস করে দিচ্ছে মহিলা। 'তোমরা এখনও মুক্তির বাণী শোনোনি, তা-ই না ডিয়ার?' রাসমুসেনের দিকে মদির হাসি দিল সে।

'শুনবে না কেন?' হিলার মানতে রাজি নয়। 'আমরা স্যাটেলাইটে সম্প্রচার করি।'

'তা হলে হয়তো শুনেছে।'

অ্যামেরিকান দম্পতির বিরক্তিকর কথাবার্তায় কান না দিয়ে কম্পিউটারে নামগুলো টাইপ করল রাসমুসেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছবি উদয় হলো স্ক্রীনে। বেশিরভাগই পাবলিসিটি শট—মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে হিলার, জুলিয়া পিছনে হাসিমুখে তাকে সমর্থন জানাচ্ছে। ডায়াসে বড় করে লেখা—*মিরাকল অভ জিসাস ক্রিশ্চিয়ান মিনিস্ট্রি*। বছরখানেক আগে মিসেস হিলারের স্তনদুটো আরও ছোট ছিল লক্ষ করে মুচকি হাসল রাসমুসেন।

ভ্রূ কুঁচকে স্ক্রীনে উঁকি দিল জুলিয়া। ছবি দেখে হাহাকারের মত বলল, 'সুইট জিসাস! এ তো আমার বুকের অপারেশনের আগের ছবি!'

স্ত্রীর পিঠে চাপড় দিয়ে হিলার বলল, 'শান্ত হও, ডার্লিং। শান্ত হও!'

কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে পাসপোর্টের পুরনো এন্ট্রিগুলো চেক করল রাসমুসেন। ক্যারিবিয়ানে বেশ কয়েকবার গেছে হিলার দম্পতি, সম্ভবত ওটা তাদের নিয়মিত ছুটি কাটানোর জায়গা। অবশ্য গত ছ'মাস কোথাও যায়নি তারা। পাসপোর্টগুলো ফিরিয়ে

দিল সে। 'সী এম্প্রেসে স্বাগতম!' বলে তাড়াতাড়ি গ্যাঙওয়ে দেখিয়ে দিল। এদের ধারেকাছে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে নেই।

লাইনে দাঁড়ানো পরবর্তী ভদ্রলোক একজন যাজক, একা এসেছেন। কালো আলখাল্লা, গলায় চেইনে ঝোলানো রূপার ক্রুশ আর আবক্ষ দাড়ি দেখে বোঝা গেল, তিনি ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের একজন প্রিস্ট। বেশ লম্বা, ছ'ফুটের ওপরে হবে; মুখটা যেন পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে, এতটাই কাঠিন। রাশান একটা পাসপোর্ট বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

পাতা উল্টে নামটা পড়ল রাসমুসেন—ফাদার আন্তন নভোস্কি। পাসপোর্ট বলছে, হল্যান্ডে আসার আগে জার্মানি গিয়েছিলেন তিনি। কম্পিউটারে বোতাম টিপে ছবি বের করল সে, সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিত্ববান যাজকের সঙ্গে মেলাল। বেশ ক'বছর আগে ইস্তানবুলের একটা সমাবেশে তোলা হয়েছে ছবিগুলো, তখনকার তুলনায় এখন দাড়িতে পাক ধরেছে বেশি, তবে চেহারা আর অভিব্যক্তি আগের মতই তীক্ষ্ণ। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা আছে, সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল রাসমুসেন। তাড়াতাড়ি পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

কাঁধে ঝোলানো জীর্ণ চামড়ার ব্যাগে বইটা ভরে গ্যাঙওয়ে ধরে এগোলেন নভোস্কি। শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এসে হিলার দম্পতিকে পাশ কাটালেন তিনি, তারা পোষা কুকুরটাকে প্রস্রাব করানোয় ব্যস্ত। একপাশে দেয়ালের দিকে পিছনের এক পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পশুটা, মেঝেতে বিছানো লাল গালিচার অনেকখানি ইতোমধ্যে ভিজিয়ে ফেলেছে। স্বামী-স্ত্রী'র কাণ্ড দেখে বিতৃষ্ণায় মুখ কোঁচকালেন নভোস্কি, বিন্দুমাত্র ভব্যতা বলে কিছু নেই এদের মধ্যে। ভাবতে কষ্ট হয়, একই ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন তাঁরা।

এম্বারকেশন পয়েন্টের দিকে এগিয়ে গেলেন নভোস্কি.

অ্যামেরিকান দম্পতিকে নিয়ে মাথা ঘামালেন না। শিপে না ওঠা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছেন না। সারাক্ষণ ঘামছেন তিনি, সেটা যত না কড়া রোদে কালো পোশাকের জন্য, তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায়। কোনও দিকেই মনোযোগ দিতে পারছেন না এ কারণে। জেটিতে পৌঁছে কমবেশি সবাই অন্তত একবার সী এম্প্রেসের অপরূপ সৌন্দর্য দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু তিনি দাঁড়াননি। দ্রুত পা চালিয়েছেন, একই সঙ্গে দৃষ্টি রেখেছেন সশস্ত্র গার্ডদের প্রতি।

গ্যাংওয়ের মাথায় দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা তরুণী অ্যাটেনডেন্টকে টিকেট দেখালেন নভোস্কি। রুটিনবাঁধা একটা স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে মেয়েটা বলল, 'আপনার কেবিন নম্বর ই-৪২৯, ফাদার। ওটা স্টারবোর্ড হালে। সোজা ভিতরে চলে যান। প্রথম এইট্রিয়াম, মানে সেন্ট্রাল হলে পৌঁছুলে ডানে একটা চওড়া হলওয়ে পাবেন, দুটো হালকে সংযুক্ত করা একটা উইঙের ভিতর দিয়ে গেছে ওটা। ওপাশে আরেকটা এইট্রিয়াম আছে, সেখানকার অ্যাটেনডেন্ট আপনাকে কেবিনে যাবার পথ আর এলিভেটর দেখিয়ে দেবে।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু স্বরে বললেন নভোস্কি, কাঁধের ব্যাগটা এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন যেন সুযোগ পেলেই ভদ্রতা দেখানোর অজুহাতে হাসিখুশি অ্যাটেনডেন্ট সেটা কেড়ে নেবে।

প্যাসেজওয়ে ধরে দ্রুত হাঁটলেন তিনি, এইট্রিয়ামে পৌঁছে সামান্য থামলেন বিশাল হলঘরটা দেখার জন্য। মাথার ওপর কাঁচের তৈরি গম্বুজ আছে ওটার, আপার লেভেলের ব্যালকনি থেকে ফুল আর লতাঝাড় এমনভাবে ঝুলছে যেন এটা ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। কয়েক মুহূর্ত সেগুলোর শোভা উপভোগ করে আবার হাঁটা শুরু করলেন তিনি, উইঙের ভিতর দিয়ে যাওয়া হলওয়েটা খুঁজে বের করলেন, তারপর স্টারবোর্ড হালের দিকে রওনা হলেন। যেতে যেতে অন্যান্য অনেক যাত্রী চোখে পড়ল—বেশিরভাগই পুরুষ, পৃথিবীতে ধর্মীয় নারী ব্যক্তিত্বের

সংখ্যা হাতে গোনা। তারপরও মহিলা যাত্রী আছে বেশ কিছু, এরা সবাই ধর্মীয় নেতাদের স্ত্রী বা সফরসঙ্গী—গ্যাব্রিয়েল হিলারের মত গোঁ ধরে তাদেরকে সঙ্গে আনার অনুমতি আদায় করা হয়েছে।

দ্বিতীয় এইট্রিয়ামে গিয়ে টিকেট দেখাতেই অ্যাটেনডেন্ট নভোস্কিকে একটা এলিভেটর ব্যাঙ্ক দেখিয়ে দিল, সেটা ধরে সবচেয়ে নীচের প্যাসেঞ্জার ডেকে গিয়ে নির্ধারিত কেবিনটা পাওয়া গেল। কক্ষটা বেশি বড় নয়, জাহাজের ইনার সাইডে পড়েছে, ছোট্ট পোর্টহোল দিয়ে দুই হালের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া পানি দেখা যাচ্ছে। ইঞ্জিন রুমটা এখান থেকে খুব কাছে সম্ভবত, সারাক্ষণ গুম গুম শব্দে কেবিন কাঁপছে। তবে রুমের আকার, পোর্টহোলের দৃশ্য বা ইঞ্জিনের একঘেঁয়ে শব্দ নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই ফাদার নভোস্কির। তাঁর অ্যান্টিক কাঠের সিন্দুকটা কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আগেই পৌঁছে দেয়া হয়েছে কেবিনে, এই মুহূর্তে মেঝেতে রয়েছে ওটা, রুমের অনেকখানিই দখল করে ফেলেছে। বিছানায় বসে ডালার তালাটা পরীক্ষা করলেন নভোস্কি, জোর করে খোলার কোনও আলামত দেখা যাচ্ছে না। কী ধরনের সিকিউরিটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সিন্দুকটাকে আসতে হয়েছে জানেন না তিনি, ভয়টা সেজন্যই। ভিতরে লুকানো জিনিসটার অস্থিত্ব টের পেয়ে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তেমন কোনও সদুত্তর দিতে পারবেন না তিনি।

পিতলের একটা চাবি দিয়ে ডালাটা খুলে ফেললেন ফাদার নভোস্কি। সিন্দুকটা এমনভাবে তৈরি, হঠাৎ দেখায় মনে হয় সাধারণ একটা কাঠের বাক্স, ওজনও সেই সাক্ষ্যই দেবে। তবে ভিতরের অংশে রয়েছে আসল কৌশল, ইস্পাতের চেয়েও শক্ত অ্যালয় দিয়ে করা ইন্টেরিয়রের বাইরে কাঠের হালকা একটা লেয়ার দেয়া হয়েছে। দেখলে মনে হয় সাধারণ একটা কাঠের বাক্স। আসলে ওটার তলায় একটা গোপন কম্পার্টমেন্ট রয়েছে। ওজনের কোনও হেরফের দেখা দেয়নি, অ্যালয়ের পরিমাণটা

এমনভাবে দেয়া হয়েছে, ওজন করলে ওই মাপের একটা নিরেট কাঠের সিন্দুকের ওজন পাওয়া যাবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তলা থেকে এক জোড়া গ্লাভ, একটা হুড, একটা আলখাল্লা আর একটা মেটাল ফ্লাস্ক বের করলেন নভোস্কি, সবই বিশেষভাবে তৈরি করা। গ্লাভগুলো মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের শিকল দিয়ে বানানো দস্তানার মত, পার্থক্য হচ্ছে এ দুটো সম্পূর্ণ সোনায় তৈরি। একেকটার ওজন তিন পাউন্ড। অভিজ্ঞতা থেকে নভোস্কি জানেন, ভারি গ্লাভগুলো পরে কাজ করতে খুব অসুবিধে হয়।

এরপর আছে হুডটা। ওটাও সোনার চেইনে গড়া, চোখের জায়গাদুটো ফাঁকা। অবশ্য বিশেষভাবে তৈরি দুটো ফ্ল্যাপ আছে, চাইলে চোখ সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলা যায়। হুডের আগের মালিকের মাথা নভোস্কির চেয়ে বেশ কিছুটা বড় ছিল, এ কারণে ওটা পরতে তেমন বেগ পেতে হয় না। জিনিসটা সরিয়ে রেখে তৃতীয় আইটেমটার ওপরে নজর দিলেন ফাদার, এটা সম্প্রতি তাঁর হাতে এসেছে।

আলখাল্লাটার ওজন নব্বুই পাউন্ড, সীসার প্রলেপ দেয়া সুতো দিয়ে বোনা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, জিনিসটার কোমর থেকে গলা পর্যন্ত অংশে ছোট ছোট পকেট করে তাতে সীসার টুকরো ভরে সেলাই করে দেয়া হয়েছে। হাতাগুলোয় সীসার রিং ভরে দেয়ায় এটা পরে নড়াচড়া করতে খুব অসুবিধে হয়। ফাদার নভোস্কি আক্ষেপ করলেন, ব্রাদারহুড যদি আলখাল্লাটা সোনা দিয়ে বানাতে পারত, তা হলে কতই না ভাল হতো! তবে সেটা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না। তাঁদের সংঘের অত টাকা নেই। যে মিশন নিয়ে তাঁরা মাঠে নেমেছেন, সেটা ব্যর্থ হলে অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে।

এবার ফ্লাস্কটার দিকে নজর দিলেন ফাদার নভোস্কি। পুরু স্টেইনলেস স্টীলের তৈরি ওটা, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সিন্দুকটার প্রায়

সমান, উচ্চতা এক ফুটের মত। ভিতরের অর্ধেকটা ভরে আছে তরলে, নড়লেই ছলাৎছল করছে। তরলটা চড়া দামে একটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট থেকে কিনে আনতে হয়েছে।

সবগুলো আইটেম ঠিকঠাক আছে দেখে নীরবে সৃষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ফাদার। কোনওকিছু খোয়া যায়নি, লম্বা সফরে ক্ষতিগ্রস্তও হয়নি। আস্তে আস্তে সব আবার সিন্দুকের তলায় রেখে ওপরটা কাপড়চোপড়ে ঢেকে দিলেন তিনি। হঠাৎ দরজায় টোকার শব্দ শুনে চমকে উঠলেন।

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড অসম্ভব জোরে শব্দ করছে, আতঙ্ক ভর করল নভোস্কির মধ্যে। ধরা পড়ে যাচ্ছেন? সুইস গার্ডরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছে? কিন্তু কেন? কেউ গোপন খবর ফাঁস করে দিয়েছে, নয়তো এরা সিন্দুকটার এক্স-রে করেছে। নইলে কোনও কিছু জানবার কথা নয় কারও। কী করবেন এখন? শেষ মুহূর্তে এসে ব্যর্থ হবেন?

কেন, ঈশ্বর? কেন? মনে মনে হাহাকার করলেন ফাদার। আমি তো তোমার কাজ করতেই এসেছি, তা হলে কেন এই বাধা?

আবারও টোকা পড়ছে দরজায়। তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ডালায় তালা লাগালেন তিনি। ইংরেজিতে বললেন, 'এক মিনিট, প্লিজ!' উত্তেজনায় গলা ভেঙে গেল।

'ফাদার নভোস্কি?' দরজার ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'আমি পারসারের অফিস থেকে এসেছি। দয়া করে দরজা খুলুন।'

'আমি টয়লেটে,' গলা চড়িয়ে বললেন নভোস্কি, কিছুটা সময় পেতে চেষ্টা করছেন। এই অবস্থা থেকে মুক্তির কোনও উপায় আছে কি না, দেখতে হবে।

ভেবে কোনও কূল পেলেন না তিনি, ছোট্ট কেবিনটা থেকে দরজা ছাড়া বেরুনোর আর ব্যবস্থা নেই। পোর্টহোলটা বড্ড

ছোট। ফাঁদে পড়ে গেছেন তিনি। কী আর করা, ঈশ্বরের হাতে ভাগ্যকে সঁপে দিলেন। ওপাশে ক'জন আছে বলা মুশকিল, চেষ্টা করলে তাদের মেরে ফেলা যাবে কী? শক্তি, সাহস আর প্রতিপক্ষকে চমকে দেয়ার সুযোগ আছে তাঁর হাতে। যে বিশাল দায়িত্ব নিয়ে তিনি এ জাহাজে এসেছেন, তা সফল করার জন্য দু'একটা খুন করলে কোনও অসুবিধে নেই। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন নভোস্কি, বিনা যুদ্ধে হার মানবেন না।

ধীরে ধীরে দরজা খুললেন তিনি, ওপাশের অবস্থা যাচাই করে আক্রমণ চালাতে সম্পূর্ণ তৈরি। কিন্তু পাল্লার ফাঁক দিয়ে অপরপক্ষকে দেখতে পেয়ে স্নায়ুতে ঢিল দিতে হলো। হাসি পেল তাঁর, কী ভয়টাই না পেয়েছিলেন!

পার্সারের ইউনিফর্মে ফুল হাতে নিষ্পাপ চেহারার এক হাস্যোজ্জ্বল তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে যেতেই বাড়িয়ে ধরল তোড়াটা। 'ফাদার নভোস্কি, জাহাজের তরফ থেকে এটা আপনার জন্য উপহার। কিছু মনে করবেন না, কেবিনটায় কোনও অসুবিধে বোধ করছেন না তো?'

'নাহ্!'

'করলে নির্দ্বিধায় জানাবেন। আসলে সেইলিঙের প্রস্তুতির সময় আপনার বিশপ... মানে বিশপ আকিনফিভ জানিয়েছিলেন, সবচেয়ে নীচের ডেকে থাকতে আপনার কোনও আপত্তি নেই। সেজন্যই এখানে আপনাকে দেয়া হয়েছে।'

'আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

'তারপরও ফুল দিয়ে সাজালে কেবিনটা আরও ভাল লাগবে। ভিতরে আসব?'

'লাগবে না,' তাড়াতাড়ি বললেন নভোস্কি। 'তুমি বরং পাশের কেবিনে ফুলগুলো দিয়ে এসো।'

'সবাইকেই দেয়া হচ্ছে, ফাদার। এ নিয়ে ভাববেন না।'

'অ! তা হলে আমিই নিচ্ছি, ধন্যবাদ।' তোড়াটা নিয়ে

পার্সারকে বিদায় দিলেন নভোস্কি। বুকের মধ্যে এখনও হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, বড্ড নার্ভাস হয়ে আছেন তিনি।

অবশ্য স্বস্তিতে থাকারও কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ না ভ্যাটিক্যানের ফিরিয়ে দিতে চাওয়া আইকনটা তিনি হাতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ শান্তিতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। শুধু হাতে পেলেই চলবে না, জিনিসটার ভিতরে যা লুকানো আছে, তারও অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নভোস্কি জানেন, আইকনের মাঝখানটায় উঁকি দেয়ার সময় সামান্য ভুল করলে তাঁর প্রাণ চলে যাবে। কিন্তু এই মিশন সফল করার জন্য তিনি তাতেও রাজি আছেন।

নিজের ভিতরে টানটান উত্তেজনা অনুভব করে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ফাদার—স্যাটানস্ ফিস্টের গোমর কেন ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতাকে পাগল করে দিয়েছিল। মাত্র একটা আইকনের জন্যই নভোস্কির এই অবস্থা, অথচ গ্রেগোরি এফিমোভিচকে পঞ্চাশটা আইকন নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে জিনিসটা ফেরত পেতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে, কিন্তু নিজেকে তিনি সামলাতে পারবেন তো? ইতোমধ্যেই টেনশন আর উত্তেজনা তাঁকে কুরে কুরে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

ফাদার নভোস্কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

পনেরো

গ্রিনল্যান্ড।

হেলিকপ্টারের মরতে বসা ইঞ্জিনের গগনবিদারী আওয়াজ আর তুষারঝড়ের প্রবল হুঙ্কার ছাপিয়ে লিয়া নোভাকের কানে বাজছে দাদুর কথাগুলো। 'গ্রিনল্যান্ডে যাও, প্রিন্সেস। ওখানে তুমি নিরাপদে থাকবে।'

আগে কখনও ড. রাইমুন্ড নোভাকের কথা এভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে কি না, মনে করতে পারল না ও।

আরেকবার ঝাঁকি খেল চপার, এমনভাবে নীচে নেমে এল যে রেস্ট্রেইনিং হারনেস মাংস কেটে বসে গেল শরীরে। তরুণ ড্যানিশ পাইলট প্রাণপণে যুদ্ধ করছে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে আকাশে ভাসিয়ে রাখতে, তবে তার শক্ত হয়ে যাওয়া চোয়াল আর দৃষ্টিতে বাসা বাঁধা আতঙ্ক বলে দিচ্ছে—লড়াইটাতে জয়ের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নিজোর্ডের আবহাওয়াবিদ যে ঝড়টা আগামী ছ'ঘণ্টার মধ্যে আঘাত হানবে না বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল, সেটাই এখন সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করে চারপাশে তাণ্ডব ঘটাচ্ছে।

জীবনে হেলিকপ্টারে চড়ার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে লিয়ার, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে—জিয়ো-রিসার্চের ক্যাম্পে পৌঁছুতে পারবে না ওরা। ঝড়টা খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে দুষল ও—এই অবস্থায় শিপ ছেড়ে রওনা হবার জন্য। দুষল বেপরোয়া পাইলটকে—এই

ঝড়কে চ্যালেঞ্জ করার মত দুঃসাহস দেখানোর জন্য। দুষল দাদুকেও—সেবাস্টিয়ান গ্রাবের খুনীদের খোঁজার বদলে ওকে জোর করে গ্রিনল্যান্ডে পাঠানোর জন্য।

সেদিন একটা ঘোরের মধ্যে ইসমানিং থেকে ফিরেছিল ও. পথটা কীভাবে পাড়ি দিয়েছে ঠিক বলতে পারবে না। তবে যা ভোলেনি তা হলো—বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের অসহায় চেহারা, গোলাগুলি আর ব্যথাটা। ডাক্তার হিসেবে মানুষের জীবন বাঁচানোয় জীবন উৎসর্গ করেছে লিয়া, কিন্তু সেদিনের সেই টরচারের দৃশ্য ওর সমস্ত শিক্ষা আর আদর্শের বুকে ছুরি মেরে দিয়েছে যেন। অজ্ঞাত খুনীদের খুঁজে বের করে শায়েস্তা করার একটা প্রচণ্ড জেদ বাসা বেঁধেছিল মনে, দাদুর জন্য পারল না।

পুরো একটা দিন বিশ্রামের পর ড. নোভাককে ফোন করেছিল ও, সব ঘটনা খুলে বলেছিল। সোনার চেয়েও বড় একটা রহস্য এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে গ্রাবের ইঙ্গিত শুনে অবাক হয়েছিলেন দাদু। মাসুদ রানাকেও চেনেন না তিনি।

'এই নাম আগে কখনও শুনিনি,' বলেছিলেন ড. নোভাক। 'কে সে?'

'গ্রাব বললেন, এক সপ্তাহ আগে কে নাকি ফোন করে তাকে বলেছিল রানার সাহায্য নিতে,' জানিয়েছিল লিয়া। 'ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না। কে হতে পারে লোকটা? তোমাদের মত কোনও নাৎসি হান্টার নয়তো?'

'হলেও আমার পরিচিত নয়। কে জানে, হয়তো নতুন এসেছে এই কাজে।'

'যে-ই হোক, মি. গ্রাব দেখলাম খুব আত্মবিশ্বাসী এই রানার ব্যাপারে। নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়েছিল। তবে প্যান্ডোরা প্রজেক্টের ব্যাপারটা বুঝলাম না। তুমি জানো কিছু?'

'নাহ্। হতে পারে কোনও লুটপাটের অপারেশনের নাম অবশ্য লুটের জিনিস লুকানোরও প্রজেক্ট হতে পারে। ভুলে যেয়ো

না, গ্রাব সৈনিক নয়, ইঞ্জিনিয়ার ছিল। হয়তো নাথসিদের ধনসম্পদ রাখার মত কোনও গোপন বিল্ডিং-টিল্ডিং তৈরি করেছিল। অস্ট্রিয়ার লবণ খনিতে এ ধরনের ট্রেজার চেম্বার পাওয়া গেছে অতীতে।'

ট্রেজারের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল লিয়া। জানতে চেয়েছিল, 'এখন তা হলে কী করব আমরা?'

'কিছুই না,' শান্ত গলায় জবাব দিয়েছিলেন ড. নোভাক। 'আমি আর সেমিল গবেষণা চালিয়ে যাবো আগের মত। তুমি যাবে ওই গ্রিনল্যান্ডের অভিযানে। তর্ক কোরো না, নিজেই তো বললে—খুনীরা তোমার চেহারা দেখেছে। নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিচ্ছে তোমার ব্যাপারে। ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। গ্রিনল্যান্ডে যাও, প্রিন্সেস। ওখানে তুমি নিরাপদে থাকবে। এই ফাঁকে আমি ওই খুনীদের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি। তুমি যতদিনে ফিরবে, ততদিনে পুলিশের কাছে গিয়ে প্রোটেকশন চাওয়ার মত যথেষ্ট প্রমাণ জোগাড় করে ফেলব আমি।'

পরের আধঘণ্টা তর্ক করেছে লিয়া, কিন্তু টলাতে পারেনি দাদুকে। প্রফেসর ড্রেশেল আর ফ্রাউ হার্জও তাঁকে সমর্থন দেয়ায় জার্মানি ছাড়তে একরকম বাধ্যই হয়েছে ও। অবশ্য উরুর ক্ষতটা শুকানোর জন্য কয়েকটা দিন সময় নিয়েছে রওনা হবার আগে, টিম লিডারকে শুধু জানিয়েছিল যে একটা দুর্ঘটনার কারণে সময়মত আসতে পারছে না।

বিমানে কুলুসুক পর্যন্ত এসেছে লিয়া, সেখান থেকে একটা চপারে নিজোর্ড পর্যন্ত, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে তারপর আবার রওনা দিয়েছে রিসার্চ স্টেশনের দিকে। পরিস্থিতি নিয়ে যত না ভাবছে ও, তারচেয়ে বেশি ভাবছে দাদুকে নিয়ে। তিনি যখন জানতে পারবেন, ওঁর কথামত গ্রিনল্যান্ডে আসায় মারা গেছে লিয়া, কী ভয়ানক আঘাতই না পাবেন তিনি! নিজেকে সামলাতে পারবেন তো?

'ওরা আমাদের রেসকিউ করতে লোক পাঠাচ্ছে,' হেডফোনে পাইলটের চিৎকার শুনতে পেল লিয়া। 'তবে চপারকে লোকেট করার জন্য একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়তে হবে। পারবেন আপনি?'

'পারব। কোথায় আপনার ফ্লেয়ার?'

'আপনার সীটের নীচে একটা ইমার্জেন্সি প্যাক আছে, ওতে পাবেন।'

কো-পাইলটের আসনে বসে আছে লিয়া, হেলিকপ্টারটা একটু স্থির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর শোল্ডার রেস্ট্রেইন্টের বাঁধন ঢিলে করে হাত বাড়াল নীচে। প্লাসটিকের একটা বাক্সে আঙুল লাগল ওর, কিন্তু ঠিক তখুনি প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল চপার। উবু হয়ে থাকা অবস্থায় সামনের দিকে হুমড়ি খেল লিয়া, কন্ট্রোল প্যানেলে জোরে ঠুকে গেল মাথা। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল ও।

'আপনি ঠিক আছেন?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল পাইলট।

মাথার তালুতে হাত দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না দেখল লিয়া। বলল, 'না, তেমন কিছু হয়নি। আপনি চপারটাকে একটু স্থির রাখার চেষ্টা করুন, নইলে বাক্সটা বের করতে পারছি না।'

'যা করছি এই-ই বেশি।'

'তাও দেখুন পারেন কি না।'

'আচ্ছা।'

পাইলট কিছুটা সফল হওয়ায় দ্বিতীয় চেষ্টায় কমলা রঙের কেসটা বের করে আনতে পারল লিয়া। ঢাকনা খুলে একটা ফায়ারিং টিউব আকারের ফ্লেয়ার বের করে আনল, তলায় কর্ড লাগানো—সেটা ধরে টান দিলে জ্বলে ওঠে জিনিসটা।

জানালার কাঁচ খোলার প্রস্তুতি নিল লিয়া। 'কখন ছুঁড়তে হবে জানান।'

'না, না, এখানে না!' আঁতকে উঠল পাইলট। 'আমার নাইট ভিশনের বারোটা বেজে যাবে।'

'তা হলে কোথায়?'

হাত মুঠো করে বুড়ো আঙুল তুলে পিছনের কার্গো কম্পার্টমেন্টটা দেখিয়ে দিল পাইলট। ওখানে সাইডডোরের গায়ে একটা জানালা রয়েছে, সেখান দিয়ে ফ্লেয়ার ফায়ার করা যাবে।

'ঠিক আছে,' বলে সেফটি বেল্ট আর হেডফোন খুলে ফেলল লিয়া।

বাতাসের তোড়ের কারণে হেলিকপ্টারটার কোনও ফ্লাইট প্যাটার্ন নেই, বলের মত তাকে নিয়ে লোফালুফি করছে প্রবল ঝড়। মধ্যাকর্ষ ওকে দেয়াল বা ছাদের সঙ্গে বাড়ি খাওয়া থেকে বাঁচাবে না, তাই সাবধানে এগোতে হলো। দক্ষ পর্বতারোহীর মত সারাক্ষণ তিনটে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টে দুহাত আর এক পা বাধিয়ে রাখল লিয়া, অন্য পা'টা বাড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে নিজের সীট ছেড়ে কার্গো হোল্ডে পৌঁছুল ও, দেয়ালে পিঠ আর এক পা ফিউজলাজে আঁটা একটা শেলফের গায়ে ঠেকিয়ে থামল।

হেডফোনটার তার এ পর্যন্ত আসবে না বলে খুলে রেখে আসতে হয়েছে। চারপাশের ভয়ানক আওয়াজের মাঝে পাইলট ওর গলা শুনতে পাবে কি না নিশ্চিত হবার জন্য ডাকল, 'আমার কথা শোনা যায়?'

'হ্যাঁ। অপেক্ষা করুন, আমি সঙ্কেত দেব।'

যতক্ষণ ইঞ্জিনটা সচল আছে, ততক্ষণ ঝড়টাকে ফাঁকি দিয়ে নিরাপদে ল্যান্ডিঙের একটা সুযোগ থাকে। অবশ্য শুধু ল্যান্ডিং করলেই চলবে না, বরফের ওপর দু-এক ঘণ্টার বেশি টিকে থাকার মত কোনও প্রস্তুতি নেই ওদের, উদ্ধার করা না গেলে ঠাণ্ডায় জমে মরবে। এই আবহাওয়ায় রেসকিউ টিমটা কতখানি সফল হবে, সেটা সন্দেহের বিষয়। তবে এ নিয়ে বেশি ভাবল না ও, আগে নিরাপদে সারফেসে নামা যাক, পরে বাকিটা ভাবা যাবে। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা শুরু করল লিয়া। এতে মনে যেমন শান্তি আসে, সাহসও পাওয়া যায়। আগেও কয়েকবার বিপদে পড়ে স্রষ্টাকে ডেকে রক্ষা পেয়েছে ও। সুইটজারল্যান্ডের এইগার

পর্বতে চড়ার সময় একবার রশি ছিঁড়ে গিয়েছিল, আরেকবার পেরুতে হোয়াইট ওয়াটার র‍্যাফটে নদীভ্রমণের সময় ভেলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ভয়াবহ স্রোতে পড়ে গিয়েছিল। দুবারই বেঁচে গেছে ও, প্রার্থনার জোরেই কি? হতেও পারে! লিয়া খুব ভাল করে জানে, শারীরিক আর মানসিক দক্ষতাই শুধু একজন অভিযাত্রীর জন্য যথেষ্ট নয়। সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, তা হলো ভাগ্য। আর সেটা একমাত্র ওপরঅলাই দিতে পারেন।

ওপরদিকে হাত বাড়িয়ে প্লেক্সিগ্লাসের ছোট জানালাটা খুলে ফেলল লিয়া, ফোকর দিয়ে ধেয়ে আসা মাতাল বাতাসের ধাক্কায় একটু বেসামাল হয়ে গেল। বাতাসটা এমনভাবে ঢুকছে যেন হেলিকপ্টারের ভিতরে নিম্নচাপ বিরাজ করছে। শেলফে রাখা চিঠির বান্ডিলটা উল্টে পড়ল মেঝেতে, সেদিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি এল ওর।

দুর্ভাগ্য তাড়া করে ফেরা গত কয়েকটা দিনে এটা হলো নিয়তির সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস। বান্ডিলটা যখন হেলিকপ্টারে তোলা হলো, তখনই সবচেয়ে ওপরের খামে প্রাপকের নামটা দেখেছে ও—মাসুদ রানা। সেবাস্টিয়ান গ্রাব সম্পূর্ণ অপরিচিত যে লোকের নাম বলেছে, লিয়ার গ্রিনল্যান্ড অভিযানে সেই লোকের উপস্থিতি কোনও অবস্থাতেই কাকতালীয় হতে পারে না। তখন থেকে মনের ভিতর প্রচণ্ড রাগ দানা বেঁধে উঠেছে ওর—সাজানো নাটকে ওকে গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বুঝতে পেরে। জানা দরকার নাটের গুরুটা কে—সেবাস্টিয়ান গ্রাব, তার খুনীরা, রহস্যময় স্নাইপার নাকি মাসুদ রানা স্বয়ং?

ঝড়ের কবলে পড়ার আগে একটা চিন্তাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ওকে—রহস্যটার জড় খুঁজে বের করতে হবে।

পাইলটের ডাকে ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। 'তৈরি হোন!'

সোজা হয়ে জানালার ফোকর দিয়ে ফ্লেয়ারসহ হাত বের করে দিল লিয়া, হ্যান্ডগ্লাভ খুলে ফেলেছে, যাতে কর্ডটা ধরতে সুবিধে

হয়। একে রাত, তার ওপর প্রচণ্ড ঝড়, বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এক দিক দিয়ে বরং ভাল। ক্র্যাশটা ঘটার সময় চোখে দেখবে না কিছু, অহেতুক আতঙ্ক শরীর ও মনকে আড়ষ্ট করে ফেলবে না।

'এখন!'

পাইলট চিৎকার করে অর্ডার দিতেই কর্ড ধরে হ্যাঁচকা টান দিল লিয়া, টিউবের মুখ উড়ে গেল, কমলা রঙের একটা জ্বলন্ত গোলা উল্কার মত ছুটে গেল আকাশের দিকে, তীব্র আলো ছড়াচ্ছে।

এর ঠিক দশ সেকেন্ড পর মাটিতে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টার, স্কিডদুটো দুমড়ে মুচড়ে গেল বাড়ি খেয়ে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি লেগেছে ভিতরে, লিয়ার মনে হলো তার শিরদাঁড়ায় ভারি একটা স্লেজহ্যামার চালিয়েছে কেউ, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ব্যথায়। মোমেন্টামের কারণে আকাশযানটার নাক সামনে ঝুঁকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে রোটর ব্লেড ছোবল বসালো মাটিতে, নরম বরফ কেটে ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। নরম অংশটা শেষ করে পাথরের মত শক্ত বরফে বাড়ি খেতেই বিশ্রী আওয়াজ হলো, একে একে প্রত্যেকটা ব্লেডের ডগা বিকট শব্দে ভেঙে গেল। ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেল চপারের, একপাশে কাত হয়ে ধুপ করে পড়ল। উড়ে গিয়ে কার্গো হোল্ডের দরজায় বাড়ি খেল লিয়া, শেলফ থেকে বাঁধন ছিঁড়ে আসা বাক্স আর কার্টনের তলায় চাপা পড়েছে শরীর।

ঘূর্ণায়মান মেইন শাফটের গায়ে এখনও লেগে থাকা ভাঙা ব্লেডগুলো এবার বামপাশের সারফেসে ঘষা খাচ্ছে, টেফলনের কোটিং দেয়া টুকরো ফুলকি হয়ে ছিটকে যাচ্ছে চারপাশে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছোট্ট টেইল রোটরটাও মাটি স্পর্শ করল, বরফের গায়ে কামড় বসাতে না পেরে ভেঙেচুরে ছিটকে গেল লেজ থেকে। কয়েকটা টুকরো হেলিকপ্টারের ফিউজলাজ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল—এর মধ্যে একটা লিয়ার এত কাছ দিয়ে গেল যে

ওর গায়ে বাতাস পর্যন্ত লাগল। ভয়ে চিৎকার করে উঠল ও।

ফুয়েল শেষ হতেই থেমে গেল ইঞ্জিন, চপারটা ধ্বংস হয়ে যাবার গগনবিদারী আওয়াজের জায়গা দখল করল ঝড়ের উন্মত্ত গর্জন। লিয়ার কানে প্রবল আক্রোশে আঘাত করল সেটা। খানিকক্ষণ মড়ার মত পড়ে রইল ও, বেশ ব্যথা পেয়েছে। কাত হওয়া চপারের দরজার ওপর শুয়ে নিজের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখল। আশ্চর্য হলেও সত্যি—সামান্য কাটাছেঁড়া ছাড়া আর কোনও বড় আঘাত নেই শরীরে, হাড্ডিও ভাঙেনি। শরীরের ওপর পড়ে থাকা মালামাল সরানো চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না। একটা সরায় তো আরেকটা এসে পড়ে—যেন চোরাবালিতে আটকেছে, মুক্তির চেষ্টা করলে আরও তলিয়ে যাচ্ছে। হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল কিছু সময়।

পাইলটের কোনও সাড়াশব্দ নেই। গলা উঁচিয়ে লিয়া ডাকল, 'এই যে! শুনতে পাচ্ছেন? আপনি ঠিক আছেন তো?'

ডাকতে ডাকতে গলা ব্যথা করে ফেলল ও, কিন্তু জবাব পেল না। একটাই কারণ হতে পারে—পাইলট আর নেই, সংঘর্ষে মারা পড়েছে বেচারা। কান্না এসে যাচ্ছিল, নিজেকে শাসন করে সেটা রুখল লিয়া। এখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে সব আশা শেষ। শক্ত হয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

শরীরের ওপর পড়ে থাকা বাক্সগুলো ধীরেসুস্থে, বুঝেশুনে সরাতে শুরু করল ও, চারপাশে ব্যালেন্স ঠিক রেখে একটার ওপর একটা সাজাচ্ছে, যাতে আবার গায়ের ওপর এসে না পড়ে। তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করতে হবে। ককপিটে একটা ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে, তারমানে ব্যাটারিটা কাজ করছে এখনও, ওটার সাহায্যে রেডিওতে বেস ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। দেরি হলে সর্বনাশ—ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবে, রেডিও আর অন করা যাবে না।

বিশ মিনিটের মাথায় নিজেকে প্রায় মুক্ত করে আনল লিয়া,

কিন্তু ভাগ্য বোধহয় এ যাত্রায় ওকে সহায়তা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ককপিটে যাবার আগেই বার কয়েক মিটমিট করে নিভে গেল আলোটা, ব্যাটারি শেষ। নিকষ অন্ধকার ছেয়ে ফেলল চপারের অভ্যন্তর। শুধু তা-ই নয়, হঠাৎ এক ঝলক দমকা হাওয়ার ধাক্কায় কেঁপে উঠল ফিউজলাজ, সুন্দর করে সাজানো সমস্ত বাক্স আর মালামাল আবার হুড়মুড় করে পড়ে চাপা দিল ওকে।

এবার কেঁদে ফেলল লিয়া, শুরুতে যেটুকু আশার আলো দেখতে পেয়েছিল, তা ক্রমেই নিভে আসছে। ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগের উপায় নেই। রেসকিউ টিম এই প্রবল ঝড়ের মধ্যে কিছুতেই ওকে খুঁজে পাবে না। তারপরেও হার মানতে চায় না মন, চোখে পানি নিয়ে আবার শরীরের ওপর থেকে বাক্স আর মালামাল সরাতে শুরু করল ও।

একঘণ্টার মাথায় মুক্তি পেল লিয়া। কার্গো হোল্ড থেকে বেরিয়ে প্রথমেই পাইলটের অবস্থা দেখে নিল—সত্যি মারা গেছে লোকটা, চপারের শরীর ভেদ করে চলে যাওয়া টেইল রোটরের একটা টুকরো তার পাঁজর ফুটো করে দিয়েছে। এবার ফিউজলাজের চারপাশে ঘুরে ফুয়েল লিক আছে কি না চেক করল ও, তবে কোনওরকম গন্ধ পেল না। সম্ভবত সেলফ-সিলিং ফুয়েল ব্লাডারগুলো টিকে গেছে। কার্গোর মধ্যে এবার তল্লাশি চালাল লিয়া, ভাগ্য আরেকটু প্রসন্ন হয়ে উঠল কয়েকটা ক্যান ভর্তি রান্নার তেল আর কিছু কম্বল পেয়ে—এগুলো জিয়ো-রিসার্চ ক্যাম্পের রি-সাপ্লাইয়ের জন্য নেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয় একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়ে হোল্ডে ফিরে এল ও, ভিতরে নিজের জন্য একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিল। কাপড় ছিঁড়ে সলতে বানিয়ে তেল দিয়ে আগুন জ্বালল, তারপর গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুরু হলো চুপচাপ অপেক্ষার পালা। ঘুমানো যাবে না, জানে ও। ঘুমালে একটা ক্যান শেষ হলে নতুন করে আগুন

জ্বালানো হবে না, সেক্ষেত্রে করাল থাবা বসাবে ঠাণ্ডা, ঘুমন্ত মানুষটাকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে দেবে মৃত্যুর দুয়ারে।

প্রথম আধঘণ্টা কষ্ট করে জেগে রইল লিয়া, প্রথম পাত্রটার তেল শেষ হলে দ্বিতীয়টাও জ্বালল। কিন্তু তারপরেই ক্লান্তি এসে ছেঁকে ধরল ওকে। আগুন নেভার দশ মিনিট আগে একেবারেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। খানিক পরে গ্রিনল্যান্ডের হিমশীতল আবহাওয়া ঢুকে পড়ল কার্গো হোল্ডে, তাপমাত্রা নেমে গেল মাইনাস পনেরো ডিগ্রি ফারেনহাইটে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে শুরু করল লিয়া।

এভাবে একটা ঘণ্টা কাটল। তারপর হঠাৎই কিছু একটার শব্দে জেগে উঠল ও। কারণটা ধরতে পারল না তৎক্ষণাৎ। গায়ের ওপর বরফের একটা আস্তর পড়ে গেছে, হাত-পা ঠিকমত নাড়াতে পারছে না। ফ্রস্টবাইট আক্রমণ করেছে গাল, নাকের ডগা, কানসহ দেহের সব উন্মুক্ত জায়গায়। ক্লান্তি আরও ভাল করে জেঁকে ধরেছে, লিয়া বুঝতে পারছে—ও মরতে বসেছে। ঘুমটা ভাঙায় রাগ হলো খুব। ভালই তো ছিল, নিজের অজান্তে চলে যাচ্ছিল মৃত্যুর অতল গহ্বরে। কী দরকার ছিল জেগে উঠে কষ্টটা অনুভব করার! ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস—হেলিকপ্টার ক্র্যাশটা মরতে দেয়নি ওকে, রেখে দিয়েছে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়ে তিলে তিলে মরার জন্য।

আচমকা একটা গন্ধ পেয়ে নাক কোঁচকাল ও। বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ওটা। পুরুষালি... হ্যাঁ, আফটারশেভের গন্ধই তো। এখানে কোত্থেকে এল? হেসে ফেলল লিয়া—মরার আগে মরীচিকা হানা দিচ্ছে ওর সামনে, তবে সেটা দেখার নয়, শোঁকার জিনিস!

'কিছু মনে করবেন না, ডা. নোভাক। হাসলে আপনাকে ঠিক অপ্সরার মত দেখায়।'

গলাটা শুনে চমকে উঠল লিয়া, মাথা ঘুরিয়ে হাসিমুখে এক

যুবককে নিজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ভাঙা ককপিট গলে ভিতরে ঢুকেছে মানুষটা, সেই শব্দেই ঘুম ভেঙেছে ওর। ঝড়ের মাঝ দিয়ে এসেছে বলে তার গায়ে তুষারের আস্তর, তারপরও হাতে ধরা ফ্ল্যাশলাইটের আভায় চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। রোদে পোড়া তামাটে চামড়া যুবকের, দারুণ সুদর্শন। মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, কিন্তু ঠোঁটের কোণে উঁকি দিচ্ছে নিষ্ঠুর একটা ভাব. অথচ মুখের চেহারা হাসিখুশি। দেখলেই মনে হয় মানুষটার ওপর আস্থা রেখে নিরাশ হতে হবে না।

'চমৎকার একটা আবাস গড়েছেন দেখছি,' হাসল যুবক, কম্বল আর তেলের ক্যান দেখছে। 'থেকে যেতে চাইলে অবাক হবো না, তবে আমার ল্যান্ড ক্রুজারে গেলে বোধহয় আরও আরাম পাবেন। ওখানে হিটার আছে, ক্যাম্পেও এক ঘণ্টার ভিতর পৌঁছে দিতে পারব।'

'কে আপনি?' কোনওমতে জিজ্ঞেস করল লিয়া।

'আমার নাম মাসুদ রানা। আপনি ঠিক আছেন তো? ফ্রস্টবাইট দেখতে পাচ্ছি... আর কোনও অসুবিধে?'

মাথা নাড়ল লিয়া। ঠাণ্ডায় মুখটা জমে গেছে বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, নইলে বিস্ময়টা লুকাতে পারত না। এই লোকটাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে ও! মনের ভিতর যেসব প্রশ্ন সাজিয়ে রেখেছিল, তা এই মুহূর্তে করা সম্ভব নয়, অবাক চোখে শুধু তাকিয়ে রইল উদ্ধারকর্তার দিকে। লোকটা শত্রু না বন্ধু জানে না লিয়া, তবে এটা বুঝতে পারছে—সে ওর মৃত্যু কামনা করে না। করলে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওকে বাঁচাতে আসত না। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রানা, পরম নির্ভরতায় সেটা আঁকড়ে ধরল লিয়া, উঠে দাঁড়াল। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে খুব, পায়ে শক্তি পাচ্ছে না। রানা ওকে আলগোছে দুহাতে তুলে নিয়ে চপার থেকে বেরিয়ে এল।

জিপটা কাছেই দাঁড়ানো, সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে প্যাসেঞ্জার সীটে বসালো রানা, সীটবেল্ট আটকে দিল।

'রিল্যাক্স, ডা. নোভাক! শীঘ্রি ক্যাম্পে পৌঁছে যাব আমরা।'

আশ্বাসটা শুনে অস্ফুট গলায় ধন্যবাদ জানাল লিয়া। ড্রাইভিং সীটে চড়ে বসল রানা, গিয়ার বদলে ফিরতি পথ ধরল। মনের মধ্যে স্বস্তি; পৌঁছুতে যা সময় লেগেছে ওর, কাউকে জীবিত দেখতে পাবে বলে আশা করেনি। ভাগ্যিস দ্বিতীয় ফ্লেয়ারটা জ্বেলেছিল মেয়েটা, নইলে কিছুতেই খুঁজে পেত না চপারটা। ডা. নোভাকের ওপর শ্রদ্ধা এল ওর—একটা দুর্ঘটনার পর মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা সাধারণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

পাশে ভারি নিশ্বাস শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। লিয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এ-ঘুম শান্তির, এ-ঘুম স্বস্তির।

ষোলো

সারা রাত তাণ্ডব চালানোর পর ভোর হবার সামান্য আগে থেমে গেল ঝড়। সূর্য উঠতে না উঠতে মুরল্যান্ডকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল রানা, চুপিসারে একটা স্নো-ক্যাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্র্যাশ সাইটের উদ্দেশে, জায়গাটা ভাল করে দেখবে।

ঘণ্টাখানেক জিপ চালিয়ে লিয়াকে নিয়ে ক্যাম্পে ফেরার পর মাত্র দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পেরেছে রানা। সেটা মোটেই যথেষ্ট নয়। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসায় ক্লান্তি বরং আরও বেড়ে গেছে। ড্রাইভিঙের দায়িত্বটা তাই মুরল্যান্ডের হাতে সঁপে পাশের সীটে বসে ঝিমোতে থাকল ও।

বুদ্ধি করে ল্যান্ড ক্রুজারের জিপিএস দেখে ক্র্যাশ সাইটের ল্যাটিচ্যুড আর লঙ্গিচ্যুড মার্কিং করে রেখেছিল রানা, নইলে জায়গাটা আবার খুঁজে পেতে জান খারাপ হয়ে যেত। তবে স্নো-ক্যাটের গতি জিপের চেয়ে অনেক কম বলে গন্তব্যে পৌঁছুতে বেশ সময় লেগে গেল।

কাঁধে মুরল্যান্ডের টোকায় চোখ খুলল রানা।

'ওঠো হে!'

'পৌঁছে গেছি?' হাই তুলে জানতে চাইল রানা।

'তর সইছে না বুঝি?' মুরল্যান্ড হাসল। 'আগেই বলেছিলাম বাথরুমটা সেরে এসো। আমি কিন্তু রাস্তার পাশে গাড়ি থামাতে পারব না!' কৌতুক করছে সে।

'তা হলে ভিতরেই কল ছেড়ে দিই?' রানাও হাসছে।

সামনে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটা দেখেই মুরল্যান্ডের মুখ থেকে হাসি অদৃশ্য হলো। 'সর্বনাশ! এই ক্র্যাশ থেকে জীবন্ত রক্ষা পেয়েছেন ভদ্রমহিলা?'

'হুঁ।' থেমে গেছে স্নো-ক্যাট, দরজা খুলে বাইরে নামল রানা। দু-একটা ভাঙা টুকরো ছাড়া ক্র্যাশ করা হেলিকপ্টারের চারপাশের সবই তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে, যেন ধবধবে একটা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ধ্বংসস্তূপের উপর। শরীর জাগিয়ে থাকা আকাশযানটা দেখা না গেলে বোঝাই যেত না কত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এখানে।

ককপিটের দিকে এগিয়ে গেল ও। রোটর ব্লেডের একটা ভাঙা অংশ পাঁজরে বিঁধে মারা গেছে পাইলট, রক্ত জমে বরফে পরিণত হয়েছে জায়গাটা, লোকটার দৃষ্টি বিস্ফারিত। লাশের দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়ল রানা, কিছুই করার ছিল না ওর, তাড়াতাড়ি পৌঁছুলেও লাভ হতো না। ক্র্যাশের সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে লোকটা।

ককপিটের ঠিক বাইরেই বরফের উপর বেশ কিছু পায়ের ছাপ

দেখা যাচ্ছে। মুরল্যান্ড বিস্মিত গলায় বলল, 'ইন্টারেস্টিং!'

'কী হয়েছে?'

'পায়ের ছাপ। রাতে যখন এলে, তখন কি ছিল এগুলো?'

'এতকিছু দেখার সময় ছিল না,' বলল রানা। 'চারপাশে রীতিমত কেয়ামত চলছিল।'

'এগুলো তোমার পায়ের ছাপ না,' বলল মুরল্যান্ড। 'জিপ থেকে আসার ট্র্যাকটা সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলো দেখছি হেলিকপ্টারের চারপাশ ঘুরে এসেছে।'

'কী ভাবছ, বলো তো?'

'আমাদের আগেই কেউ ক্র্যাশ সাইটটা দেখতে আসেনি তো?'

'এসে থাকলে গেল কোথায়? আমাদের ছাড়া তো আর কারও ট্র্যাক দেখছি না।'

'হয়তো ঢেকে দিয়ে গেছে,' আন্দাজ করল মুরল্যান্ড।

'অতি-কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'এত লুকোচুরির আছেটা কী এখানে?'

'হয়তো ছিল, এখন আর নেই। সরিয়ে ফেলতেই এসেছিল।'

'সেক্ষেত্রে চপারের চারপাশের ট্র্যাকগুলোই বা মুছল না কেন? নাহ্ ববি, খামোকা সন্দেহ করছ। আমার মনে হয় এগুলো ডা. নোভাকের পায়ের ছাপ। ক্র্যাশের পর বেরিয়ে এসে চারপাশটা ঘুরে দেখেছেন, পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য। আমি হলেও তা-ই করতাম।'

'যুক্তি আছে বটে। কী জানি, তোমার কথাই হয়তো ঠিক।'

'এসো, পাইলটের লাশটা বের করে আনি,' বলল রানা। 'তা ছাড়া জিনিসপত্রও যা উদ্ধার করা যায়, নিয়ে যেতে হবে। চপারটা আমাদের রি-সাপ্লাই নিয়ে আসছিল, জরুরি অনেক কিছু নিশ্চয়ই আছে।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট খেটে সমস্ত কাজ সারল ওরা। প্রথমে

পাইলটের লাশটা ককপিট থেকে বের করে এনে প্লাস্টিকের তারপুলিনে পেঁচাল। তারপর কার্গো হোল্ড থেকে মালামাল বের করতে শুরু করল। স্নো-ক্যাটের ভিতরে যতকিছু আঁটে, সব নিল ওরা, লিয়ার লাগেজও। তারপর বেস ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল। এবার রানা ড্রাইভ করছে।

মেইল বাকেট তুলে নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করল মুরল্যান্ড। হঠাৎই হেসে উঠল সে।

'কী হলো?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'আমার মেইল,' বলল মুরল্যান্ড। 'ওয়াশিংটন থেকে ল্যারি কিং ফরোয়ার্ড করে দিয়েছে।' নুমার কম্পিউটার এক্সপার্ট ল্যারি, রানা আর মুরল্যান্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে।

'তাতে হাসির কী হলো?'

'কী পাঠিয়েছে, জানো? *প্লেবয়* পত্রিকার সাব্‌সক্রিপশন ফর্ম আর ট্রাফিক পুলিশের দেয়া ওভারস্পিডিঙের টিকেট—আমার নামে! ফাজিলটাকে আমার গাড়িটা ধার দিয়ে এসেছিলাম।'

রানাও হেসে ফেলল। 'শুধু শুধু পাঠাতে গেল কেন? ও চাইলে তো পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কম্পিউটার থেকে তোমার ক্রিমিনাল রেকর্ডও মুছে দিতে পারে।'

'জ্বালাচ্ছে, বুঝলে? গত মাসে ওর গাড়ি নিয়ে একবার ঘষা লাগিয়ে ফেলেছিলাম তো!' বান্ডিলটা আবার ঘেঁটে দেখল মুরল্যান্ড। 'আরে, তোমারও তো একটা চিঠি আছে।'

'কার লেখা?'

'কী জানি! রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চ থেকে ফরোয়ার্ড করা। এসেছে মিউনিখ থেকে।'

'মিউনিখ!' অবাক হলো রানা। পরমুহূর্তে সেই রহস্যময় ই-মেইলটার কথা মনে পড়ল—নিউ ইয়র্ক ছাড়ার আগে যেটা পেয়েছিল। জার্মানি থেকে কিছু ম্যাটেরিয়াল পাঠানোর কথা—এগুলোই বোধহয়। জাকির ফরোয়ার্ড করে দিয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে দেখতে হবে কী আছে ওর ভিতরে।

ওরা যখন ক্যাম্পে ফিরল, তখন ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। মেস হলের কাছাকাছি গিয়ে স্নো-ক্যাট থামাল রানা, জটলাটা এগিয়ে এল ওদের দিকে। সবার সামনে আছে স্যাম ষ্যামসে, লিয়াকেও দেখা গেল, সে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। জটলার পিছনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে থেলমা আর মুয়েলার, রানা আর মুরল্যান্ডকে ফিরতে দেখে তারা খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।

'ডাইনীটা একটা ঝামেলা পাকাবে বলে মনে হচ্ছে,' বলল মুরল্যান্ড।

'আসতে দাও, কী আর করতে পারবে?' রানা বলল। তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা। উঁচু গলায় সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'গুড মর্নিং, এভরিওয়ান! কিছু চাই আপনাদের? মেইল বা খাবার-দাবার?'

ভিড় ঠেলে সরোষে এগিয়ে এল থেলমা। কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'মি. রানা! এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আপনি বিনা অনুমতিতে একটা ভেহিকল নিয়ে বাইরে গেছেন। কী শুরু করেছেন আপনি!'

'এত খেপছেন কেন?' কণ্ঠে মধু ঝরাল রানা, প্রতিপক্ষকে রাগিয়ে দিচ্ছে। 'আমি তো দুবারই আপনাদের কাজ করে দিলাম। আপনার তো ধন্যবাদ জানানো উচিত।' মেয়েটার হামবড়া ভাব দেখে ওর মনে সন্দেহ জাগছে, অভিযানটার নেতৃত্ব বোধহয় আর মুয়েলারের হাতে নেই।

'কথা ঘোরাবেন না!' থেলমা চেঁচিয়ে উঠল।

'চুপ করবেন আপনি?' এবার রানার সমর্থনে গলা চড়াল স্যাম। 'রানা না থাকলে ডা. নোভাকের কী হতো, ভেবে দেখেছেন?'

'উনি কী করেছেন না করেছেন সব জানি আমি,' বলল

থেলমা। 'কিন্তু এটা একটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন, কাউবয়ের মত হিরো সাজার জায়গা নয়। সবকিছুর একটা নিয়ম আছে, শৃঙ্খলাভঙ্গ কখনও মেনে নেয়া যায় না। আমি সার্ভেয়ার্স সোসাইটিতে অফিশিয়ালি কমপ্লেন করব, যাতে খুব শীঘ্রি আপনাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।' কথা শেষ করে উল্টো ঘুরল সে, গটমট করে হেঁটে চলে গেল।

থেলমা দৃষ্টিসীমার আড়ালে যেতেই এগিয়ে এল মুয়েলার। রানাকে বলল, 'কাল রাতে যেভাবে ঝুঁকি নিয়েছেন, সেটা একদম উচিত হয়নি। তবে আমি কৃতজ্ঞ। গোটা টিমের সবার দায়দায়িত্ব আমার, ডা. নোভাক মারা গেলে বিবেকের দংশনে জর্জরিত হতাম।'

'হুঁ, দেখা যাচ্ছে আপনাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি দু'রকম,' বলল রানা। 'কিন্তু কারটার দাম বেশি?'

সরাসরি জবাব দিল না মুয়েলার। বিষণ্ন গলায় বলল, 'দুঃখিত, কমপ্লেন করা থেকে সম্ভবত ঠেকাতে পারব না থেলমাকে।' ঘুরে চলে গেল সে-ও।

স্যাম এসে দাঁড়াল রানার পাশে। 'এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। রেডিও কমিউনিকেশনটা চালু হোক, সোসাইটিকে আমরাই সব বুঝিয়ে বলব।'

'আমি এতটা নিশ্চিত হতে পারছি না,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'ম্যাক্সিম বোরোশিনের মৃত্যু, তার ওপর আবার হেলিকপ্টার ক্র্যাশ... ড্যানিশ সরকার গোটা এক্সপিডিশনটাই ক্যানসেল করে দিলে অবাক হবো না।'

'কী বললেন... ম্যাক্সিম বোরোশিন মারা গেছেন?' বিস্মিত গলায় বলে উঠল লিয়া, সে যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি ওরা।

ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'দুঃখিত, ডা. নোভাক। আপনাকে জানানো হয়নি, মি. বোরোশিন গতকাল ভোরে একটা

দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।'

'কী আশ্চর্য!' লিয়ার চেহারায় একটা বিমূঢ় ভাব। 'আমার টিম লিডারই মারা গেলেন?'

'আমরাও কম অবাক হইনি,' বলল স্যাম। 'হাই! আমি স্যামুয়েল র‍্যামসে, সার্ভেয়ার্স সোসাইটির টিম লিডার।'

'লিয়া নোভাক,' দায়সারা ভঙ্গিতে হাত মেলাল লিয়া, কুশল বিনিময়ের মত আনুষ্ঠানিকতায় ওর মন নেই।

মুরল্যান্ডও এগিয়ে এসে পরিচিত হলো।

এবার রানার পালা। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ও বলল, 'কাল রাতের কথা মনে আছে কি না জানি না। আমি মাসুদ রানা।'

'জী, মনে আছে,' লিয়া হাসল। 'ঝড়ের মধ্যে আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন। অনেক সাহস আপনার!'

'সাহস না, দুঃসাহস,' রানা বলল। 'বোকামিও বলতে পারেন। ওই আবহাওয়ায় কেউ বাইরে বেরোয় না।'

'সেজন্যেই তো প্রাণে বাঁচলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ইউ আর ওয়েলকাম,' হাত মেলাল রানা, ভাল করে দেখল লিয়াকে। 'হুঁ, দেখা যাচ্ছে ওটা ফ্রস্টবাইট ছিল না।'

নিজের গাল আর নাকে হাত বোলাল লিয়া, ত্বক স্বাভাবিক রং ফিরে পেতে শুরু করেছে। 'আপনি আরেকটু দেরি করলেই হতো। হাতে কী আপনার?'

ম্যানিলা খামটা ধরে রেখেছে রানা। জানাল, 'কিছু না। আমার অফিস থেকে কাগজপত্র এসেছে বোধহয়।'

'অ!' মাথা ঝাঁকাল লিয়া। 'আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আর বিরক্ত করব না। গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

'না, না, ক্লান্ত নই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'গল্প করতে পারব। আপনার শরীর কেমন? কোনও অসুবিধা?'

'মাথাটা ধরেছে খুব। পাইলটের কথাও ভুলতে পারছি না। কিন্তু আমার কথা বাদ দিন... মি. বোরোশিনের কথা বলুন।

কীভাবে মারা গেলেন ভদ্রলোক?'

'ক্যাম্প ডিকেডের ভিতরে বরফ ধস নেমেছিল। উনি চাপা পড়ে গিয়েছিলেন।'

'ক্যাম্প ডিকেড!' লিয়ার কপালে ভ্রূকুটি। 'উনি ওখানে কী করছিলেন? ওটা তো আপনাদের প্রজেক্ট।'

'এটা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না,' স্বীকার করল রানা।

জিয়ো-রিসার্চের লোকজন স্নো-ক্যাট আনলোড করছে। মুরল্যান্ড বলল, 'পাইলটের লাশটা... ওটা কোল্ড স্টোরেজ ল্যাবে রাখতে হবে। রানা, তুমি আসবে?'

'নিশ্চয়ই,' রানা বলল। 'ডা. নোভাক... আপনি গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

'আমাকে লিয়া বলে ডাকলে খুশি হবো।'

'ঠিক আছে... লিয়া। আপনি যান। পরে কথা হবে।' স্যামের দিকে ফিরল রানা। 'এয়ারফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে? তা হলে ক্যাম্প ডিকেডের লাশটাও এখনই তুলে আনি।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল স্যাম। 'রেডিও এখনও মরা।'

'ক্যাম্প ডিকেডের লাশ মানে?' লিয়া চলে যেতে গিয়ে থমকে গেল।

'ও... আপনাকে তো বলা হয়নি, ক্যাম্পের ভিতর আরেকটা লাশ পেয়েছি আমরা। এক এয়ারফোর্স পাইলটের, তিপান্ন সালে তার প্লেন ক্র্যাশ করেছিল।'

'এখানে এল কীভাবে?'

'সেটা আরেক রহস্য।'

কী যেন ভাবল লিয়া। 'আমি লাশটা দেখতে পারি?'

'সরি, ক্যাম্পটা আপাতত সীল করে রাখা হয়েছে। মেরামতের আগে ভিতরে যাওয়াটা খুব বিপজ্জনক।'

কর্তৃত্বের সুরে কথা বলছে স্যাম, সুন্দরী মহিলার চোখে নিজেকে নেতা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা। তবে আসলে এই

মুহূর্তে কে সব নিয়ন্ত্রণ করছে, তা ভালই বুঝতে পারছে লিয়া। রানার দিকে ফিরে ও বলল, 'মি. রানা, ওই লাশটা আর মি. বোরোশিনকে দেখতে দিলে আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকব।'

'বোরোশিনকে দেখতে পারেন, তবে শুনলেনই তো, বেসটা আপাতত অফ-লিমিট,' বলল রানা। সঙ্গে গাইগার কাউন্টার না রাখলে লিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লাশের তেজস্ক্রিয়তা ডিটেক্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তারপরও ঝুঁকি নিতে চায় না ও। যতক্ষণ না কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পাচ্ছে, ততক্ষণ কাউকে ওটার কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

লিয়ার চেহারায় হতাশা ফুটল।

'ডোন্ট ওয়ারি, লিয়া,' সান্ত্বনার সুরে বলল রানা। 'এয়ারফোর্সের কাছে ওটা হস্তান্তরের আগে আপনাকে নিশ্চয়ই দেখার সুযোগ দেব আমরা।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়া। 'তা হলে ঘণ্টাদুয়েক পরে মি. বোরোশিনের লাশটা দেখব, ঠিক আছে? ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নিই।'

হাতে লাগানো ঘড়ি দেখল রানা। 'আড়াইটায় আসুন। আমাকে এখানেই পাবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লিয়া। স্যামও গিয়ে ঢুকল মেস হলে।

'কী বুঝছ?' মুরল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'টাফ লেডি। তবে কেন যেন ভয়ে ভয়ে আছে।'

'ব্যাপারটা আমিও লক্ষ করেছি,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'কিন্তু কারণটা ধরতে পারছি না। ক্র্যাশের কারণে বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না। অন্য কোনও কারণে আপসেট।'

'ব্যাপারটা কী?'

'বুঝতে পারছি না। পুরো অভিযানটা শুরু থেকেই গোলমেলে। আমাদের এই নতুন ডাক্তার যদি রহস্যের নতুন

একটা অধ্যায় হয়, খুব একটা অবাক হবো না।'

'বোরোশিনের লাশ দেখতে চাইছে কেন?' মুরল্যান্ডের গলায় বিস্ময়। 'এমন কিছু কি জানে, যেটা আমরা জানি না?'

'বুঝতে তো পারছি না,' রানা জবাব দিল। 'ওদের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় ছিল না, এটা তো বোরোশিনই আমাদের বলেছে। তা হলে গোপন কোনও কথা থাকলে জানবে কী করে?' চিন্তিত হয়ে পড়ছে রানা। একদিন আগে পর্যন্ত ছুটি কাটাবার মেজাজে ছিল ও, কিন্তু একটার পর একটা রহস্যময় ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে—এত সহজ নয় ব্যাপারটা, কোথাও একটা বড় ধরনের গড়বড় আছে। ঝামেলায় জড়াবার ইচ্ছে নেই ওর, গোটা অভিযান বাতিল হয়ে গেলে সত্যিই খুশি হবে। বিশেষ করে যেহেতু মানুষ মরতে শুরু করেছে, মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

রানার চিন্তাধারা ধরতে পারছে মুরল্যান্ড। বলল, 'অভিযানটা সাধারণ কিছু না, এটা আমিও বুঝতে পারছি। তুমি কি ভাবছ, ড্যানিশ সরকার সবাইকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে?'

'তা-ই যেন করে, ববি... তা-ই যেন করে।'

ঠিক সময়েই লিয়াকে মেস হলের দিকে আসতে দেখল রানা। লাল রঙের একটা স্নো-সুট পরেছে, হুডটা শক্ত করে মুখের চারপাশে আঁটা, কাঁধে ঝুলিয়েছে একটা ন্যাপস্যাক। বেশ কিছুক্ষণ হলো আবার শুরু হয়েছে তুষারঝড়, বাতাস পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে লিয়াকে, সামনে এগোতে তাই অসুবিধে হচ্ছে না।

গত একটা ঘণ্টা ধরে রেডিও সেটের সামনে বসে আছে রানা, রেইক্ইয়াভিকে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। সারাক্ষণ খসখস শব্দ আর মাঝে-মধ্যে নিজোর্ড থেকে পাঠানো ভাঙা ভাঙা কমিউনিকেশন ছাড়া কিছুই শুনতে পায়নি। সূর্যের শরীরে সৃষ্টি হওয়া সান স্পটের প্রভাবে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারফ্যারেন্স ওদের ক্যাম্পটাকে বহির্বিশ্ব থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

মেস হলের জানালা দিয়ে লিয়াকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল ও, অপারেটরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গায়ে পারকা জড়াল, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

'শরীর কেমন এখন?' জিজ্ঞেস করল রানা, বাতাসের কারণে উঁচু গলায় কথা বলতে হচ্ছে।

'ভাল। পথ দেখান।'

লিয়াকে গাইড রোপ ধরে থাকতে বলল রানা, তারপর নিয়ে চলল কোল্ড স্টোরেজ ল্যাবে। ওটা ক্যাম্পের এক প্রান্তে। উড়ে আসা তুষার প্রতি পদক্ষেপে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে ফেলছে, সাবধানে এগোতে হলো ওদের।

প্লাস্টিকের তৈরি বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছে গেল ওরা খানিক পরেই। যেদিক থেকে বাতাস আসছে, সে-পাশটায় কয়েক ফুট উঁচু হয়ে বরফ জমে গেছে, তবে সৌভাগ্যক্রমে ঢোকার পথটা এখনও পরিষ্কার। দরজা খুলে ধরল রানা, লিয়াকে প্রথমে ঢুকতে দিল, তারপর ঢুকল নিজে।

দরজা আটকে শরীর থেকে তুষার ঝাড়ল দুজনে, তারপর ওভারহেড লাইটগুলো জ্বেলে দিল। জিয়ো-রিসার্চের কাজ পুরোপুরি শুরু হলে এই পরীক্ষাগারে আইস কোর আর স্নো স্যাম্পল রাখা হবে। তবে আপাতত দুটো মৃতদেহ ছাড়া কিছু নেই ভিতরে। রুমের শেষ প্রান্তে পাশাপাশি দুটো ওঅর্কটেবলের উপরে চাদরঢাকা অবস্থায় দেখা গেল ওগুলো।

লিয়ার মধ্যে খুব তাড়া দেখা গেল। গায়ের তুষার ঝাড়ল কি ঝাড়ল না, মাথার হুডটা নামিয়েই একরকম ছুটে গেল লাশগুলোর দিকে। প্রথম চাদরটা উল্টাতেই হেলিকপ্টারের পাইলটের লাশ দেখা গেল। নীরবে কয়েক মুহূর্ত মৃত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল ও, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢেকে দিল আবার।

চুপচাপ এবার বোরোশিনের লাশটাকে উন্মুক্ত করল লিয়া, ফ্যাকাসে চেহারাটা দেখল একটু, তারপর শুরু করল

পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পা থেকে শুরু করে উপরে উঠতে থাকল ও; হাত দিয়ে মৃতদেহের প্রতিটা অংশ পরখ করছে। কাজে প্রখর মনোযোগ, রানা যে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যেন বুঝতেই পারছে না। এভাবে হাতড়ে কী লাভ কে জানে—ঠাণ্ডায় জমে মূর্তির মত হয়ে আছে লাশটা, সম্ভবত উপুড় হয়ে মারা যাওয়ার কারণে মাথার উপরে দুহাত প্রসারিত করে আছে, ওভাবেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সারা শরীর দেখা হলে এবার মুখমণ্ডলের দিকে নজর দিল লিয়া। বোরোশিনের মুখটা হাঁ হয়ে আছে, ন্যাপস্যাক থেকে একটা পেনলাইট নিয়ে ভিতরে আলো ফেলল ও, সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ফেলল।

'কী ব্যাপার?' সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

'দাঁতের ফিলিংগুলো... কোন হাতুড়ে ডেনটিস্ট করেছে ঈশ্বর জানেন। এমন জঘন্য কাজ জীবনে দেখিনি। বেচারা বোরোশিনের তো দাঁতের ব্যথায় পাগল হয়ে যাবার কথা!'

হাতের দস্তানা খুলে এবার সার্জিক্যাল গ্লাভ পরল লিয়া, ডান হাত ঢুকিয়ে দিল বোরোশিনের মুখের গর্তে, দু'আঙুলে তুলে আনল জমাট বাঁধা এক টুকরো লালা। চোখের সামনে এনে কয়েক মুহূর্ত গভীরভাবে দেখল, তারপর রেখে দিল টেবিলের ওপর। ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষা না করলে ওটা থেকে কিছুই জানা যাবে না। এবার নাক নিয়ে পড়ল ও, আলো ফেলে দুটো গর্তই দেখল, শেষে গাল, ভুরু আর কপাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। মাঝে মাঝেই নানা রকম শব্দ করছে, তবে কাজে ডিস্টার্ব হবে বলে রানা কিছু জানতে চাইল না। পরে একবারে সব জিজ্ঞেস করা যাবে।

লিয়ার কাজের পদ্ধতি যত দেখছে, ততই চমৎকৃত হচ্ছে ও। নিজের পেশায় বেশ দক্ষ মেয়েটা, বোঝাই যাচ্ছে। তবে সেটাই সব নয়, কাজটা ভালও বাসে সে। এমনভাবে মৃতদেহটা পরীক্ষা

করছে, যেন জটিল কোনও খেলনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে একটা শিশু, তার সমস্ত মনোযোগ আর আগ্রহ ওই একটা জিনিস নিয়েই। হঠাৎ দেখায় লিয়াকে এত সিরিয়াস ডাক্তার বলে মনে হয় না। লোকে নিশ্চয়ই প্রায়ই ধোঁকা খায় ওর ব্যাপারে।

বোরোশিনের খুলি পরীক্ষা করছে এখন লিয়া, বিভিন্ন জায়গায় হাত রেখে চেপে চেপে দেখছে। রানার দিকে ফিরল না, লাশের উপর ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই ডাকল, 'একটু এদিকে আসুন তো। আমার সাহায্য দরকার।'

এগিয়ে গেল রানা। 'কী করতে হবে?'

'লাশটা উল্টাব। ধরুন একটু।'

বেশ কষ্ট হলো বিশালদেহী বোরোশিনকে উপুড় করতে, এমনিতেই ভারি ছিল সে, মরার পর বোধহয় আরও ওজন বেড়েছে।

মাথার পিছনদিকটা নিয়ে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল লিয়া। রক্ত জমাট বেঁধে জায়গায় জায়গায় চুলে জট লেগে গেছে। জটগুলো সরিয়ে ন্যাপস্যাক থেকে বের করা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে আঘাতটা খুঁটিয়ে দেখল ও। ওর ভিতর উত্তেজনা লক্ষ করল রানা, গ্লাসটার একেবারে কাছে চোখ নিয়ে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলছে লাশের চুলের উপর। এভাবে দু'মিনিট কাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লিয়া, যেন অন্য জগতে চলে গেছে, চেহারায় স্পষ্ট একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে।

'কিছু পেলেন?' জানতে চাইল রানা।

উত্তর না দিয়ে ওকে পাশ কাটাল লিয়া, পাশের একটা টেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা ক্রো-বার তুলে নিল। ভুরু কুঁচকে ওটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল, হাত ওঠানামা করে ওজন পরখ করল, তারপর আবার রেখে দিল আগের জায়গায়, যেন সন্তুষ্ট হয়নি। ল্যাবের ভিতর ঘুরে ঘুরে কী যেন খুঁজতে শুরু করল এবার।

'করছেনটা কী?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল রানা।

এবারও জবাব দিল না লিয়া। খুঁজতে খুঁজতে একটা কাঠের ক্রেট পেয়ে থামল ও, জিনিসটা নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। ভিতরটা ঘেঁটে পোর্টেবল স্ক্রু-জ্যাকের একটা বিশ ইঞ্চি লম্বা হাতল বের করল। সেটা নিয়ে সোজা হয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল। ইতোমধ্যে হাতলটার ওজন পরীক্ষা করে দেখেছে, নিজেকে সন্তুষ্ট করেছে।

'কী ব্যাপার, বলুন তো?' প্রশ্ন করল রানা।

'এই রকম কিছু একটা দরকার আমাদের, মি. রানা,' জানাল লিয়া।

'এই রকম!' রানা কিছু বুঝতে পারছে না। 'কী খুঁজছেন, ঠিক করে বলুন তো!'

'মার্ডার উইপন।'

'মার্ডার!'

'হ্যাঁ, মি. রানা,' শান্ত গলায় বলল লিয়া। 'ম্যাক্সিম বোরোশিনকে খুন করা হয়েছে।'

সতেরো

খুব যে চমকে উঠেছে, তা নয়; বরং লিয়া যদি বলত যে বোরোশিনের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে, তা হলেই বেশি অবাক হতো রানা। লোকটার শেষ পরিণতি ঘিরে কোনকিছুই স্বাভাবিক ছিল না, খুন যে হয়েছে, তা আর বিচিত্র কী!

মুখে অবশ্য এ ধরনের কিছুই বলল না ও, উল্টো জানতে

চাইল, 'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?'

লাশের পাশে গিয়ে দাঁড়াল লিয়া, জ্যাক-হ্যান্ডেলটা তুলে দেখাল। 'মার্ডার উইপনটা এরচে ভারি আর মোটা ছিল, তবে এটা দিয়ে ডেমনস্ট্রেশনের কাজ চলবে। এদিকে আসুন।' রানা কাছে যেতেই লাঠির মত জিনিসটা বোরোশিনের খুলির ভাঙা জায়গায় বসাল ও, মোটামুটি নিখুঁতভাবেই বসে গেল তা। 'ফিটিং-টা কী চমৎকার হয়েছে, দেখেছেন? খুলিতে ইম্প্যাক্ট লাইন মাত্র দুটো, একদম সমান্তরালভাবে অক্সিপিটাল বালজ্ ধরে বসে গেছে। এত সুন্দর আর মাপা আঘাত মাথায় বরফের টুকরো পড়লে হতে পারে না।'

'তা হলে?'

'এই হ্যান্ডেলটার মত কিছু একটা দিয়ে ওঁর মাথায় মারা হয়েছে, ঠিক যেভাবে বেসবল ব্যাট চালানো হয়, সেভাবে। বাড়ি খেয়ে সেরেবুলাম আর মেডুলা স্পিনালিসের কিছু অংশ ভেঙে গেছে। মৃত্যুটা হয়েছে তৎক্ষণাৎ।'

'কিন্তু লাশটা আমরা বরফধসের নীচে পেয়েছি,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'তারমানে ব্যাপারটা সাজানো।'

'ঠিক ধরেছেন,' লিয়া মাথা ঝাঁকাল। 'এর প্রমাণও আছে। হাতদুটোর পজিশন দেখেছেন? অস্বাভাবিক না?'

'উপুড় হয়ে পড়ে ছিল সে, মুখ থুবড়ে। সেজন্য এমন হতে পারে না?'

'তা পারে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরকম। ওঁর গাল আর কপালে আঁচড়ের দাগ দেখেছি। ওটা শুধুমাত্র মেঝেতে ঘষা খেলে ওভাবে হতে পারে। আমার ধারণা, উপুড় অবস্থায় লাশের দুহাত ধরে টেনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়া হয়েছে বোরোশিনকে। দুর্ঘটনা সাজানোর জন্য। সেসময় মুখটা বোধহয় খোলা ছিল, গলায় বরফের টুকরোও পেয়েছি।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। লিয়ার এই আবিষ্কারে ওর সন্দেহটাই

বাস্তব রূপ পেল। খুন হয়েছে বোরোশিন, কিন্তু কেন? কে-ই বা করল কাজটা? ক্যাম্পে চল্লিশজন মানুষ আছে, তাদেরই কেউ একজন খুনী। লোকটাকে খুঁজে বের করা যাবে কীভাবে?

'কী ভাবছেন?' জানতে চাইল লিয়া।

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। বলল, 'ভাবছি আপনার ইচ্ছেপূরণ করব।'

'ইচ্ছেপূরণ!' লিয়া অবাক।

'হ্যাঁ,' রানা হাসল। 'ক্যাম্প ডিকেডে পাওয়া যাওয়া লাশটা দেখতে চেয়েছিলেন না? চলুন, দেখিয়ে আনি। পুরো বেসটার মধ্যে একমাত্র ওটাই কারও আগ্রহের কারণ হতে পারে। বোরোশিন যদি লাশটা দেখতে গিয়ে খুন হয়ে থাকে, তা হলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের ওটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

'কিন্তু আপনি না বললেন, বেসের ভিতরটা নিরাপদ নয়?'

'সেটা তখনকার কথা। কিন্তু আপনার ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে বরফধসটা বেসের ছাদের দুর্বলতার জন্য নামেনি, ওটা কৃত্রিমভাবে ঘটানো হয়েছে।'

'আমি স্রেফ একটা হাইপথেসিস দিয়েছি, ওটা ভুলও হতে পারে।' লিয়ার হাবভাবে মনে হচ্ছে না সে বরফের তলার ঘাঁটিটাতে যেতে খুব একটা মুখিয়ে আছে।

'নিজের ইন্সটিঙ্কটের উপর আস্থা রাখুন, লিয়া,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'আমার মনে হয় না আপনি ভুল কিছু বলেছেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলুন যাওয়া যাক।'

কোল্ড স্টোরেজ ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল ওরা, এবার ঝোড়ো বাতাসের বিপরীতে যেতে হচ্ছে। উড়ে আসা তুষারকণা শেলের মত বিঁধছে মুখের উন্মুক্ত চামড়ায়। হুড যত শক্ত করে বাঁধুক, দুয়েকটা ফাঁকফোকর রয়েই গেছে, সেখান দিয়ে ছুরির ফলার মত ঢুকছে হিমবায়ু—সব মিলিয়ে দারুণ অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। গাইড রোপ ধরে যুদ্ধ করতে করতে এগোল ওরা দুজন। ক্যাম্প

ডিকেডে ঢোকার টানেলের কাছে পৌঁছুতেই একটু উন্নতি হলো পরিস্থিতির, বাতাসের তেজ কিছুটা কমেছে, পাহাড়ের ঢালের কারণে সরাসরি এসে আক্রমণও করছে না।

'যা আবহাওয়া!' সখেদে বলল রানা। 'এদিকে তো রেডিও-টেডিও কিছুই কাজ করছে না। লিয়া, নিজোর্ড ছাড়ার আগে কোনও ফোরকাস্ট শুনেছেন? ক'দিন চলবে এই ঝড়-ঝাপটা?'

'সম্ভবত আগামীকাল পর্যন্ত,' বলল লিয়া। 'তারপর কয়েক ঘণ্টা ভাল আবহাওয়া পাব, তবে সেটার পরে আরও ভয়ানক একটা ঝড় আসছে।'

'হাহ্, এই না হলে উত্তর মেরু!' হেসে উঠল রানা। 'এরিক দ্য রেডের গল্প শুনেছেন?'

'না তো। কে সে?'

'ভাইকিং জলদস্যু ছিল। তবে ভুল পেশা বেছেছিল লোকটা, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সেলস্‌ম্যান হওয়া উচিত ছিল তার। কেন জানেন? ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আইসল্যান্ড থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে, পশ্চিমে পাল তুলে এখানে এসে পৌঁছায় সে, কিছুদিন বসবাসও করে। পরে যখন দেশে ফিরে যায়, বিরাট এক গল্প ফেঁদে বসে—অসম্ভব সুন্দর এক দ্বীপ আবিষ্কার করেছে নাকি, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন বর্ণনা দেয়া শুরু করল, লোকে দ্বীপের নাম রেখে দিল—গ্রিনল্যান্ড। ওটা সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ছিল, বিজ্ঞাপনে মিথ্যে কথা বলারও শুরু তখন থেকেই। তবে দারুণ কাজ হয়েছিল কিন্তু, পঁচিশটা জাহাজ ভর্তি সেট্‌লার ছুটে এসেছিল গ্রিনল্যান্ডে।'

লিয়া হাসল গল্পটা শুনে। 'ব্যাটারা ভালই ধোঁকা খেয়েছিল তা হলে।'

'তা তো বটেই। তবে এরিক দ্য রেডকে ধরে পিট্টি দিয়েছিল কি না, তা জানি না।'

কথা বলতে বলতে ব্যারেলের তৈরি লিফটটা উপরে উঠিয়ে এনেছে রানা, লিয়া কোনরকম ইতস্তত না করে তাতে উঠে গেল।

'বাহ্!' প্রশংসা করল রানা। 'আপনার দেখছি ভালই সাহস। অন্ধকার একটা গর্তে নামতে যাচ্ছেন, অথচ কোনও বিকার নেই।'

মুচকি হাসল লিয়া। 'সময় কাটানোর জন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে চড়ি, সামান্য একটা গর্তে আমার আবার ভয় কীসের?'

কন্ট্রোল বাটনে চাপ দিয়ে লিফটটাকে নীচে নামিয়ে আনল রানা। গর্তের মেঝেতে পা রেখে পরীক্ষা করে দেখল ক্যাম্প ডিকেডের দরজাটা—গতকাল ও আর মুরল্যান্ড যেভাবে হাতলে শেকল জড়িয়ে তালা মেরে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই আছে। কেউ জোর করে ঢোকার চেষ্টা করেছে বলে মনে হয় না। তালা খুলে ভিতরে ঢুকল ওরা। অ্যাকসেস চেম্বারে গতকালই কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট রেখে গিয়েছিল মুরল্যান্ড, বার বার যাতে আনা-নেয়া করতে না হয়। সেখান থেকে একটা লিয়ার হাতে তুলে দিল রানা, নিজেও নিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতর দুটো তলোয়ারের ফলার মত ফ্ল্যাশলাইটের শক্তিশালী আলো আঁধার কেটে ফেলছে। পথ দেখিয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারের দিকে লিয়াকে নিয়ে চলল রানা। গতকাল বোরোশিনের মৃতদেহ সরানোর পর ও আর মুরল্যান্ড মিলে প্যাসেজের অনেকখানি বরফ পরিষ্কার করে চলাচলের মত একটা পথ তৈরি করেছে, সেটা এমন আহামরি কিছু না হলেও অন্তত হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে না। চলতে চলতে মাঝে মাঝে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল রানা, মেয়েটার নড়াচড়া চপলা হরিণীর মত। ভারি স্নো-সুট পরা অবস্থায়ও তাল মেলাতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না তার। অভিজ্ঞ অভিযাত্রীর মত দেখেশুনে পা ফেলছে বটে, তারপরও চলার গতি কমছে না। বরফের স্তূপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে তরতর করে, প্যাসেজের বাধাগুলো সহজেই অতিক্রম করতে পারছে।

ডানদিকের উইঙের মুখে এসে থামল ওরা। রানা বলল, 'আসুন দেখা যাক, আপনার থিয়োরি কতখানি সঠিক।'

আলো ফেলে মেঝে দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুজনে, বড্ড পরিষ্কার জায়গাটা, যেন খুব সম্প্রতি মোছামুছি করা হয়েছে। ব্যাপারটা গতকাল এত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেনি রানা, আজ ভাল করে দেখায় বুঝতে পারছে। খানিকদূর এগোতেই হঠাৎ হালকা হয়ে যাওয়া এক ছোপ রক্ত দেখতে পেল ও, তাড়াহুড়ো করে মোছায় ঠিকমত পরিষ্কার হয়নি বোধহয়। লিয়াকে ডেকে ওটা দেখাল ও।

'মাই গড!' বলে উঠল লিয়া। 'তা হলে... যেটা সন্দেহ করছিলাম, সেটাই ঠিক!'

'হুঁ। লাশটা দেখতে এসে খুন হয়েছে বোরোশিন। চলুন, ওটার কী অবস্থা দেখে আসি।'

'গতকাল দেখেননি?'

'দেখেছি, তবে ওভাবে নজর দিইনি। চলুন, যাওয়া যাক।'

হলওয়ে ধরে দশ নম্বর রুমের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

রস কনওয়ের মৃতদেহ আগের মতই পড়ে আছে বিছানায়—হাড়ের উপর টান টান হয়ে আছে ফ্যাকাসে চামড়া, হাতদুটো বুকের উপর, এক হাতের আঙুলের ফাঁকে অন্য হাতের আঙুলগুলো গোঁজা, যেন শেষ মুহূর্তে প্রার্থনা করছিল সে। সাহায্যের আশায় ক্যাম্প ডিকেডে এসে জায়গাটা পরিত্যক্ত পেয়ে কেমন লেগেছিল লোকটার? নিশ্চয়ই মন ভেঙে গিয়েছিল? অক্ষিকোটরে যেন সেই হতাশাই ফুটে আছে।

রিয়া জানতে চাইল, 'লাশটা নাড়ানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না।' আলো ফেলে ফ্লোর আর চারপাশের দেয়াল পরীক্ষা করল ও। কয়েক জায়গায় ছোট ছোট রক্তের

ফোঁটা দেখা গেল, ঠিকমত মুছে ফেলা হয়নি।

'ব্লাড স্প্যাটার,' বলল লিয়া। 'এখানেই আক্রমণ করা হয়েছিল বোরোশিনের উপর।'

'কেউ একজন চাইছিল না, সে লাশটার ধারে কাছে আসুক,' যোগ করল রানা। 'হয়তো ভয় পাচ্ছিল, কিছু ফাঁস হয়ে যাবে।'

'কী ফাঁস হবে? এখানে যে একটা লাশ পড়ে আছে, সেটাই তো নাকি কেউ জানত না! তা ছাড়া লাশটায়ও তো হাত দেয়া হয়নি বলছেন। খুঁজে পাওয়ার মত কিছু থাকলে খুনী নিজেই সরিয়ে ফেলত না?'

'বোধহয় সময় পায়নি,' রানা অনুমান করল। 'ভোর সাড়ে চারটায় বোরোশিনকে ডরমিটরি থেকে বেরোতে দেখেছি আমি। ছ'টায় ক্যাম্পের সবাই জেগে ওঠে। তারমানে ওর পিছু নিয়ে এখান পর্যন্ত আসা, খুন করা, বরফধস ঘটিয়ে লাশ লুকানো, রক্ত পরিষ্কার করা, তারপর আবার সবার অলক্ষে ক্যাম্পে ফিরে ঘুমানোর ভান করা... এত সব কাজের জন্য মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় পেয়েছে খুনী। টাইমটেবলটা খুবই ছোট, কনওয়ের লাশ হাতড়ানোর মত সময় নিশ্চয়ই পায়নি লোকটা।'

'তারমানে পাবার মত কিছু থাকলে এখনও আছে?'

'সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল,' রানা বলল। 'দেখুন আপনি চেষ্টা করে, হয়তো এই লোকের মৃত্যুর কারণের সঙ্গে সমস্ত রহস্য জড়িয়ে আছে।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ থেকে ন্যাপস্যাকটা নামাল লিয়া। 'আপনি পিছনে চোখ রাখুন। মি. বোরোশিনের মত আমার মাথাটাকেও কেউ বেসবল প্র্যাকটিসের জিনিস ভাবুক, সেটা চাই না।'

'চিন্তা করবেন না,' সকৌতুকে অভয় দিল রানা। 'আপনার পাহারাদার কাজের সময় ঘুমায় না।'

বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল লিয়া, বোরোশিনের মৃতদেহের মত এটারও পা থেকে দেখতে শুরু করল। রানা ওর

পাশে দাঁড়িয়ে আলো ধরে রাখল, যাতে দেখতে অসুবিধে না হয়। হাতড়ে হাতড়ে গলা পর্যন্ত উঠল ও, তারপর হাঁ করে থাকা মুখের অভ্যন্তরে নজর দিল। বেশিরভাগ দাঁতই হারিয়েছে কনওয়ে, কাঁচা মাংসের মত বীভৎস চেহারা দেখাচ্ছে মাড়ি। অল্প যে ক'টা দাঁত আছে, সেগুলো কুচকুচে কালো, ভঙ্গুর অবস্থা—ওগুলো দিয়ে লোকটা আদৌ কিছু চিবাতে পারত বলে মনে হয় না।

'ভীষণ শুকনো ছিলেন ভদ্রলোক,' আনমনে মন্তব্য করল লিয়া।

'অবাক হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'অতি-পরিশ্রম আর খাবারের অভাবে এমনটা হতে পারে।'

ন্যাপস্যাক থেকে একটা মেজারিং টেপ বের করে মাপ নিল লিয়া, মৃত মানুষটার উচ্চতা মাত্র সাড়ে পাঁচ ফুট। এবার একটু অবাকই হলো রানা। অ্যামেরিকানরা এমনিতেই লম্বা হয়, তার ওপর লোকটা এয়ারফোর্সের একজন পাইলট ছিল। এদিক থেকে উচ্চতাটা বেশ কম বলতে হয়, সচরাচর এমন খাটো লোক অ্যামেরিকান মিলিটারিতে দেখা যায় না। মুখে অবশ্য কিছু বলল না ও। লিয়া ততক্ষণে মৃত পাইলটের একটা হাতা গোটাতে শুরু করেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। লাশটা যে ক্ষীণ রেডিয়েশন ছড়াচ্ছে, সেটা ভুলে যায়নি। ওটার মুখে দাঁত না থাকা আর মাথার চুল পড়ে গিয়ে টাক দেখা যাবার কারণটা ভালই বুঝতে পারছে—দুটোই রেডিয়েশন পয়েজনিঙের উপসর্গ। দশ মিনিট হয়েছে বেসে ঢোকার পর, নিরাপদে আরও পাঁচ মিনিট কাটানো যেতে পারে। তার বেশি দেরি করা ঠিক হবে না।

'কী বুঝছেন?' লাশের বাঁ হাত উঁচু করে দেখাল লিয়া, চামড়ার উপর চারকোনা একটা কালচে দাগ চোখে পড়ল, কবজির সামান্য নীচে।

'পোড়া দাগের মত লাগছে,' জানাল রানা।

'পোড়া-ই, তবে সীল জাতীয় কিছু। যেন র‍্যাঞ্চের গরুর মত ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। অবশ্য ভিতরের লেখা-টেখা বোঝা যাচ্ছে না।'

'ব্র্যান্ডিং!' রানার গলায় বিস্ময় ফুটল। 'মানুষের গায়ে কে ব্র্যান্ড বসাবে? উল্কি-টুল্কি নয়তো?'

'উঁহুঁ, উল্কিতে রং ব্যবহার করা হয়। এটা পোড়া দাগ।'

হাতাটা আবার ঠিক করে দিল লিয়া, ঠিক তখুনি নড়াচড়ায় লাশের হাতে ধরে থাকা একটা কাগজের কোনা বেরিয়ে এল।

'ওটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'হায় খোদা! এটা তো খেয়ালই করিনি!'

সাবধানে লাশের আঙুলের ফাঁক থেকে ভাঁজ করা হলদেটে কাগজটা বের করে আনল লিয়া, সঙ্গীর হাতে দিল।

কাগজটা খুলতে গিয়েই থমকে গেল রানা, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চিৎকার করছে—বিপদ আসছে!

কিছুক্ষণ থেকেই নাকে মৃদু একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছিল, তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এখন—হঠাৎ—বিনা নোটিশে খোলা দরজা দিয়ে ভক ভক করে ঢুকে পড়ল রাশ রাশ কালো ধোঁয়া, মুহূর্তের মধ্যে ছেয়ে ফেলল পুরো ঘর। কাশতে কাশতে শুরু করল রানা আর লিয়া, ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে।

'শুয়ে পড়ুন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। নিজেও ডাইভ দিল মেঝেতে। ওজনে হালকা বলে ধোঁয়া মাথার উপরে পাক খাচ্ছে, মাটির কাছাকাছি সামান্য হলেও বিশুদ্ধ বাতাস আছে।

লিয়ার চোখ টকটকে লাল, পানি গড়াচ্ছে। কাশতে কাশতে বলল, 'হোয়াট দ্য হেল! কী ঘটছে এসব?'

'আগুন...' বলল রানা। 'আগুন লেগেছে বেসে।'

•

আঠারো

ধীরে ধীরে গোটা কামরা দখল করে নিচ্ছে কালো ধোঁয়ার মেঘ, সামান্য পরে পরিষ্কার বাতাসটুকুও আর থাকবে না। দৃষ্টি ইতোমধ্যেই অন্ধ করে ফেলছে ওটা, শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইটও এই ধোঁয়ার মোকাবেলায় কিছুই নয়। এক ফুটের বেশি দূরত্ব ভেদ করতে পারছে না আলোকরশ্মি।

'বেরোতে হবে এখান থেকে,' কাশতে কাশতে বলল রানা। 'নইলে দম বন্ধ হয়ে মরব।'

লিয়া চেঁচাল, 'কীভাবে বের হবেন? আমি কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আগুনটা লাগল কীভাবে?'

'ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে, আমার পিছনে থাকুন।'

ক্রল করে দরজার দিকে এগোল রানা, লিয়া ওকে অনুসরণ করল, হলওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা। এখানটা এখনও পুরোপুরি দখল করতে পারেনি ধোঁয়া, দূরে তাকাতেই অফিসার্স কোয়ার্টারের একজিটের কাছে আগুনের নিয়ন্ত্রণহীন শিখাকে উদ্বাহু নৃত্য জুড়তে দেখা গেল, ওখানেই ঘাঁটির মাঝখানের উইংটার সংযোগস্থল। প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে আগুনটার আকার, সচল এক জ্বলন্ত পাঁচিল যেন, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, বেস থেকে বেরুনোর সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

'আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি!' হাহাকারের মত শোনাল লিয়ার গলা।

রানাও একমত, তবে সেটা মুখ ফুটে বলে দিতে হবে না।

ঠোঁট কামড়াল ও, পরিস্থিতি খুবই গুরুতর, প্রাণ নিয়ে বেরুনো সহজ হবে না। প্যাসেজটাই এখান থেকে বেরুনোর একমাত্র পথ, আগুন সেটাকে গ্রাস করে ফেলছে। জ্বালানির অভাব নেই, পুরো বেসটাই কাঠের তৈরি, তা ছাড়া এয়ার ভেন্ট অক্সিজেনও জোগাবে, সহজে মরবে না এই ভয়ানক আগুনটা।

'রানা! কিছু একটা করুন!' চেঁচাল লিয়া।

ঝড়ের বেগে মাথা খাটাচ্ছে রানা, মুক্তির উপায় খুঁজছে। হঠাৎই বুঝতে পারল কী করতে হবে। সঙ্গিনীর দিকে তাকাল ও, বলল, 'এয়ার শাফট... এয়ার শাফট ধরে বেরোতে হবে আমাদের।'

'কী বলছেন এসব? এখানে মানুষ বের হবার মত বড় এয়ার ভেন্ট আছে?'

'ভেন্ট না, শাফট। আছে একটা, তবে ক্যাম্পের অন্য উইঙে ওটা, একেবারে শেষ প্রান্তে... গ্যারাজে। ওখানে যেতে হবে আমাদের।'

'এই আগুনের ভিতর দিয়ে কীভাবে যাওয়া সম্ভব?'

'যাতে না পুড়ে যান, সে চিন্তা আমার। তবে পাগলের মত দৌড়াতে হবে, পারবেন তো?'

'তা পারব। কিন্তু আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্য উইঙের শেষ মাথায় যাওয়ায় দরকার কী? অর্ধেক গেলেই তো যে রাস্তায় এসেছি, সেটার কাছে পৌঁছে যাব।'

'এখনও বুঝতে পারছেন না?' রানার গলা কঠিন হলো। 'এখানে আগুন লাগার মত কিছুই নেই, তারপরও লেগেছে। এমনি এমনি লাগেনি... লাগানো হয়েছে। বোরোশিনের মত আমাদেরও মেরে ফেলার চেষ্টা করছে কেউ। লোকটার জায়গায় আমি হলে বেসের এন্ট্র্যান্স বন্ধ করে দিতাম।'

'হা ঈশ্বর!' এতক্ষণে বিপদটা অনুধাবন করতে পারছে লিয়া। 'তা হলে?'

'গ্যারাজের এয়ার শাফটটাই একমাত্র ভরসা। আগে স্নো-ক্যাট রাখা হতো ওখানে, ইঞ্জিন একজস্টের ধোঁয়া বের হবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল ওটা। ওখান দিয়ে বের হবো, এটা মাথায় আসবে না কারও। খোলা থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আসুন আমার সঙ্গে।'

আবার দশ নম্বর কেবিনে ঢুকল রানা, মেজর কনওয়ের লাশটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল নীচে, বিছানায় বিছানো দুটো কম্বল তুলে নিল। আগুনের তাপে বেসের চারপাশের বরফ গলতে শুরু করেছে, ছাদে লাগানো কাঠের তক্তা চুঁইয়ে নেমে আসছে অঝোর ধারায়, সেখান থেকে কম্বলগুলো ভিজিয়ে নিল ও।

'স্নো-সুট খুলে ফেলুন!' নির্দেশ দিল রানা। 'ওটাও ভেজাতে হবে।'

'ঠাণ্ডায় জমে মরব তো!' আঁতকে উঠল লিয়া।

'পুড়ে মরার চেয়ে ভাল ওটা। কথা বাড়াবেন না, জলদি করুন!' ধমকে উঠল রানা।

কথামত কাজ করল লিয়া, সুটটা খুলে রানার হাতে দিল, ও নিজেও পরনের পারকাটা খুলে ফেলেছে। ছাদ থেকে নামতে থাকা বরফশীতল পানিতে ভেজালো কাপড়গুলো, নিজেও ভিজল।

'এদিকে আসুন, শরীর ভেজান।'

'আজ কপালে মরণই আছে—আগুনে... নয়তো ঠাণ্ডায় জমে,' স্বগতোক্তি করল লিয়া, তবে যোগ দিল রানার সঙ্গে।

ভিজে চুপচুপে হয়ে গায়ে আবার কাপড়গুলো চড়াল ওরা। লিয়ার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে, দাঁতে দাঁতে শুরু হয়েছে ঠোকাঠুকি। নিজেরও একই অবস্থা, না দেখেও বুঝতে পারছে রানা। আগুন থেকে যদি রক্ষা পায়ও, হাইপোথারমিয়ার হাত থেকে বাঁচতে দ্রুত একটা কিছু করতে হবে ওপাশে গিয়ে। শরীর ভীষণ ভারি লাগছে, পানিতে ভিজে পোশাকের ওজন অন্তত দশ পাউন্ড বেড়ে গেছে। আশা করা যায় পানিটা আগুনকে প্রতিরোধ করবে।

হলওয়েতে বেরিয়ে ওরা দেখল, আগুন আরও এগিয়ে এসেছে, এখন মাত্র পনেরো গজ দূরে লেলিহান শিখা। মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিল রানা—এর ভিতর দিয়ে অন্তত ষাট গজ দূরত্ব পেরুতে হবে, তা হলেই পৌঁছানো যাবে অপর পাশে।

হুডটা মাথার ওপর তুলে দিল ও, কিনারাগুলো ভাল করে বসাল মুখের চারপাশে, চোখে লাগাল গগলস্। লিয়াকেও একইভাবে তৈরি হতে বলল। 'সাবধান থাকবেন, প্যাসেজের সমস্ত বরফ গলেছে কি না বলা যাচ্ছে না। আগুনের মাঝখানে গিয়ে আবার হোঁচট খাবেন না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ওপাশে পুরোটাই যদি আগুনে ছেয়ে থাকে, তা হলে কী হবে? যদি বের হবার মত কোনও খালি জায়গা না পাই?'

'তা হলে আর কী? দুজনে হাত ধরাধরি করে পরপারে রওনা দেব, ঠিক আছে?' ঠাট্টা করল রানা।

'অদ্ভুত মানুষ তো আপনি! এই পরিস্থিতিতেও রসিকতা করতে পারছেন!'

মুচকি হাসল রানা। 'গল্প করতে ভালই লাগছে, কিন্তু একদম সময় নেই হাতে। আপনি তৈরি তো?'

'না। এসবের জন্য কখনও তৈরি হওয়া যায়?'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল রানা, লিয়ার গায়ে একটা ভেজা কম্বল জড়িয়ে দিল। 'চিন্তা করবেন না। নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ আপনার আয়ু ফুরোচ্ছে না।'

'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

নিজের গায়ে অন্য কম্বলটা জড়াল রানা। 'আমার সঙ্গে তাল রাখবেন, পিছিয়ে পড়বেন না কিন্তু!'

জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুট লাগাল রানা, ঢুকে পড়ল অগ্নিকুণ্ডের ভিতর, পিছু পিছু লিয়া। যতক্ষণ পারল চোখ খোলা রাখল, কিন্তু উত্তাপের তীব্রতা বেড়ে যেতেই সম্ভব হলো না আর, চোখ বন্ধ

করে কম্বলটা মাথার ওপর টেনে দিল ও, দেখাদেখি লিয়াও। এখন অন্ধের মত ছুটছে ওরা, কম্বল থেকে বাষ্প বেরুতে শুরু করেছে, আশপাশের কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই, চোখের বন্ধ পাতার মধ্য দিয়ে শুধু দেখছে কমলা রঙের নাচন।

ভাগ্য ভালই বলতে হবে, চোখ বন্ধ করে ফেলার আগেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইঙে যাবার মোড়টা ঘুরতে পেরেছিল, নইলে কী হতো, কে জানে! এখন শুধু ছুটে চলা, থেমে বা চোখ খুলে কিছু দেখার উপায় নেই। ওপাশের স্টোরেজ উইঙে পৌঁছানোটাই মূল উদ্দেশ্য, সেইসঙ্গে প্রার্থনা করা—যাতে আগুনে ওপাশটা পুরো আচ্ছন্ন না হয়ে থাকে।

কতবড় ঝুঁকি নিয়েছে তা শুধু রানা নিজে জানে, ঘটনার আকস্মিকতায় স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়েছে লিয়া, নইলে বুঝতে পারত, হয়তো আসতে রাজিই হতো না। আগুনে প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে ছাদের স্ট্রাকচার, বরফ আর পানির চাপে যে কোনও মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে ওদের উপর, চিরকালের মত কবর দিয়ে দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সেই সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও ছিল না, বসে বসে জীবন্ত কাবাব হবার কোনও ইচ্ছেই নেই রানার। তারচেয়ে বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবে ও, দেখবে—ভাগ্য কতটা প্রতিকুল।

ছুটতে ছুটতে চারপাশে কাঠের মড় মড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, পায়ের কাছে টগবগ করে ফুটছে জমা হওয়া পানি, ভাগ্য বোধহয় আর বেশিক্ষণ সহায়তা করবে না। ছপ ছপ করে পড়ছে একেকটা পদক্ষেপ, যেন নরম কাদা ঠেলে এগোতে হচ্ছে, কাজটা বেশ পরিশ্রমের। পিছনে কোথাও গুরুগম্ভীর শব্দ হলো, ছাদের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে, ছিটকে ওঠা পানির কিছুটা ওদের গায়েও পড়ল।

পাগলের মত দৌড়াচ্ছে লিয়া, সামনে থপ থপ আওয়াজ ছাড়া রানার উপস্থিতি বোঝার কোনও উপায় নেই। কম্বলটা পুরোপুরি

শুকিয়ে গেছে, এখন রীতিমত ভাপ ছড়াচ্ছে ওটা থেকে, যে কোনও মুহূর্তে আগুন ধরে যাবে, কিন্তু ফেলল না ও। আগুন লাগলে ওটাতেই আগে লাগুক, অন্তত কয়েকটা সেকেন্ডের জন্য তো শরীরটা রক্ষা পাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হোঁচট খেল ও। পায়ের কাছে উঁচু হয়ে আছে জমাট বরফের একটা তাল, পুরোপুরি গলেনি। পা বেধে তাল হারাল ও, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেঝেতে আছাড় খাবার আগেই খপ করে ওর হাত ধরে ফেলল কেউ। কম্বল সরিয়ে রানাকে দেখতে পেল, শক্ত হাতে ধরে রেখেছে ওকে। আশ্চর্য ব্যাপার তো, লোকটা এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও ওর দিকে নজর রেখেছে!

'আগেই বলেছিলাম সাবধান থাকতে,' হাসিমুখে বলল রানা। 'একটু অন্যমনস্ক হলেই কী ঘটে, দেখলেন তো!'

লেলিহান অগ্নিকাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসছে মানুষটা! নার্ভ কী ধাতুতে গড়া? ভয় কাকে বলে, তা-ই মনে হচ্ছে জানে না।

'দৌড়াতে পারবেন, নাকি পাঁজাকোলা করে নেব?' জানতে চাইল রানা। 'লজ্জা পাবার কিছু নেই, নির্ভয়ে বলুন।'

'পারব, চলুন।'

'আমার হাত ধরে থাকুন।' বলে আবার ছুটতে শুরু করল রানা, লিয়াকে একরকম টেনেই নিয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তা বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে, আগুনটা অনেকদূর ছড়িয়ে গেছে, ও যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি। এতক্ষণ দৌড়ে মাত্র এক তৃতীয়াংশ জায়গা পেরুতে পেরেছে। এভাবে চললে পুড়ে মরতে হবে। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ও।

আশপাশে কী ঘটছে, না দেখার চেষ্টা করল ওরা, মনোযোগ শুধু সামনের দিকে। পিছনে ধীরে ধীরে ধসতে শুরু করেছে ছাদের একের পর এক অংশ—মুহুর্মুহু আওয়াজে কান ঝালাপালা, মেঝে পর্যন্ত কেঁপে উঠছে একেকটা পতনে। চারপাশে শুধু আগুন আর আগুন, এ যেন সাক্ষাৎ নরক। সামনে সিলিঙে চিড় ধরতে দেখল

ওরা, কয়েক জায়গা ধসেও পড়ল, শেষ মুহূর্তে ডান-বামে সরে গিয়ে মৃত্যুফাঁদগুলোকে ফাঁকি দিল। এখন আর চোখ বন্ধ করে ছোটা সম্ভব নয়, মাথাও কম্বলে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না, তা হলে নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়বে। উন্মুক্ত চামড়ায় আগুনের পরশ অনুভব করছে রানা, জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেছে। সব অগ্রাহ্য করে ছুটে চলল ও, লিয়াকেও টেনে চলেছে। কম্বল পেরিয়ে এখন পোশাকে গিয়ে পৌঁছেছে উত্তাপ, শুষে নিচ্ছে সমস্ত পানি, বাষ্প বেরুচ্ছে। এভাবে তো আর বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না।

কতক্ষণ ছুটেছে বলতে পারবে না, হঠাৎ আগুনের তীব্র গর্জন কমে গেল, ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ওরা। সামনে স্টোরেজ উইঙের টি-জাংশান দেখতে পেল রানা, আগুন এখনও এখানে পৌঁছুতে পারেনি। তবে এপাশটাও ধোঁয়ায় অন্ধকার। গায়ের উপর থেকে কম্বলটা ফেলে দিল ও, লিয়াকে নিয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, ফুসফুসে টেনে নিল পরিষ্কার বাতাস। দুজনেই কাশছে, দমকে দমকে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসছে শ্বাসের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে টেনে নেয়া কালো ধোঁয়া।

'আমাকে ফলো করুন,' কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বলল রানা, ক্রল করে সামনে এগোতে শুরু করেছে।

জাংশানে এসে বাঁয়ে মোড় নিল ও আর লিয়া, থামল না, হামাগুড়ি দিয়ে এপাশের উইঙের শেষ মাথার দিকে এগোচ্ছে। বিশাল ডোরওয়ে পেরিয়ে থামল, উঠে দাঁড়িয়ে লোহার তৈরি পুরু পাল্লাদুটো ঠেলে বন্ধ করে দিল। গ্যারাজে পৌঁছে গেছে, এখানে এখনও সেভাবে ঢোকেনি ধোঁয়া।

এতক্ষণে দম ফেলার ফুরসত মিলল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?' জানতে চাইল রানা।

'বাঁচব,' উত্তর দিল লিয়া। 'থ্যাঙ্কস্, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

'এখনও বাঁচেননি, এখান থেকে বেরুতে হবে আগে।'

ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে বিশাল গ্যারাজটা ভাল করে দেখল রানা—ছাদটা পনেরো ফুট উঁচু, তাতে কিছুটা দূরত্বে তারের জাল লাগানো দুটো চওড়া এয়ার শাফটের মুখ হাঁ হয়ে আছে, একটা ছোট, অন্যটা বড়। একপাশে একটা বড় ফুয়েল সিলিন্ডার আছে, আর দুটো ওঅর্কটেবল, এছাড়া পুরো গ্যারাজ খাঁ খাঁ করছে।

এক প্রান্তে স্নো-ক্যাট বেরুনোর জন্য বিশাল দরজা, এখন বন্ধ। আঙুল তুলে লিয়া জানতে চাইল, 'ওখান দিয়ে বেরুনো যাবে না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'ঝালাই করে পার্মানেন্টলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পাল্লা, তা ছাড়া র‍্যাম্পটাও তুষারে চাপা পড়ে গেছে।'

'এখানে অপেক্ষা করা যায় না? পাল্লাগুলো তো ফায়ারপ্রুফ মনে হচ্ছে, আগুন এ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না।'

'যাবে হয়তো। তবে উদ্ধার পেতে চাইলে বাকিদের খবর দিতে হবে। কাউকে বলে আসি নি—আমরা যে এখানে আসছি।'

'কীভাবে খবর দেবেন? আর যদি শেষ পর্যন্ত খবর দেয়া না যায়, শাফট বেয়ে বেরুবেনই বা কীভাবে?'

'যখনকারটা তখন ভাবা যাবে,' বলে পারকার চেন খুলতে শুরু করল রানা। 'আগে শরীর গরম করতে হবে। ভেজা কাপড়ে থাকলে থাইপোথারমিয়ায় ধরবে।' পারকা খুলে ফেলল ও, তারপর সোয়েটার, শার্ট আর গেঞ্জি। ওর সুঠাম দেহের দিকে লিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কী হলো, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? লজ্জা পাচ্ছেন? আমি অন্যদিকে ফিরছি।'

'না, না, লজ্জা না,' তাড়াতাড়ি বলল লিয়া, মনে মনে নিজেকে শাসন করল—ওভাবে তাকিয়ে থাকা আদিখ্যেতা। অবশ্য খুব একটা দোষও দিতে পারছে না চোখদুটোকে, এমন সুপুরুষ সচরাচর চোখে পড়ে না, ব্যায়ামপুষ্ট শরীরটা যে-কোনও মেয়েকেই চুম্বকের মত টানবে। 'আপনার শরীরে এতসব দাগ

কীসের? গুলি খেয়েছেন কখনও?'

'অনেকবার,' হাসল রানা। 'তবে ওসব পুরনো ইতিহাস।' প্যান্ট খুলে ফেলেছে ও, এখন পরনে শুধু বক্সার শর্টস্। 'আপনি কাপড় খুলুন, আমি দেখি গায়ে চড়ানোর মত কিছু পাই কি না।'

গ্যারাজের এক কোণে ছোট একটা দরজা, সেটা দিয়ে লাগোয়া একটা ওয়াশরুম আর ড্রেসিং রুমে যাওয়া যায়—গতকালই দেখে গেছে। ড্রেসিং রুমের লকার খুলতেই মেকানিকদের পুরনো কিছু ওভারঅল আর বুট পাওয়া গেল, সেগুলো নিয়ে ফিরে এল ও।

জামাকাপড় খুলে ফেলেছে লিয়া, এখন পরনে শুধু সুতি প্যান্টি আর স্পোর্টস্ ব্রা, রানাকে দেখে লজ্জায় বুক আর তলপেটের নীচটা হাত দিয়ে ঢাকল। তারপরও লুকানো গেল না অবাধ্য যৌবন, হাতের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পুরুষ্ট বুকের উপরিভাগ, মাঝের গহীন গিরিখাত, মেদহীন তলপেট, আর মাঝখানটায় গভীর একটা নাভি। দম আটকে আসবে যে কোনও পুরুষের। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল রানা, তাতে কামনার কোনও ছাপ ফুটল না, রইল শুধু নীরব স্তুতি।

গুনে গুনে চারটা ওভারঅল বাড়িয়ে ধরল ও। বলল, 'সবগুলো পরে ফেলুন।'

কৃতজ্ঞতা ফুটল লিয়ার চোখে, খাঁটি ভদ্রলোকের আচরণ দেখে, তবে উল্টো ঘুরে রানা নিজেও কাপড় পরছে বলে ওর চোখের ভাষা পড়তে পারল না।

'কোথায় পেলেন এসব?' জানতে চাইল লিয়া।

'মেকানিকদের লকারে,' জানাল রানা। 'বেশিরভাগ জিনিসই ফেলে গেছে ওরা।'

'তাই বলে পরনের কাপড় পাবেন, জানলেন কীভাবে?'

'গতকাল ছোটখাট একটা তল্লাশি চালিয়েছিলাম পুরো বেসে। তখনই দেখেছি।'

কাপড় পরা শেষ হয়েছে, পরস্পরের দিকে মুখোমুখি হলো ওরা। বুট এগিয়ে দিল রানা, সঙ্গে একটা লাইটার। বলল, 'জুতো পরে একটা আগুন ধরান দেখি। গা গরম করা দরকার। সাবধান, আবার গোটা গ্যারাজ জ্বালিয়ে দেবেন না যেন!'

'মাথা খারাপ? অন্তত দু-তিন জনম চালিয়ে দেবার মত আগুন দেখে ফেলেছি, আর কখনও অসতর্ক হতে পারব না।'

'দ্যাটস্ গুড।'

'লাইটার পেলেন কোথায়? সিগারেট খান বুঝি?'

'ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন হলো। তবে এ ধরনের অভিযানে এলে পকেটে দরকারি দু'চারটা জিনিস রাখি—লাইটার তার একটা।'

'ঠিক আছে, জ্বালছি আগুন। আপনি কোথায় চললেন?'

'দেখি, আমাদের ক্যাম্পের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় কি না।'

এগিয়ে গিয়ে ওঅর্কবেঞ্চের উপরে পড়ে থাকা একটা হাতুড়ি তুলে নিল রানা, ফুয়েল সিলিন্ডারের গায়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিল। ভোঁতা শব্দ হওয়ায় বোঝা গেল, ভিতরের অর্ধেকটা অন্তত তেলে ভর্তি। বের করতে অসুবিধে হবে না, সিলিন্ডারের সঙ্গে নজ্‌ল্ সহ রাবারের হোস লাগানো আছে, ভাঁজ করে জিনিসটা সাপোর্ট ক্রেডলে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এয়ার শাফটের দিকে তাকাল ও, মুখের জালিটা খুলতে খুব একটা অসুবিধে হবে না, তবে মই লাগবে, একটা লম্বা লাঠিও দরকার—তাঁবু খাটানোর পোল হলে চলে। গ্যারাজের লাগোয়া ইউটিলিটি ক্লজিটে দুটোই পাওয়া গেল।

ফায়ারপ্রুফ ডোরের ওপাশ থেকে ভেসে আসা পোড়া গন্ধ মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বার বার। কাজের ফাঁকে অজান্তেই ওদিকে একবার তাকাল রানা, সত্যিই কি নিরাপদ ওরা? বিপদ কি সত্যিই কেটে গেছে?

কয়েকটা কাঠের ক্রেট ভেঙে কংক্রিটের মেঝেতে ছোট্ট করে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে লিয়া, হাত বাড়িয়ে আরামদায়ক উষ্ণতা পোহাচ্ছে। রানার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভাবিনি ওই জ্বলন্ত প্যাসেজওয়ে পাড়ি দিয়ে আসার পর এটা ভাল লাগবে।' লাইটারটা ফিরিয়ে দিল কথা শেষ করে।

'শুভ লক্ষণ,' মন্তব্য করল রানা। 'আগুন খুব খারাপ জিনিস, একবার এই জিনিসের কবলে পড়লে অনেকেই চিরদিনের মত আপসেট হয়ে যায়, আগুন দেখলেই আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ে। আপনি স্বাভাবিক আছেন দেখে খুব ভাল লাগছে।'

'এখন কী করতে চান?' রানার হাতের জিনিসপত্রের দিকে ইঙ্গিত করল লিয়া।

'পুরনো একটা প্রবাদের বাস্তব প্রয়োগ,' রানা রহস্য করল। 'আগুন দিয়ে আগুনের মোকাবেলা করব।'

'মানে!'

পরিকল্পনাটা খুলে বলল রানা। শুনে লিয়া সন্দেহ প্রকাশ করল, 'ডিজেলটা যে এখনও জ্বলবে, তা-র গ্যারান্টি কী?'

'সময়ের সাথে ফুয়েলের কম্বাস্টিবিলিটি নষ্ট হয় না, শুধু এফিশিয়েন্সি কমে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'ট্যাঙ্কের তলানি আর ময়লা পরিষ্কার করে নিলে তেলটা এখনও আমাদের যানবাহনে ব্যবহার করতে পারব আমরা। হ্যাঁ, মাইলেজ হয়তো কমে যাবে; তা ছাড়া পিস্টন রিঙও ঘন ঘন পুড়ে যেতে পারে—আর কিছু নয়!'

কথাটা শুনে উৎসাহী হয়ে উঠেছে লিয়া, বসা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়াল। 'বসে থেকে লাভ কী, চলুন কাজ শুরু করে দিই।'

কাজে নেমে পড়ল ওরা। মই লাগিয়ে সবচেয়ে বড় শাফটটার মুখের কাছাকাছি উঠল রানা, তারের জালিটা খুলে ফেলল, তারপর আলো ফেলল ভিতরে। বেশ বড় ওটা, অনায়াসে দুজনের জায়গা হয়ে যাবে। গ্লেশিয়াল ফ্লো'র কারণে শাফটের দেয়াল

কোথাও কোথাও দুমড়ে গেছে বটে, তারপরও শুরুর পনেরো ফুটের মত দৈর্ঘ্য একদম পরিষ্কার। এরপর থেকে উপরের বাকিটুকু বরফে চাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। কতটুকু হতে পারে এই বরফের স্তর? দশ ফুটের বেশি হবে না, চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো ও।

লিয়া ব্যস্ত অন্যদিকে। ইউটিলিটি ক্লজিট থেকে দড়ি এনেছে ও, ফুয়েল হোসটা সাপোর্ট ক্রেডল থেকে আলগা করে নিয়েছে, তারপর ভাঁজ খুলে ডগাটা বেঁধে ফেলেছে দশ ফুট লম্বা তাঁবুর পোলটার সঙ্গে। মই থেকে নেমে এসে রানা যখন ফুয়েল সিলিন্ডারের ভালব পরীক্ষা করছে, তখন পকেটনাইফ দিয়ে হোসের প্রান্তে লাগানো ইস্পাতের নজ্‌ল্‌টা কেটে ফেলে দিল ও।

ফুয়েল সিলিন্ডারটা ভাল করে দেখল রানা, ওটা মেঝে থেকে চার ফুট উঁচুতে বসানো, তার মানে তেলের ফ্লো-টা মধ্যাকর্ষের টানে আসে, আলাদা কোনও পাম্প ব্যবহার করতে হয় না। সন্তুষ্ট বোধ করল ও, নজ্‌ল্‌ কেটে ফেলায় ট্যাপ খুলে দিলে সর্বোচ্চ বেগে হোস দিয়ে বেরিয়ে আসবে তরল ডিজেল।

‘এক্সপেরিমেন্টের জন্য তৈরি আছেন?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘আছি।’ বলে হোসসহ পোলটা শরীর বাঁচিয়ে দূরে তাক করল লিয়া, কত জোরে তেলটা বেরিয়ে আসবে বলার উপায় নেই।

‘ছাড়ছি!’ বলে ট্যাপের হুইলটা ঘোরাতে শুরু করল রানা, প্রথমে একটু শক্তি খাটাতে হলো, তবে কয়েক পাক ঘুরতেই ফ্রি হয়ে গেল ওটা, এরপর ঘোরানো গেল খুব সহজে।

বিশাল একটা বক্র হয়ে প্রবল বেগে ছিটকে বেরুতে শুরু করল তরল ফুয়েল, তোড় দেখে লিয়া চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে-আরে! থামুন-থামুন! সব বেরিয়ে যাবে তো!’

তাড়াতাড়ি ট্যাপটা বন্ধ করল রানা, তারপর এগিয়ে গেল লিয়ার পাশে।

‘কী মনে হয়?’ ফ্ল্যাশলাইট তুলে দেখাল লিয়া—মেঝে ভিজে

গেছে ছিটকে পড়া ফুয়েলে, ধারাটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা বা তারও বেশি, আলো অতদূর না পৌঁছানোয় পুরোপুরি শিয়োর হওয়া যাচ্ছে না।

'চমৎকার!' সন্তুষ্টির হাসি রানার মুখে।

'কাজ চলবে?'

'প্রয়োজনের চেয়েও বেশি।'

গ্যারাজের দরজার কাছে আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। আগুন বোধহয় পৌঁছে গেছে কাছাকাছি, ওপাশে পুড়ছে সবকিছু, পাল্লার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে। বয়সের ভারে দরজাটা আগুন প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেকখানিই হারিয়েছে বলে সন্দেহ হলো ওদের।

পোলসহ হোসটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল লিয়া। 'তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। আপনি মই বেয়ে উঠে যান, আমি ভালভ অপারেট করছি।'

মইটা সরিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা, যাতে ঝরতে থাকা ফুয়েলে নিজে ভিজে না যায়, এরপর উঠে গেল উপরে। ইতোমধ্যে ছাদের কাছাকাছি জমে গেছে ধোঁয়া, বাঁচার জন্য ওভারঅলের কলার তুলে নাক ঢাকল ও, কিন্তু অর্ধশতাব্দীর পুরনো ময়লার বোটকা গন্ধ এমনভাবে নাকে ঝাপটা মারল যে তাড়াতাড়ি আবার কলারটা নামিয়ে ফেলতে হলো। এরচে ধোঁয়ায় খকখক করে কাশাও ভাল।

'রেডি হলে বলবেন, আমি ভালভ খুলে দেব,' নীচ থেকে চেঁচাল লিয়া।

পজিশন ঠিক করে পোলটা ধরল রানা, ব্যালান্স রাখার জন্য ডগাটা এয়ারশাফটের ভিতরের দেয়ালে ঠেস দিল, হোসটা নীচে ঝুলছে। এক হাতে মইটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ও, অন্য হাতে ধরে রেখেছে ভারি পোলটা—নীচের প্রান্তটা পেটের সঙ্গে ঠেকাল, যাতে হঠাৎ ঝটকা খেলে হাত থেকে খসে না পড়ে জিনিসটা।

'রেডি। ছাড়ুন এবার!' গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল ও।

এক ঝটকায় ট্যাপ খুলে দিল লিয়া, হোস বেয়ে প্রবল বেগে ছুটে আসা ডিজেলের চাপ পরিষ্কার অনুভব করল রানা, আউট্‌লেট দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে সেটা আঘাত করল শাফটে প্লাগের মত আটকে থাকা বরফের নীচের অংশে, বাড়ি খেয়ে আবার ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে। মই ধরা হাতটা মুক্ত করল ও, পকেট থেকে লাইটার বের করে আগুন জ্বালল, তারপর জ্বলন্ত জিনিসটা ছুঁড়ে দিল স্রোতের ভিতর।

চোখের পলকে জ্বলে ফুয়েল, কমলা রঙের আগুনের তীব্র একটা ধারা ছুটে যাচ্ছে শাফটের ভিতর, ফ্লেম-থ্রোয়ারে পরিণত হয়েছে পুরো ব্যবস্থাটা। প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হলো, দশ ফুট দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও আঁচ অনুভব করছে রানা। তীব্র উত্তাপ সহ্য করতে পারল না বরফ, গলতে শুরু করল, টুকরো টুকরো হয়ে জ্বলন্ত ডিজেলের সঙ্গে মিশে অঝোর ধারায় পড়তে শুরু করল নীচের মেঝেতে। গ্যারাজের একপাশে ড্রেন আছে, তেল আর পানির মিশ্রণ সেখান দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে ভূ-গর্ভের ওয়েইস্ট-ট্যাঙ্কে, আগুন লাগার ভয় নেই, তেলের চেয়ে পানির পরিমাণ বেশি।

বোঝার উপায় নেই, ফুয়েল শেষ হয়ে যাবার আগেই পুরো বরফ গলানো যাবে কি না। তবে প্রতি মুহূর্তে বরফ গলা পানির পরিমাণ বাড়তে থাকায় আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'কাজ হচ্ছে!' লিয়ার উত্তেজিত গলা শোনা গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল রানা, ভুরু নাচাল। 'কেন, আপনার কোনও সন্দেহ ছিল?' আগুনের পটভূমিতে ওকে নরকের দূতের মত লাগছে।

প্রত্যুত্তরে ভুবন ভোলানো একটা হাসি উপহার দিল লিয়া। বলল, 'মোটেই না।'

টানা পনেরো মিনিট আগুন ছুঁড়ে গেল রানা, শেষে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেছে দেখে চেঁচিয়ে লিয়াকে ভালভ বন্ধ করতে বলল।

ফুয়েলের ফ্লো থামতেই মই থেকে নেমে এল রানা, শাফটের ঠিক নীচে এসে দাঁড়াল, তাকাল উপর দিকে।

অনেক উঁচুতে গোল একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, সেখানে উঁকি দিচ্ছে আকাশ। শাফটের মুখ খুলে গেছে! গ্যারাজের ছাদের কাছে জমে থাকা কালো ধোঁয়া আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখান দিয়ে।

লিয়াও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রানা বলল, 'ধোঁয়া দেখে ফায়ার-ফাইটারদের কেউ না কেউ শীঘ্রি আসবে এদিকে। আমাদের উদ্ধার করবে।'

'রানা, ইউ আর আ জিনিয়াস!' খুশি আর উত্তেজনায় রানাকে জাপটে ধরল লিয়া, চুমু খেলো গালে। 'দুবার আমার জীবন বাঁচালে, আমি তো ঋণী হয়ে গেলাম।' সম্বোধন পাল্টে গেছে তার, দুচোখে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছে।

হৃৎপিণ্ড যেন একটা বিট মিস করল, চুম্বনটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মুখের কাছে সেঁটে থাকা লিয়ার অপূর্ব মুখাবয়ব আর মদির ঠোঁট লোভ জাগাল রানার মধ্যে, ইচ্ছে হলো ফিরিয়ে দেয় চুমুটা—গালে নয়, ঠোঁটে। যেমন উচ্ছ্বাস দেখছে, লিয়া বাধা দেবে বলেও মনে হয় না। পরমুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল ও, শাসন করল নিজেকে—এভাবে সুযোগ নিতে নেই। বিপদে পড়ে ক্ষণিকের জন্য ঘনিষ্ঠ হয়েছে মেয়েটা, অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব আর আচমকা উদ্ধার পাবার সম্ভাবনার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এটা। এ ধরনের আবেগ সাধারণত খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়, পরে ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

ভদ্রভাবে নিজেকে আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। বলল, 'ঋণ নাহয় পরে কখনও শোধ করে দেবে, কেমন?'

শাফটের মুখে একটা ছায়া পড়ল, চোখ তুলে ওরা দেখল—মানুষের আকৃতি।

মুরল্যান্ডের উদাত্ত গলা ভেসে এল, 'কে ওখানে... রানা,

তুমি?'

'হ্যাঁ, ববি। ডা. নোভাকও আছেন। তাড়াতাড়ি আমাদের তোলার ব্যবস্থা করো।'

'আগুন নেভানোর কাজে তোমাকে না দেখে শুরুতেই সন্দেহ হয়েছে আমার—নিশ্চয়ই কোথাও অভিসার করতে গেছ তুমি।'

'ফাজলামি বন্ধ করে জলদি একটা দড়ি-টড়ি নামাও। আগুন ঢুকে যাচ্ছে গ্যারাজের ভিতর, এখানে একটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক আছে। বড়-সড় একটা বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে শীঘ্রি... আশপাশে যারা আছে, তাদের দূরে সরে যেতে বলো।'

'দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।' ছুটে চলে গেল মুরল্যান্ড।

দশ মিনিট পর সারফেসে উঠে এল রানা আর লিয়া, স্নো-ক্যাটের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ওদের টেনে তোলা হয়েছে। লাফ দিয়ে ট্র্যাক্টরের মত বিশাল বাহনটায় উঠে বসল ওরা।

'তাড়াতাড়ি বেস ক্যাম্পে চলো, ড্রাইভিং সীটে বসা মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'নীচের ফায়ার ডোর ভেঙে যাচ্ছে, অলরেডি গ্যারাজের টেম্পারেচার একশো ডিগ্রি পার হয়ে গেছে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল মুরল্যান্ড। 'কতক্ষণ সময় পাব?'

'খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট। বাকিরা সরে গেছে তো?'

'গেছে,' বলে সজোরে লিভার টানল মুরল্যান্ড, পায়ের তলায় অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরেছে। গোঁ গোঁ করে উঠল ইঞ্জিন, তবে ঘুরতে শুরু করল স্নো-ক্যাটের নাক, বেস ক্যাম্পের দিকে মুখ করতেই ট্র্যাক সিধে করল মুরল্যান্ড, পিছনে তুষারকণা উড়িয়ে ছোটাল অতিকায় যানটাকে। ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাম্প ডিকেডের এন্ট্র্যান্স টানেল দিয়ে রাশ রাশ কালো ধোঁয়া বেরুতে দেখল রানা। এই শুভ্র জগতে সেটা বড্ড বেমানান এক দৃশ্য।

মেস হলের কাছাকাছি পৌঁছে থামল স্নো-ক্যাট। ওরা ড্রাইভিং ক্যাব থেকে নামতে না নামতেই পিলে চমকানো আওয়াজ হলো, আগুন ফুয়েল সিলিন্ডারের নাগাল পেয়ে গেছে। চোখে অবিশ্বাস

নিয়ে ক্যাম্প ডিকেডকে আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফোরিত হতে দেখল সবাই—গ্লেশিয়ারের বড় একটা অংশের বরফ উড়ে গেছে আকাশে, হাজারটা খণ্ড হয়ে আগুনের উলম্ব ধারাটাকে কেন্দ্র করে বৃষ্টির মত নেমে আসছে চারপাশে, যেখানটায় গ্যারাজ ছিল, আশি ফুট ব্যাসের একটা গর্ত হয়ে গেল জায়গাটায়। শক ওয়েভটা এল কয়েক সেকেন্ড পরে, প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় কেঁপে উঠল ধরণী, ঝাঁকুনিতে তাল হারিয়ে ধুপধাপ করে পড়ে গেল দাঁড়িয়ে থাকা সবাই, ক্যাম্পের চেয়ার টেবিল থেকে শুরু করে সবকিছু উল্টেপাল্টে গেল, যেন মাটির তলা দিয়ে একটা ঢেউ বয়ে গেছে।

বিস্ফোরণটা শেষ হয়ে যাবার পরও গুমগুম করতে থাকল প্রকৃতি, বাতাসে ভাসছে তুষারের মেঘ। পাহাড় ঢালের বিরাট একটা অংশ দেবে গেছে মাটিতে, পুরো ক্যাম্প ডিকেড চাপা পড়ে গেছে ওটার তলায়। গ্যারাজের জায়গায় সৃষ্টি হওয়া কালো গর্তটা দেখে মনে হচ্ছে, ওখানে বোমা ফেলা হয়েছিল।

হাত ধরে টেনে মাটিতে চিত হয়ে পড়া রানা আর লিয়াকে উঠতে সাহায্য করল মুরল্যান্ড। জানতে চাইল, 'তোমরা ওখানে করছিলেটা কী, বলো তো? আগুনটা লাগল কীভাবে? এসব হচ্ছেটা কী?'

'জানি না,' বলল রানা, মেজর রস কনওয়েরের হাতে পাওয়া কাগজের টুকরোটা পকেট থেকে বের করল। 'তবে আমি জেনে ছাড়ব।' কাগজটার দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করল ও।

উনিশ

নর্থ সী... উত্তর সাগর।

সী এম্প্রেসকে সামান্যতম ঝাঁকুনি দিতে না পারার ক্ষোভেই যেন সুবিশাল ক্রুজ লাইনার জাহাজটার নীচে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জে চলেছে উত্তাল সাগর—বিরাট বিরাট ঢেউ উঠছে একেকটা, নিষ্ফল আক্রোশে আছড়ে পড়ছে খোলের উপর। ছোটখাট মাছ ধরা নৌকা হলে উল্টে যেত এতক্ষণে, বড় বড় ফ্রেইটারকেও টালমাটাল করে দিতে পারে এসব ঢেউ, কিন্তু সী এম্প্রেসের কিচ্ছু হচ্ছে না। অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য আর অবিশ্বাস্য আয়তনের টুইন হালের কারণে সবসময় একইসঙ্গে দু-তিন রকম ওয়েভ প্যাটার্ন থাকে জাহাজটার নীচে, পরস্পরের প্রভাব নিষ্ক্রিয় করে ফেলে ওগুলো। এ কারণে ভয়াবহ দুর্যোগেও নিরাপদে ভাসতে পারে সী এম্প্রেস, ঢেউয়ের দোলা-টোলা একদমই বোঝা যায় না ভিতর থেকে।

সমুদ্রযাত্রার প্রথম কয়েকটা দিন কেবিনে কাটিয়ে দিয়েছেন ফাদার নভোস্কি। বাইরে বেরোননি খুব একটা, এমনকী খাওয়া-দাওয়ার জন্যও উপরের কোনও রেস্টুরেন্টে যাননি, কেবিনে আনিয়ে নিয়েছেন। খোঁজাখুঁজি যেন না পড়ে, তাই সফরদলের দলীয় নেতা বিশপ আকিনফিভকে জানিয়ে দিয়েছেন, জাহাজ চলতে শুরু করার পর থেকে খুব একটা সুস্থ বোধ করছেন না তিনি। কথাটা অবশ্য একেবারে মিথ্যেও নয়।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান ফাদার নভোস্কি। মোটা মোটা

থ্যাবড়া হাত আর বৃষস্কন্ধ একজন ধর্মযাজকের চেয়ে কৃষকের জন্য বেশি মানানসই—পরিবারের বাকিরা সেই পেশাতেই আছে যুগ যুগ ধরে। নিরেট জমিনের জন্য উপযুক্ত করে তাঁর দেহটাকে গড়েছেন বিধাতা, সাগরের জন্য নয়। সামান্যতম দুলুনিতেও মোশন সিকনেসে আক্রান্ত হচ্ছেন তিনি, বেশিরভাগ সময় কাটছে বাঙ্কে শুয়ে বা বাথরুমে বমি করে।

ইউনিভার্সাল কনভোকেশনের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনীতে যাননি তিনি, তবে শুনেছেন—স্মরণকালের সবচেয়ে সুন্দর প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন পোপ। মাঝেমধ্যে আপার ডেকে অবশ্য যাচ্ছেন নভোস্কি, তবে সেটা অন্ধকার নামলে। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলছেন অন্যান্য অতিথি আর জাহাজের ক্রু'দের। ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত মহাসম্মেলনে তিনি পরিণত হয়েছেন অদৃশ্য এক চরিত্রে, স্বেচ্ছায়। এবং এ কারণে তাঁর মনে কোনও খেদ নেই।

ফাদার নভোস্কির চিন্তা-চেতনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটাই বস্তু।

আইকনটা।

খাবার নিয়ে আসা বেয়ারা আর দলীয় নেতা বিশপ আকিনফিভ ছাড়া পুরো জাহাজে কেবল একজন মানুষের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে তাঁর—কার্ডিনাল সাইমন পাগনানি, ভ্যাটিক্যানের সেক্রেটারি অভ স্টেট, পোপের ঠিক পরেই ভদ্রলোকের স্থান। শিপে রাখা ধর্মীয় আর্টিফ্যাক্টগুলোর দেখাশোনা এবং যথাসময়ে উপযুক্ত দাবিদারদের হাতে ফিরিয়ে দেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পাগনানির কাঁধে। পুরো জাহাজে এই একজন মানুষকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন নভোস্কি।

সী এম্প্রেসে কার্ডিনাল পাগনানি একটা অফিস খুলেছেন, সেখানে প্রতিদিনই জমা পড়ছে অসংখ্য অনুরোধ—বিভিন্ন ধর্মীয় নেতারা সমুদ্রযাত্রার শুরুতেই তাঁদের আর্টিফ্যাক্ট ফেরত চাইছেন। যদিও সম্মেলনশেষে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সব হস্তান্তর

করবার কথা, তারপরও এসব অনুরোধ অগ্রাহ্য করছেন না পাগনানি। ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় হিসেবে নির্ধারিত সময়ের আগেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন এসব ঐতিহাসিক নিদর্শন। অনুরোধ পেলেই এ কাজে নিয়োজিত ভ্যাটিক্যানের টেকনিক্যাল সার্ভিসের লোকজনকে দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছেন, ঠিক কোথায় নির্দিষ্ট আইটেমটা রাখা হয়েছে, তা বের করে হস্তান্তরের জন্য। খুঁজে পেতে হয়তো একটু সময় লাগছে, দেরি বলতে ওটুকুই।

অনেকের মত ফাদার নভোস্কিও তাঁর আইকনটার জন্য আবেদন করেছেন, সেটা মঞ্জুরও হয়েছে। এই মুহূর্তে টেকনিক্যাল সার্ভিসের একজন সদস্যের পিছু পিছু হাঁটছেন তিনি, যাচ্ছেন জিনিসটা নিয়ে আসতে। কভারঅল পরা লোকটার নাম কাভালি, নিশ্চিন্ত মনে দ্রুত পা চালাচ্ছে সে, কিন্তু নভোস্কি হাঁটছেন জড়োসড়ো ভঙ্গিতে, কার্পেট বিছানো মসৃণ হলওয়েতেও দুবার হোঁচট খাবার উপক্রম হলো। জাহাজটা পাথরের মত স্থির থাকলেও তাঁর মনে হচ্ছে পেন্ডুলামের মাঝখানে আছেন, একটা হাতে দেয়াল ধরে ব্যালান্স রাখছেন। সী-সিকনেস ভালমতই ধরেছে বেচারাকে, মুখ ভরে আছে লালায়, উদগত বমিটাকে রীতিমত কসরত করে ঠেকিয়ে রেখেছেন।

এলিভেটর ধরে শিপের ওয়ার্কিং সেকশনে নিয়ে যাওয়া হলো ফাদার নভোস্কিকে। অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট রাখার উপযোগী করে তোলা হয়েছে এ অংশটাকে, দম নিতেই নাকে ঢুকছে জীবাণুনাশকের কড়া গন্ধ। মাথার উপর সিলিঙে লাগানো হয়েছে মোলায়েম আলোর বাতি, তাপমাত্রাও অসম্ভব ঠাণ্ডা। খোলের গায়ে ঢেউ বাড়ি খাওয়ার শব্দ না হওয়ায় মনে হচ্ছে ওয়াটারলাইনের নীচে নেমে এসেছেন তাঁরা।

বিশাল একজোড়া ওয়াটারটাইট দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দুজন সুইস গার্ড, সাদা রঙে তাতে লেখা: *কার্গো হোল্ড থ্রী*। এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলল কাভালি, সন্তুষ্ট

হয়ে পথ ছেড়ে দিল নিরাপত্তারক্ষীরা। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল ভ্যাটিক্যানের প্রতিনিধি, নভোস্কিকে ভিতরে ঢুকতে ইশারা করল। দুই গার্ড নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, কী নিয়ে যেন মশকরা করে হেসেও উঠল... বোধহয় তাঁকে নিয়েই, কিন্তু পরোয়া করলেন না নভোস্কি, দৃঢ় পায়ে সামনে বাড়লেন। লক্ষ্যের খুব কাছে পৌঁছে গেছেন তিনি, এখন আর জাগতিক কোনও ব্যাপার তাঁর মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না।

হোল্ডের ভিতরে পা দিতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ফাদার নভোস্কির, ভাষায় সেটা প্রকাশ করা যাবে না। চোখের সামনের দৃশ্যটা সাধারণ একটা ওয়্যারহাউসের মত—সারি বেঁধে একটার পর একটা ক্রেট সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তারপরও তাঁর মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র তীর্থপীঠে পা রেখেছেন তিনি, যেখানে শোভা পাচ্ছে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি যুগ-যুগান্তর ধরে মানবজাতির জানানো সম্মান আর আনুগত্যের সমস্ত প্রতীক। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কাভালি মেঝেতে থুতু ফেলছে দেখে প্রচণ্ড রাগ হলো তাঁর, ইচ্ছে করল লোকটার টুঁটি চেপে ধরতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলেন নভোস্কি, ভ্যাটিক্যানের এই অজ্ঞ কর্মচারী জানে না, কত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস রক্ষিত আছে এখানে। জানে না, কিছুক্ষণের মধ্যে যে জিনিসটা তাঁর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে, সেটাই সেই জিনিস। তিনিই ওটার প্রকৃত দাবিদার।

না! সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন তিনি। ভয়ঙ্কর ওই বস্তুটার মালিক কোনও মানুষ হতে পারে না, ওটার আসল মালিক খোদ শয়তান! তিনি আর তাঁর সহচরেরা স্রেফ ওটাকে আগলে রাখবেন, যাতে নিষ্পাপ পৃথিবী কলুষিত না হয়।

হাতে একটা মোটা ম্যানিফেস্ট রয়েছে কাভালির, সেটার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে হোল্ডের গলি-ঘুপচির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে। কার্ডিনাল পাগনানির কর্মপদ্ধতি একদম নিখুঁত: বড় বড়

পেইন্টিং থেকে শুরু করে মুসলমানদের তসবিহ্ পর্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটা জিনিসের তালিকা করেছেন তিনি, কোনওটা যেন এদিক-সেদিক না হয়। ম্যানিফেস্ট মেলাতে মেলাতে হোল্ডের একপ্রান্তে এক মানুষ উঁচু একটা কন্টেইনারের সামনে পৌঁছুল কাভালি, পকেট থেকে আরেক গোছা চাবি বের করে তালা খুলল।

'জিনিসটার ছবি আছে কোনও?' জিজ্ঞেস করল সে। 'তা হলে খুঁজে পেতে সুবিধে হয়।'

আলখাল্লার ভিতর থেকে হলদে হয়ে আসা এক টুকরো কাগজ বের করে ধরলেন নভোস্কি, তাতে সাদাকালোয় দেখা যাচ্ছে একটা চৌকোনা ধাতব পাতে খোদাই করা যিশু আর ভার্জিন মেরির প্রতিচ্ছবি... তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত আইকন। কাগজটার কোনায় কালচে হয়ে আছে একটা অংশ—কেউ জানে না, ওটা আসলে এক ত্যাগী প্রিস্টের শুকিয়ে যাওয়া নির্ভেজাল রক্ত, এই ভয়ানক গোমরটার জন্য জীবন দিয়েছিলেন তিনি।

'এখানে থাকুন, আমি এক্ষুণি আসছি,' বলে ছবি হাতে কন্টেইনারের ভিতর ঢুকে গেল কাভালি। বাইরে থেকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখতে পেলেন নভোস্কি, কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল লোকটা।

নরম কাপড়ে মোড়া আইকনটা পাশের একটা ওঅর্কটেবলের উপর নামিয়ে রাখল সে, কাগজের ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে আবরণটা সরিয়ে ফেলল। মাত্র দু-ফুট লম্বা ওটা, এক ফুট চওড়া, পুরুত্ব ছয় ইঞ্চি—সব মিলিয়ে খুব একটা বড় বলা চলে না। তারপরও জিনিসটা বহন করতে বেশ কষ্ট হয়েছে কাভালির, বাড়তি ওজন এর ভিতরে লুকিয়ে থাকা পদার্থটার অবদান। দম আটকে এল ফাদারের, ছবির সঙ্গে মেলানোর প্রয়োজন নেই, এটাই সেই আইকন, তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই। সারা পৃথিবীতে জিনিসটার বিষয়ে তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ আর কেউ নেই। ভ্যানাভারার কাছাকাছি এক গোপন জায়গায় আইকনটার নির্মাণের

পর কেটে গেছে প্রায় এক শতাব্দী, হাতে হাতে ঘুরেছে ওটা—সাইবেরিয়া থেকে সেইন্ট পিটার্সবার্গ, সেখান থেকে স্টালিনগ্রাদ, তারপর জার্মানি... আর সব শেষে ঠাঁই পেয়েছে রোমে, ভ্যাটিক্যানে। আইকনটার খোঁজে ইতিহাস তছনছ করে ঘাঁটতে হয়েছে নভোস্কিকে, দিনের পর দিন ছুটতে হয়েছে একটার পর একটা সূত্রের পিছনে... কোনওটা ছিল সত্য, কোনওটা মিথ্যা। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল, চোখ মুদলেও মানবজাতির ভয়াবহ পরিণামের দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে জেগে উঠতেন। একেকটা সময় মনে হতো বদ্ধ দেয়ালে রুদ্ধ হয়ে গেছে পথ, তারপরও হাল ছাড়েননি কখনও, লেগে থেকেছেন। সেটারই পুরস্কার আজ তাঁর চোখের সামনে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

আইকনটা আর দশটা সাধারণ আইকনের মত নয়। সেগুলো সাধারণত কাঠের তৈরি হয়, শুধু ফ্রেমটা হয় সোনার। কিন্তু এটার প্রায় পুরোটাই নিখাদ স্বর্ণে মোড়া। নভোস্কি খোদাইটার উপর আঙুল বোলালেন, ছবিতে ভার্জিন মেরিকে দেখা যাচ্ছে—তাঁর ক্রুশবিদ্ধ সন্তানকে আগলে ধরে আছেন। মেরির গাউন আর যিশুর ক্ষত থেকে গড়ানো রক্তটা আশ্চর্য রকম নিখুঁতভাবে ফোটানো হয়েছে। ভাল করে দেখলেন ফাদার—হ্যাঁ, মেরির কাঁধের উপর দিয়ে বিলীয়মান ধূমকেতুর লেজটাও ঠিকমতই আছে।

জিনিসটার অথেনটিসিটি নিয়ে আর সন্দেহ নেই, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন নভোস্কি, ক্লান্তি বা সী-সিকনেসের জন্য নয়, প্রার্থনার জন্য। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বাইবেল আওড়ালেন তিনি, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন ঈশ্বর, যিশু, মেরি আর স্বর্গীয় নেতা ব্রাদার গ্রেগোরিকে। সমস্ত ক্লেশ ভুলে গেছেন, ত্রিশ বছরের সাধনা সফল হয়েছে তাঁর। অক্লান্ত গবেষণার ফসল সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আইকনটা আসলেই ভ্যাটিক্যানে ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিরা লুঠ করেছিল এটা, জার্মানির পতনের পর রিপ্যাট্রিয়েশন কমিশনের এক অজ্ঞ অ্যামেরিকান সদস্য ভুল

করে তুলে দিয়েছিল পোপের লোকজনের হাতে। এমন ঘটনা নতুন নয়, যুদ্ধশেষে এমন অনেক নিদর্শন ভুল লোকের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কেবিনে যখন ফিরলেন, তখন ফাদার নভোস্কি ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। কার্গো হোল্ড থেকে ভারি আইকনটা বয়ে আনতে গিয়ে শরীরের সমস্ত পেশি ব্যথা হয়ে গেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি দারুণ উদ্দীপ্ত, যেন যৌবনের সেই স্বর্ণালী দিনগুলোয় ফিরে গেছেন।

বিছানার উপর আইকনটা নামিয়ে রাখলেন নভোস্কি, সেটার ভারে দেবে গেল ম্যাট্রেস, স্প্রিঙগুলো যেন তীব্রস্বরে প্রতিবাদ জানাল এই ওজন বহন করতে। এরপর কাঠের সিন্দুকটা খুললেন তিনি, উপরের সব কাপড়চোপড় ছুঁড়ে ফেললেন, যত্ন করে সরিয়ে রাখলেন বিশেষ পরিচ্ছদটা, তলা থেকে বের করে আনলেন মেটাল ফ্লাস্ক, ঢাকনা খুললেন। ভিতরের স্বচ্ছ তরলটা প্রথম দেখায় সাধারণ পানির মত লাগলেও আসলে তা নয়, ওটা হলো ডিউটেরিয়াম বা *ভারি পানি*, নানাবিধ গুণের কারণে পৃথিবীর ক্ষতিকর পদার্থগুলো নাড়াচাড়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। যে ভয়ানক বস্তু নিয়ে নভোস্কি কাজ করছেন, সেটার বিরুদ্ধে এই ডিউটেরিয়াম কাজ করবে কি না বলা মুশকিল, কারণ বস্তুটা এই পৃথিবীর নয়। তিনি শুধু প্রার্থনাই করতে পারেন ঈশ্বরের কাছে, যাতে ভারি পানিটা এর বিরুদ্ধে কার্যকর হয়।

ফ্লাস্কের তলায় তরলের ভিতর শুয়ে আছে একটা হাতুড়ি আর ছয় ইঞ্চি লম্বা মলিবডেনামের তৈরি একটা ছেনি, সেগুলো বের করলেন নভোস্কি। বাথরুমে গিয়ে একটা ইলেকট্রিক রেজারও নিয়ে এলেন, তবে ওটা আসলে রেজার নয়, রেজারের ছদ্মবেশে অন্য একটা যন্ত্র। কাস্টমস্ অফিসাররা জিনিসটার উপর খুব একটা নজর দেয়নি, নইলে নিঃসন্দেহে তাদের মনে প্রশ্ন জাগত—যে মানুষ কৈশোর থেকে সন্ন্যাস নিয়েছে, সেই থেকে

দাড়ি কাটছে না, তার লাগেজের ভিতরে ইলেকট্রিক রেজার কী করছে?

অন্তর্বাস ছাড়া সব খুলে ফেললেন নভোস্কি, তারপর পরতে শুরু করলেন বিশেষ পরিচ্ছদটা। প্রথমেই গায়ে চড়ালেন সীসার প্রলেপ দেয়া আলখাল্লাটা, এরপর দুহাতে যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে দস্তানাদুটো পরলেন, সবশেষে মাথায় দিলেন সোনার চেইনে গড়া হুডটা। কাজ শুরু করার আগে তিনি নিশ্চিত হয়ে নিলেন, সঙ্গে আনা সোনার প্লাগটার সাথে ছেনির ডায়ামিটারের মিল আছে কি না।

এবার বিছানা থেকে তুলে আইকনটা ফ্লাস্কের পানিতে নামিয়ে রাখলেন ফাদার, কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন জিনিসটা পুরোপুরি ডিউটেরিয়ামে ডুবেছে কি না দেখার জন্য। কর্ডলেস রেজারটা অন করলেন তিনি, ডুবন্ত আইকনের উপর দিয়ে কয়েকটা সরলরেখা ধরে স্ক্যান করলেন, নীরব রইল যন্ত্রটা। স্বস্তি বোধ করলেন ফাদার, জিনিসটার বয়স প্রায় একশো বছর হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত অটুট রয়েছে সোনার স্তর, ক্ষয় হয়নি, ছড়াচ্ছে না কোনও রেডিয়েশন।

হুডের চোখের শেড়দুটো এরপর টেনে দিলেন নভোস্কি, হাতে তুলে নিলেন হাতুড়ি আর ছেনিটা। খোদাই করা যিশুর বুকে সরু ডগাটা বসিয়ে লম্বা করে দম নিলেন, সজোরে নামিয়ে আনলেন হাতুড়িটা। চোখ খুলে রেজারটার দিকে তাকালেন তিনি, এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না ওটা। মনকে শান্ত করে ছেনির ডগাটা আবার জায়গামত বসালেন, পিছনে সর্বশক্তিতে বাড়ি দিলেন হাতুড়ি দিয়ে। খুট করে মৃদু একটা শব্দ হওয়ায় বুঝলেন, এবার সোনার আবরণটা ভেদ করেছে ওটা।

হঠাৎ করেই জ্যান্ত হয়ে উঠল রেজারটা, অবিরাম ক্লিক-ক্লিক জাতীয় শব্দ করতে শুরু করেছে ওটা। জিনিসটা আসলে একটা পোর্টেবল গাইগার কাউন্টার, অবিশ্বাস্য পরিমাণ রেডিয়েশন

ডিটেক্ট করতে পেরে মাতাল হয়ে উঠেছে যন্ত্রটা, অনবরত সতর্কবাণী শোনাচ্ছে। মাথা ঝাঁকালেন নভোস্কি—হ্যাঁ, সঠিক বস্তুটাই খুঁজে পেয়েছেন তিনি, আইকনের অথেনটিসিটির এটাই ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষা। মনের মধ্যে ভয় আর উত্তেজনা নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, কাঁপা কাঁপা হাতে তিনি সোনার প্লাগটা দিয়ে আইকনের ছিদ্রটা বন্ধ করে দিলেন। এখনও পুরোপুরি থামেনি গাইগার কাউন্টারের গুঞ্জন, প্লাগটা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়ে শক্ত করে বসানোর পর থামল ওটা, সীলটা বসেছে ভালমত।

হুডটা খুলে ফেললেন নভোস্কি, গাইগার কাউন্টারটা তুলে রেডিয়েশনের পরিমাপ দেখলেন, চোখ বড় বড় হয়ে গেল তাঁর। যে অঙ্কটা দেখা যাচ্ছে, তা সারা জীবনে একটা এক্স-রে মেশিন থেকেও বের হয় না। এবার কেবিনের দেয়াল আর অন্যান্য জিনিসপত্র যন্ত্রটা দিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। না... কোথাও রেডিয়েশনের চিহ্ন নেই, কিন্তু দস্তানা খুলে ওটা নিজের হাতের কাছে আনতেই আবার মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফাদার, প্রায় এক শতাব্দী আগে ব্রাদার গ্রেগোরি যে প্রতিপাদ্যে পৌঁছেছিলেন, তা-ই ঠিক—এই রেডিয়েশন শুধু জীবন্ত কোষে আঘাত হানে, জড় পদার্থের উপর কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটায় না। বহুদিন পর ব্রাদার লিওনিদ-ও একই মতামত দিয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের জন্য পদার্থটার সামনে উন্মুক্ত হয়েছিলেন নভোস্কি, অথচ সেটাই তাঁর জীবন থেকে অন্তত কয়েকটা বছর কেড়ে নিয়ে গেছে নিশ্চিতভাবে।

এক দৃষ্টিতে আইকনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি, ভাবছেন সোনার আবরণে ওটার ভিতরে লুকানো অত্যাশ্চর্য পদার্থটার কথা। তাঁদের ব্রাদারহুড, গোপন সংঘ জিনিসটাকে *'স্যাটান'স্ ফিস্ট'*... মানে, শয়তানের মুঠি বলে ডাকে। এক কালে অসংখ্য লোক এই ভয়াবহ বস্তুটার শিকার হয়ে মারা গেছে।

এই মুহূর্তে যে খণ্ডটা তাঁর হাতে আছে, তা দিয়ে সী-এম্প্রেসের সমস্ত জীবিত প্রাণীকে মেরে ফেলা যাবে। ব্রাদারহুডের রেকর্ড বলে, গ্রেগোরি খুন হবার আগে পঞ্চাশটা আইকনের ভিতর লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন এই অভিশাপকে। পরে ব্রাদার লিওনিদ সব ধ্বংস করে ফেলেন—এই একটা ছাড়া। এটা তাঁর হাতে পড়ার আগেই জার্মানরা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল।

ফ্লাস্কের ঢাকনা বন্ধ করে সিন্দুকে আলখাল্লা-হুড-দস্তানা সহ সব কাপড়চোপড় আগের মত সাজিয়ে রাখলেন নভোস্কি, কেবিনও গোছগাছ করলেন। অর্পিত দায়িত্ব নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পাদনের আনন্দে মন ফুরফুরে, বহুদিন পর ক্ষুধার্ত পেটটাও খাবারের চাহিদা জানাচ্ছে। ভাবলেন রেস্টুরেন্টে গিয়েই তা হলে ডিনারটা সারা যাক।

কিন্তু তার আগে প্রার্থনা করতে হবে তাঁকে। হাঁটু গেড়ে কেবিনের মেঝেতে বসলেন তিনি, ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করলেন সাফল্য লাভের আশায়, তবে তা নিজের জন্য নয়। তাঁর অংশটুকু তো সফল হয়েছেই। তারপরও শেষ হয়নি সব। স্যাটান'স্ ফিস্টের সমস্ত নিদর্শন ব্রাদারহুডের হাতে আসেনি এখনও। এই সুসজ্জিত জাহাজ ছাড়াও ভয়ঙ্কর বস্তুটার আরও একটা উৎস আছে। সেখানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আরেকটা দল। ফাদার নভোস্কির মত নির্ঝঞ্ঝাট নয় তাদের মিশন। অপেক্ষা করছে বিপদ আর অসম্ভব শক্তিধর এক শত্রু।

ঈশ্বর, রক্ষা করো ওদের!

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মৃত্যুশীতল স্পর্শ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

পাঠক, তৈরি হোন রুদ্ধশ্বাস কাহিনির শেষটুকু জানার জন্য।
রুদ্র প্রকৃতি, ভয়ঙ্কর শত্রু আর নিশ্চিত মৃত্যুকে
কীভাবে ফাঁকি দেয় মাসুদ রানা, দেখতে চান? খোলস ভেঙে
লিয়া নোভাক আর দেজান জুরকিচের ভিতরে উঁকি দেবেন?
এয়ারশিপ আর সাবমেরিনের মধ্যে
টাগ-অভ-ওয়ার দেখেছেন কখনও?
স্যাটানস্ ফিস্ট, রাসপুটিন আর প্যান্ডোরা প্রজেক্টের
আসল রহস্য জানতে চান?
শত্রুদের বিরুদ্ধে রানার নির্মম প্রতিশোধ? আছে তো!
এসবের মধ্যে প্রমোদতরীতে পোপের ধর্মীয় মহাসম্মেলন
আসে কীভাবে? আরে, শেষ লড়াইটা তো ওখানেই!
পাতায় পাতায় চমক, সাসপেন্স আর পাগল করে দেয়া
অ্যাকশন—আছে সবই। নেই শুধু দম ফেলার ফুরসত।
সাবধান! তাই বলে শ্বাস নিতে ভুলবেন না আবার!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

বাণী মজুমদার

c/o দিলিপ মজুমদার, ৮৪ নং এস.জি.রোড, তামাকপট্টি, নারায়ণগঞ্জ।

কাজী দাদু, প্রণাম নিবেন। ভাল আছেন অবশ্যই। ছোটবেলা থেকে আমার বই পড়ার খুব শখ। সব ধরনের বই পড়তে পছন্দ করি। আমার ছোট বোন একদিন আমাকে আপনার লেখা 'মাসুদ রানা'-র অনেকগুলো বই এনে দেয় পড়ার জন্য। সেই থেকে আমি আপনার গল্পের নায়ক মাসুদ রানার প্রেমে পড়ে যাই। তবে অবশ্যই গল্পের মাসুদ রানার। দাদু, আমার অনেক জানতে ইচ্ছে করে সত্যিই কি মাসুদ রানার মত সাহসী, নির্ভীক কোনও দেশপ্রেমিক ছিল কিনা। জানেন দাদু, আমার কোন বন্ধু নেই। নেই কোন আপনজন। কারণ আমার তো টাকাপয়সা নেই, তাই। আমার আরেকটা শখ আছে 'pen Friend' হওয়ার—যদি কেউ আগ্রহী হয়।

★টাকাপয়সার সঙ্গে বন্ধু বা আপনজন না থাকার কী সম্পর্ক, ঠিক বুঝলাম না। যা-ই হোক, প্রশ্নের উত্তরে বলছি: মাসুদ রানার মত নির্ভীক দেশপ্রেমিক তো ছিলই (মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করুন), এখনও আছে।

মোঃ শোয়েব হাসান অনীক

গ্রাম ও ডাক: কুচবুনিয়া, থানা: মোড়েলগঞ্জ, জেলা:বাগেরহাট-৯৩২২।

শুরুতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও সালাম ৩৮০ ও ৩৮১ নম্বর রানা ক্যাসিনো আন্দামান ও জলরাক্ষসের জন্য। সুরাইয়ার (ক্যা: আ:) চরিত্রের চাইতে জলরাক্ষস-এর মনিকা মনসুর-এর চরিত্র ব্যতিক্রম। জলরাক্ষস পড়ে মনে হয়েছে রানা যেন অন্য এক রানা। আগের রানার সাথে অনেক আলাদা এই রানা। ব্যতিক্রমী রানা সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ। শত্রু হিসেবে কিলার

ওয়েইল এবং প্রকৃতিই মনে হয় রানায় এমন ভিন্ন মাত্রার সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া আপনার লেখনি তো আছেই। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। প্রচ্ছদও ভাল। এখন মৃত্যুশীতল স্পর্শ-র জন্য প্রতীক্ষা। সব্বাইকে ঈদুল-আযহা এবং নতুন বছর ২০০৮-এর শুভেচ্ছা।

বি: দ্র: আপনার একটা অটোগ্রাফ চাই। পাওয়া যাবে কি?

✯ যাবে। শীঘ্রি পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। ...আপনিও আমাদের সব্বার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিন।

মোঃ আফজাল হোসেন

৪০/এ সওদাগরটুলী, কুমারপাড়া, সিলেট।

MR৭-৩৮০ 'ক্যাসিনো আন্দামান' বইটি খুবই ভাল লেগেছে। যদিও বারবার রানা শান তুং-এর গুহা থেকে কোন অ্যাকশন ছাড়াই পালিয়ে আসাতে বইটিকে একসময় নির্বিষ মনে হয়েছিল। তবে শেষদিকে রানার অ্যাকশন মন ভরিয়ে দিয়েছে। আপনাকে তাই অসংখ্য ধন্যবাদ। কাজীদা, এবার একটি গল্প—একজন লেখক ভদ্রলোক তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রায় ৪০টি বসন্ত নিরলস সাধনা ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর উপন্যাসের নায়ককে নিয়ে ৩৮০টি বই বের করেছেন। আর তাঁরই একজন ভক্ত সেই বইগুলো গোগ্রাসে গিলতে সময় নিয়েছে মাত্র ৪ বছর!!! কাজীদা অবিশ্বাস্য এই গল্পটি বাস্তবে আমার জীবনে ঘটেছে। আশা করছি এভাবে সেবার সকল বই পড়তে পারব। সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

✯ এই হারে পড়তে থাকলে সেবার সব বই শেষ হতে লাগবে আর মাত্র আঠারো বছর। ...ক্যাসিনো আন্দামানের শেষদিকে রানার অ্যাকশন আপনার মন ভরিয়ে দিয়েছে জেনে খুব ভাল লাগল। ...আপনার জন্যও রইল আমাদের শুভেচ্ছা।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)

পোঃ অঃ সংলগ্ন, থানা+পোঃ বোয়ালমারি, জেলাঃ ফরিদপুর।

১, ২, ৩ ইস! শেষ হয়ে গেল। ওহ্ হো কাজীদা, এই মাত্র শেষ করলাম আপনার লেখা আরও একটি পিন খোলা গ্রেনেড ক্যাসিনো আন্দামান। অপূর্ব বইটির কাহিনি। মনে হয় যেন পুরোটাই বাস্তব। পদে পদে বিপদ এবং অবশেষে মুক্তি দেখে মনে হয় রানার সঙ্গে আমিও মিশে যাই এবং হই বিপদের মুখোমুখি। যেখানে আছে রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার, অ্যাকশন, উত্তেজনা এবং রহস্যের ছড়াছড়ি। আপনি কী বলেন...যাব? তাইওয়ানিজ জলদস্যু তুংশান-এর সঙ্গে আরও একটি চরিত্র সেই পাগল বৈজ্ঞানিক কবীর চৌধুরী যদি থাকত তা হলে কাহিনি আরও জমজমাট হত। কাহিনিটা কবীর চৌধুরীর জন্য বেশ মানানসইও বটে। ডানা কাটা পরী সুরাইয়া চরিত্রটি বেশ...ইয়ে... রানার সঙ্গে যদি ওর আরও একটু...

চমৎকার সাবলীল ভাষায় রচিত এবং উত্তেজনা আর অ্যাকশনের সংমিশ্রণে লেখা বই ক্যাসিনো আন্দামান আমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য

আপনাকে জানাচ্ছি রং বেরং-এর নানান প্রকার অসংখ্য প্রজাপতির শুভেচ্ছা। আশা করি ভাল লাগবে। আর হ্যাঁ, কাজীদা, আমি মেঘের সঙ্গে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি!!

★ কোথায়? প্রজাপতিগুলো ভাল লেগেছে। ধন্যবাদ।

ইফতিখার আহমেদ রানা

এম.এম কলেজ, কোমরপুর, ফরিদপুর, মো: ০১৭২২৯৪৫১২৪

এইমাত্র পড়া শেষ হলো রানা সিরিজের ৩৮০তম বই ক্যাসিনো আন্দামান। খুব ভাল লেগেছে। আসলে হোস্টেলের এই সাদাকালো, বন্দি সময়টা রাঙিয়ে দেয় রানা। দারুণ সঙ্গ দিয়ে ভুলিয়ে দেয় প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা। এজন্যেই সংগ্রহের সব বই নিয়ে এসেছি এখানে। নতুন বই হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ওগুলোই বারবার পড়ি।... ওহ্-হো, ক্যাসিনো আন্দামানের ১৩১ পৃষ্ঠায় ছোট্ট একটি ভুল চোখে পড়ল।

সালাহউদ্দিন শাহ কুতুবের নাম সবাই জানে, থমথমে গলায় বলল সুরাইয়া। কিন্তু সুরাইয়া না হয়ে হবে বেলিন্ডা। 'জলরাক্ষস' বইটিতে কাহিনির ভিন্নতা পাব বলে আশা করছি। সবশেষে সুন্দর একটি প্রচ্ছদ-এর জন্যে রনবীর আহমেদ বিপ্লব ভাইকে অ-নে-ক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকেও, বইটির জন্যে।

★ আপনাকেও, পড়ার জন্য। ভুলটা শুধরে রাখলাম, রিপ্রিন্টে এ-ভুল থাকবে না।

জিসান আহমেদ নীল

বোয়ালমারি বাজার, বোয়ালমারি, ফরিদপুর।

আমি আপনার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মাসুদ রানা'র একজন চক্ষুষ্মান ও বধির ভক্ত। কেননা আমি যখন মাসুদ রানার কোন বই পড়তে বসি, তখন চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কোনও ধারণা থাকে না।

এই মাত্র পড়ে শেষ করলাম সিরিজটির নতুন বই 'জলরাক্ষস'। বইটি তিনটি কারণে আমার খুব ভাল লেগেছে।

১ম কারণ: বইটির চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য। অসাধারণ প্রচ্ছদের জন্য রনবীর আহমেদ বিপ্লবকে আমার পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ।

২য় কারণ: বইটির আশানুরূপ সাইজ দেখে। বইটির সাইজ দেখে তো শুধু নাচতে বাকি রেখেছি। পারিনি, যদি কেউ পাগল ভাবে।

৩য় কারণ: বইটির অতুলনীয় কাহিনি পড়ে।

এক কথায় বইটি সবদিক থেকে হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এজন্য কাজীদাকে জানাই চার ঝুড়ি গোরগাঁজ (গোলাপ, রজনীগন্ধা, গাঁদা, জবা) ফুলের শুভেচ্ছা।

মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১ এর জন্য অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছি। জলদি বের করুন।

★ করেছি তো। ওটা এখন বইয়ের দোকান থেকে বাসায় ফেরার পথে আপনার বগলের নীচে।